বল্লভপুরের মাঠ

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

বল্লভপুরের মাঠ

বল্লভপুরের মাঠ

দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬

প্রকাশকঃ মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীভবন
৪/১, আশু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ২৫

দ্বিতীয় সংস্করণ
৭ই ভাদ্র, ১৩৭৭

ছয় টাকা

মুদ্রকঃ সুকুমার ঘটক
টেম্পল প্রেস
২, ন্যায়রত্ন লেন, কলিকাতা ৪

যে বন্ধু আমাকে সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দেওয়াতে আমি লেখার দ্বারা আমার মনোভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইয়াছি; যিনি গুরুর ন্যায় বিপথে চলা হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন সেই গুরুস্থানীয় বন্ধু, কবি ও কঠোর
সমালোচক
শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের করকমলে পুস্তকটি অর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম।

সূচীপত্র

বল্লভপুরের মাঠ

চাটুজ্জে মহাশয়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া দুইজন বরকন্দাজ সহ বাহির হইয়া পড়িলাম।

বল্লভপুরের মাঠ পার হইতে পারিলেই সদর কাছারি। সাত মাইল পথ দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যাইবে। তা ছাড়া দুইজন বলবান পশ্চিমা ভৃত্য ও হ্যারিকেনের আলো রহিয়াছে, নির্ভয়ে হাঁটিতে লাগিলাম।

কাছারিতে সময়মত পোঁছিতে পারিলেই টাকাটা খাজাঞ্চিখানায় জমা দিয়া গোড়া হইতে থিয়েটার দেখিতে পারিব।

কলিকাতা হইতে কলেজে-পড়া ছোকরারা আসিয়াছে। ঘরোয়া কথা বলার মত নাকি উহারা অভিনব উপায়ে অ্যাক্‌টিং করিয়া থাকে। এই প্লে দেখিবার জন্য প্রায় ভোর হইতে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়াছি। বৃহস্পতিবারে আবার নাপিত আসে না। গত্যন্তর না থাকায় ভোঁতা মরিচা-পড়া ক্ষুরটা লইয়াই দাড়ি কামাইয়াছিলাম, অনেক স্থলে কাটিয়া গিয়াছে। তা যাউক। গালটা বেশ মসৃণ বোধ করিতেছি। আহা, গৃহিণী এই সময় নিকটে থাকিলে অন্তত একবার—। গোঁফটা ঠিকমত ছাঁটিয়াছি কি? বোধ হয় না। গ্রহের ফেরে হাটে-কেনা পুরাতন আয়নাখানা কাল হাত হইতে পড়িয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল। পুরুষের চিহ্ন গোঁফ। হ্যাঃ, পুরুষের গোঁফ এদিক ওদিক হইলেই বা। তা ছাড়া অন্ধকারে কে দেখিতে আসিবে! চাটুজ্জে মহাশয়ের উপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া বৃহস্পতিবারের বারবেলাতেই বাহির হইয়া পড়িলাম। দুর্গানাম করিয়া বাহির হইয়াছি, কিছুই হইবে না। একটা মস্ত সান্ত্বনা পাইলাম।

প্রায় তিন বৎসর হইতে চলিল, আমোদ-প্রমোদের ভিতর একমাত্র তাস-খেলা অবলম্বন করিয়া নায়েবগিরি করিতেছি। খেলার ফাঁকে অবসর পাইলে, কাহারও না কাহারও চরিত্রদোষ লইয়া সময় কাটাইবার ব্যবস্থা করিতাম। কিন্তু প্রাণ খুলিয়া মুখরোচক ভাষা ব্যবহার করিতে না পারিলে পরনিন্দায় নিরীহ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। গ্রামের সকলের নিকটই আমি পরিচিত, এক দিক দিয়া উহারা ঘোরতর অবুঝ। অকারণ চাঁদা করিয়া মার দিবার ভয়

দেখায়, ঠ্যাঙানির ভয়ে এমন একটি ভোগের বস্তু ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই সংকট অবস্থায় শহুরে ছেলেদের থিয়েটারের খবর আসিল। পরনিন্দালোভী আত্মাকে সান্ত্বনা দিবার সুযোগ পাইলাম। নূতন লোক এইবার ধরিতে পারিব। 'মাভৈঃ' বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমার তত্ত্বাবধানে যে মহালটি ছিল, তাহার হস্তবুদ মোটা টাকার। এবারকার কিস্তি ভালই আদায় হইয়াছে। মনে মনে সংকল্প আঁটিতেছিলাম, ম্যানেজারবাবুকে মাহিনা বাড়াইয়া দিতে বলিব, নতুবা শহরে বদলি করিতে হইবে। দরখাস্ত অবহেলা করিলে চাকরি ছাড়িয়া দিব। দুত্তোর! এমন কি মাহিনা! কিন্তু উপরি পাওনার কথা মনে পড়িতেই চাকরি ছাড়াটা যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলাম না। জমিদারিতে চাকরি না করিলে সেদিন কি পুঁটীর (আমার ভগ্নীর) বিবাহ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারিত? কচি পাঁঠা হইতে আরম্ভ করিয়া কাতলা এবং কালবোস ও তৎসহ যত রকমের শাকসবজি বিনা পয়সায় কাহারা যোগাইত? আরে ছ্যাঃ, চাকরি ছাড়িব বলিলেই কি ছাড়িতেছি নাকি? ম্যানেজারবাবু মানকচু ও কচি আম ভালবাসেন। কয়েকটা সঙ্গে লইলে ভাল হইত। থাক, ভুল যখন হইয়াছে, তখন ও বিষয়ে ভাবিয়া কোন লাভ নাই। আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে বলিলেই ম্যানেজারবাবু সন্তুষ্ট হইবেন।

চাকরি, সংসার ইত্যাদি নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে গাঁ ছাড়িয়া অনেকটা পথ আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

মাঝে মাঝে শীতলের মুদ্রাদোষ—গলা-খাঁকরানি, ঝিল্লীর কলরব এবং বরকন্দাজের সামরিক জুতার মশমশ আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। লণ্ঠনের আলোর পরিধির বাহিরে গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারের ফাঁকে অস্পষ্ট পায়ে-চলা পথ—আঁকিয়া বাঁকিয়া দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে। পথের শেষ নাই। মাঝে মাঝে হাওয়ার মৃদু দোলায় খটখট ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ আসিতেছে। সন্দিগ্ধ হইলে অনেক কিছুই ভাবিবার বিষয় আসিয়া পড়ে। হঠাৎ একটি শৃগাল রাস্তা অতিক্রম করিয়া সামনের ঝোপে ঢুকিয়া পড়িল। ঝোপটি ফতিমা বিবির গোর ঘিরিয়া আছে।

ফতিমা বিবি কে এবং কবে তিনি গত হইয়াছিলেন, সে খবর কেহ রাখে না। কিন্তু লোকে গোর সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া ফতিমা বিবির নাম স্মরণীয়

করিয়া রাখিয়াছে।

চাটুজ্জে মহাশয় পুনঃ পুনঃ এই স্থানটির সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর মাছ ধরিয়া বাসায় ফিরিবার সময় তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছিল, মনে পড়িতে লাগিল। কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলাম, আমাদের কাহারও নিকট মাছ অথবা মাংস ছিল না।

এতটা আসিতে হঠাৎ মনে হইল, শীতল সিং-এর গলা-খাঁকরানি অনেকক্ষণ শুনি নাই। কেন বলিতে পারি না, পিছন ফিরিতে সাহস পাইলাম না। সামনের দিকে মুখ রাখিয়াই ডাকিলাম, শীতল!

সাড়া নাই। গাটা ছমছম করিয়া উঠিল। পাঁড়ের স্কন্ধে হাত দিলাম। সে চমকিয়া পিছন ফিরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিল, একটি জীবন্ত মানুষ কমিয়া গিয়াছে।

উভয়ে উভয়ের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইলাম—প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ের এক। উভয়েই একসঙ্গে বলিলাম, শীতল কিধর গিয়া? নিঃশব্দে উভয়েই উভয়কে চক্ষের ভাষায় জানাইলাম, কেহই জানি না।

শীতলের নিকট টাকা ছিল না। সুতরাং সে সরিয়া পড়িবে কেন? নূতন বাহাল হইয়াছে, তাহার নিকট হাজার হাজার টাকার হুণ্ডি গচ্ছিত রাখার প্রশ্নই উঠে না। চারিধার ভাল করিয়া দেখিলাম ; শীতলকে পাওয়া গেল না।

পাঁড়েকে বলিলাম, ফিরিয়া চল, দেখি শীতলের কি হইল! পাঁড়ে হাঁ না কিছুই বলিল না। আমার হাতে লণ্ঠন দিয়া অনুসরণ করিতে লাগিল। চাটুজ্জে মহাশয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পিছনের জীবন্ত মানুষ এই ভাবে অন্তর্ধান হইবে, কে ভাবিতে পারিয়াছিল! মাছ নয়, মাংস নয়, একটা সাজোয়ান জীবন্ত পশ্চিমা। যে উৎসাহ লইয়া বাহির হইয়াছিলাম, এখন তাহা তিরোহিত হইয়াছে। কোন প্রকারে গাঁয়ের নিকট পৌঁছিতে পারিলে বাঁচি। সাহস সঞ্চয় করিয়া শীতলকে খুঁজিয়া বাহির করিব সেরূপ উৎসাহ আর নাই, নিরুপায় হইয়াই সামনে চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, হঠাৎ স্কন্ধের উন্মুক্ত স্থলে লৌহের মত কঠিন পদার্থের স্পর্শ অনুভব করিলাম। কঙ্কালসার আঙুলের দৃঢ় চাপ মনে হইয়াছিল। হঠাৎ পিছন ফিরিতেই বোধ হইল, হিমবৎ কঙ্কাল স্কন্ধ হইতে

স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। পাঁড়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছু দেখিলে কি? সে প্যাঁচানো লোহা-বাঁধানো লাঠি সামলাইতে সামলাইতে অত্যন্ত ভীত-ভাবে উত্তর করিল, না। একবার ভাবিলাম, পাঁড়ের লাঠির ডগাটা কাঁধে পড়ে নাই তো? কখনই না, আমি যে পাঁচটি আঙুলের চাপ অনুভব করিলাম! লাঠির ডগা হইবে কি করিয়া! তাহা ছাড়া পিছন ফিরিতেই হাত যে সরিয়া গেল। আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিলাম না। লক্ষ্য করিলাম, পাঁড়ের মুখ প্রায় বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এ অবস্থায় তাহাকে কিছু না বলাই ভাল। এখন মনে বল না আনিতে পারিলে রক্ষা নাই।

জমিদারিতে কাজ করি; অভিজ্ঞতায় জানিতাম, জীবন্ত মানুষ উপিয়া গিয়াছে বলিলে কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না। অধিকন্তু গুমির অপরাধে শ্রীঘর-দর্শনলাভও হইতে পারে। সুতরাং খুঁজিয়া না পাই, অন্তত মানুষ যে হারাইয়াছে, তাহার একটা প্রমাণ থাকা দরকার। বাহিরে একটা সুস্থ মানুষের আব্রু টানিয়া পাঁড়েকে বলিলাম, শীতলকে বাহির করিতে হইবে। চল, দেখি সে কোথায় গেল! পাঁড়ে ভয়ে সম্মোহিতের মত হইয়াছিল, কোনই আপত্তি করিল না—এরূপ বশ্যতা পাঁড়ের কখনও দেখি নাই। তাহার অস্বাভাবিক ব্যবহারে আমিও কেমন দমিয়া যাইতেছিলাম।

চীৎকার করিয়া শীতলকে ডাকিতে বলিলাম। কিন্তু পাঁড়ের গলা হইতে যে-শব্দ বাহির হইল, তাহা দশ গজের বেশী পৌঁছিয়াছিল কি না সন্দেহ। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন শীতলকে পাইলাম না, তখন পাঁড়েকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন কি করা যায়? তাহার নিকট হইতে কোন উত্তর আসিবার আগেই বাঁশের ডালের উপর হইতে একটি অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাইলাম এবং পর-মুহূর্তে মনে হইল, পাশের ডোবায় কে ডুব দিল। শিহরিয়া উঠিলাম। এখানেই তো চাটুজ্জে মহাশয় মাছ ধরিয়াছিলেন। তবে কি অন্তর্য্যামী অশরীরীর কোপ এখনও কমে নাই? আমরা তো মাছ ধরিতে আসি নাই; তবে কেন এই নির্দয়তা? দুর্ব্বল বোধ করিতেছিলাম। ইঙ্গিতে পাঁড়েকে নিকটে আসিতে বলিয়া তাহার গা টিপিলাম। সে জানাইল, শব্দ সেও শুনিয়াছে। জোর করিয়া সাহস সঞ্চয় করিলাম। ডোবার নিকট গিয়া লণ্ঠন উঁচু করিয়া দেখিলাম, তখনও জলে ছোট ছোট তরঙ্গ রহিয়াছে, অথচ কোন প্রাণীর

অস্তিত্ব নাই। ডোবার খানিকটা অংশে পচা পাট। ঐ উদ্দেশ্যেই ডোবাটি কাটা—দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ানো যায় না। এত নোংরা জলে এই সময় ডুব দিবে কে? মনকে স্তোক দিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিলাম, নিশ্চয় ভোঁদড়, ভাম অথবা গন্ধগোকুল। কিন্তু সান্ত্বনা পাইলাম না। সব ঘটনাই কেমন জটিল হইয়া উঠিতেছিল। শীতলের কি হইয়াছে ভাবিতে পারিতেছিলাম না। ভারাক্রান্ত দেহকে টানিয়া লইয়া চলিলাম।

যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই খোলা মাঠের জাগ্রত প্রহরী ঝিল্লীর দল রুঁধ-ডাকার মত একদল আর একদলকে আমাদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেছে। একদল থামে তো আর একদল আরও দূরে সঙ্কেত পাঠাইয়া দেয়। ক্রমে আমরা কালীবাড়ি শ্মশানের নিকট আসিয়া পড়িলাম।

চাঁদ তখন সবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। মন্দিরের পিছনে ছোট্ট নদীতে যেটুকু জল ছিল, তাহার উপর চাঁদের ক্ষীণ আলো পড়ায় একটি রূপালী রেখার মত লাগিতেছে। মন্দিরের বিরাট আকার এখন মাথা উঁচু করিয়া আছে। লোকে জানে, বাবুদের পূর্বপুরুষ কেহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ওলাউঠার মহামারীতে গ্রামকে গ্রাম নিঃশেষিত হওয়ায় এখন মানুষের বসতির পরিবর্তে স্থানে স্থানে ছোট জঙ্গলের মত হইয়া আছে। মাঝে মাঝে চিতাবাঘের ডাকও অনেকে শুনিয়া থাকে। ইহাই মন্দিরের সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে, আরও নানা কথা শুনিয়াছি। তথাপি সিঁড়ির ধাপে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। শীতলের কথা ভাবিবার এখন সময় নাই। বসিলাম। পাঁড়ে এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা পছন্দ করিতেছিল না। না বসিয়া উপয়াই বা কি আছে! জনমানব-শূন্য মাঠ; চার মাইলের ভিতর কোন মানুষের অস্তিত্ব নাই। এখানে যেমনই বিপদে পড়ি না কেন, না মরা পর্যন্ত কেহ দেখিতে আসিবে না; কারণ শুনিয়াছি, এ মাঠ অতিক্রম করিতে হইলে মানুষ দিনের বেলায় পর্যন্ত দল বাঁধিয়া চলে। গম্যস্থল অতি দূরে, সুতরাং একটু বিশ্রাম করিয়া লওয়া ভাল। আগের ঘটনাগুলিতে ইতিমধ্যেই তালু শুকাইয়া গিয়াছিল, অথচ নদীর জল খাইবার সাহস পাইতেছি না। প্রথম উহাতে স্রোত নাই, দ্বিতীয় কারণ—এক আঁজলা জল তুলিতে হয়তো দুই-একটি হেলে সাপও

ভাবে লক্ষ্য করিতেছে। চক্ষু দুইটি সিন্দূরবর্ণের প্রজ্বলিত দুইটি অগ্নিগোলক। আবার দমকা হাওয়া। নারী শূন্যে উঠিয়া পুনরায় দরজার সামনে নামিল। তাহার পর বেগে ভিতরে প্রবেশ করিল। পরমুহূর্তে চাপা ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা জানালাটা কে সজোরে ঠুকিতে লাগিল। ক্ষণিকের নিস্তব্ধতা। পরক্ষণে শুনিলাম, গুরুভার পতনের শব্দ। নারী যেন প্রেতলোক হইতে কি ভাবে আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছে। দেওয়ালের আড়ালে যাহা কিছু ঘটিতেছিল, তাহা অনুমানে প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম।

মাথাটা ঝিমাইয়া আসিতে লাগিল। পাঁড়েকে আমার অতি নিকটে বসিতে বলিলাম। জীবন্ত মানুষের স্পর্শে অনেকটা বল পাইলাম। অন্যদিকে মুখ ফিরাইবার শক্তি আমার ছিল না, ঘটনাস্থলটি আমার দৃষ্টিকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করিতেছিল।

কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়াছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ মনে হইল, কে দারুণভাবে জানালাটা আঁচড়াইতেছে। মানুষের শক্তি লইয়া নখের দ্বারা এই ভাবে আঁচড়ানো সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। জানালার দিকে তাকাইতেই দেখিলাম, সেই নারী—ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বেশ বিধবার, সাদা কাপড় আলো-আঁধারিতে প্রায় মিশিয়া গিয়াছে। মরিয়া হইয়া লণ্ঠন লইয়া দাঁড়াইলাম। উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেই ঘোমটার নীচে অস্পষ্ট মুখ অপসৃত হইল। ক্রমে দেহের অন্য অংশও খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রাণের মায়া তখন ছাড়িয়া দিয়াছি। পাঁড়েকে জানালার দিকে আলো ধরিতে বলিয়া সর্বশক্তি সহ একটি ঢিল ছুঁড়িলাম। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। একটি চলন্ত ঘোমটা। হাত নাই, পা নাই, মুখ নাই—সংক্ষেপে দেহের কোন অংশই নাই। কেবল একটি ঘোমটা, আমার দিকে লাফাইয়া লাফাইয়া আসিতেছে। সাংঘাতিক দৃশ্য! যতই নিকটে আসিতে লাগিল, ততই হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া উঠিতেছিল। এই অল্প সময়ের ভিতরেই শ্বাসক্রিয়া হাঁপানির টানের মত মনে হইতে লাগিল। দম বন্ধ হইবার উপক্রম প্রায়। মনে হইল, দেহভার বহন করিতে পারিতেছি না। নড়িবারও সাহস নাই যে

হাতে জড়াইয়া যাইতে পারে।

সিঁড়িতে বসিয়া মন্দির-সংলগ্ন পান্থশালা দেখিতেছিলাম। কোনকালে এক পঙ্‌ক্তিতে সহস্রাধিক মানুষকে যে আহার দেওয়া হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। পান্থশালার সামনেই অতি বৃহদাকার কুয়া। জল নিশ্চয় আছে, হয়তো স্বচ্ছ কাকচক্ষুর মতই হইবে। কিন্তু পান করিবার উপায় নাই। ভগ্ন ইটের স্তূপ ও আগাছা পথ রোধ করিয়াছে। বৃহৎ পরিধি লইয়া পান্থশালার পাঁচিল—স্থানে স্থানে হেলিয়া পড়িয়াছে। কোথাও বা ধসিয়া গিয়াছে, কোথাও ভগ্নোন্মুখ অবয়ব বটের শিকড়ের দৃঢ় বন্ধনে প্রায় দোদুল্যমান, কিন্তু মাথা নত হয় নাই। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। কবাট নাই, কিন্তু ভিতরের প্রবেশপথ দুর্গম। নানা গাছের শিকড় বৎসরের পর বৎসর সংখ্যা বাড়াইয়া স্থানটি ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। বেশিক্ষণ সেদিকে তাকাইতে ,মন চাহে না—কি জানি, যদি কিছু দেখিয়া ফেলি!

ধীরে ধীরে মন্দিরের পুরাতন ইতিহাস মনে আসিতে লাগিল। মহামারীর পর পান্থশালা কি ভাবে ডাকাতের আড্ডা হইয়াছিল, কি ভাবে নরবলির জন্য বলিষ্ঠ ও সুস্থ শিশু সংগ্রহ করা হইত, কি ভাবে কুলটা এখানে আত্মহত্যা করিয়াছিল—আরও কত ঘটনা মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল বলা কঠিন।

চাঁদের আলো তখন ডালপালা ভেদ করিয়া পান্থশালার চাতালে আসিয়া পড়িয়াছে। , কুহেলিকার সংস্পর্শে চন্দ্রকিরণ স্থানটিকে আরও ভীতিপ্রদ এবং রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে। সব কিছুর রূপই সন্দিগ্ধভাবে দেখিতেছি। কোন্‌টা কায়া, কোন্‌টা ছায়া—বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। হঠাৎ জ্যোৎস্নার শুভ্রতা স্তিমিত হইয়া আসিল। অস্বস্তিকর বাদলা হাওয়া—দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও অনুভব করিলাম। ঠিক এই মুহূর্তে মনে পড়িল, কুলটার কথা। ভাবিলাম, বারান্দার পার্শ্বে ঐ ঘরটিতেই হয়তো সে নীতির পীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। দমকা হাওয়ায় চমকিত হইয়া সেই ঘরের দিকে তাকাইলাম।

যাহা দেখিলাম, তাহাতে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—এলোকেশী যৌবনমত্তা নারী, নিটোল নগ্নবক্ষ স্ফীত করিয়া আমাকে স্থির-

বসিব। কতকটা সিদ্ধির নেশার মত টলিতে লাগিলাম। চলন্ত ঘোমটার নির্দিষ্ট গতি থামে নাই, অতি নিকটে আসিয়া পড়িল। আলো পড়িতে পূর্ণাবয়ব দেখিবার অবকাশ পাইলাম। উহা ঘোমটা নয়, একটি সাদা খরগোশ—আমাদের মানুষ সন্দেহ করিয়া নিকটবর্তী একটি ঝোপে ঢুকিয়া পড়িল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। বুকের ভিতরটা তখনও টিপটিপ করিতেছে। সিদ্ধির নেশার প্রক্রিয়া থামে নাই। বসিলাম। খরগোশ দেখিয়া সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। পাঁড়েকে বলিলাম, চল, ভিতরে গিয়া দেখি, কে কাঁদিতেছিল! সে কিছুতেই নড়িতে রাজি হইল না। অগত্যা কাছারির দিকে যাইব বলিয়া প্রস্তুত হইলাম। এমন সময় পান্থশালার ছাদের কার্নিসে দেখি, কে হামাগুড়ি দিয়া হাঁটিতেছে এবং মাথাটা অস্বাভাবিকভাবে নাড়িতেছে। অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিলেও কোন জীব এই ভাবে মাথা নাড়িতে পারে কি না সন্দেহ। জীবটির মাথা কতকটা মানুষের মত। কঙ্কালের মত সাদা—শুধু সাদা কেন বলি, নিরবচ্ছিন্ন কঙ্কালময় নরমুণ্ড বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দেহের—চতুষ্পদ জন্তুর সহিত সাদৃশ্য বেশি। ভয় অনেকটা সহনীয় হইয়া আসিতেছিল। এবার পাঁড়েকে বেশ জোর দিয়াই বলিলাম, আমার সঙ্গে এস, আলো আছে, ভয় কিসের? পল্টনের লোক, ভয় পাইয়াছ বলিতে লজ্জা করে না? পল্টনের অখ্যাতি স্বকর্ণে শুনা অপেক্ষা সিপাহী মৃত্যুকে বরণ করা শ্রেয় মনে করিল। আমি আগে, পাঁড়ে পিছনে—চলিতে লাগিলাম।

ইটের পাঁজা, আগাছা এবং স্থানে স্থানে ভূমিকম্পের ফাটল যতটা সম্ভব সামলাইয়া চলিতে হইতেছিল। অস্থানে পা পড়িলে পা ভাঙিয়া সেইখানেই থাকিয়া যাইতে হইবে।

চলিতেছি, হঠাৎ মৃত্যুর কঠোর ও নির্ভুল আহ্বান শুনিলাম সর্পের রোষমিশ্রিত গর্জনে। কুলীন বিষধর দংশন করিয়াছে আমাদের কাহার ছায়াকে। বাঁচিয়া গিয়াছি, তথাপি নিজের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। দংশনানুভূতি কোন অঙ্গে নাই, একটু ভরসা পাইলাম। আলোর পরিধির সীমান্তে দেখিলাম, একটি গক্ষুরা ধীরে ধীরে গর্ত্তের ভিতর ঢুকিতেছে। গতি অতি মন্থর—সবে খোলস ছাড়িবার মত।

সরীসৃপের শ্রেষ্ঠ কুলপতি রাজগক্ষুরাকে অমর্যাদা প্রদর্শন করিবার সাহস ও শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না। মৃত্যুর করাল ও গতিশীল মূর্তিকে সসম্মানে গম্যস্থলে যাইতে দিলাম। লাঙ্গুলের শেষ অংশ আর দেখিতে পাইতেছি না। পাঁড়েকে বলিলাম, চল, একে খোলস ছাড়িয়াছে, তাহার উপর দংশন করিয়াছে। এখন উহার বিশ্রামের প্রয়োজন আছে। পাঁড়ের মুখে ভাষা নাই। সে যন্ত্রচালিতের মত আদেশ পালন করিয়া চলিয়াছে।

একটু অগ্রসর হইতেই বারান্দার নিকট আসিয়া পড়িলাম, নারীর চিহ্নমাত্র সেখানে নাই। পূর্বোল্লিখিত ঘরের ভিতর ঢুকিবার সময় সজোরে কুলার মত বৃহৎ তালুর দ্বারা কেহ চপেটাঘাত করিয়াছিল। চকিতের ঘটনায় কেবল একটি বিরাট হস্ততালু লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ভাবিলাম, আর অগ্রসর হইয়া কাজ নাই। অকারণ মাঠের মাঝে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া লাভ কি? কিন্তু নারী সম্বন্ধে কৌতূহল দমন করিতে পারিতেছিলাম না। নারীর গঠনে মাদকতা ছিল। ভয় পাইলেও আর একবার তাহাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেছিলাম। খরগোশ যে নারী নয়, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম, কারণ বক্ষের চক্রাকার কঠিন মাংসচূড়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশের সুরার তীব্র উত্তেজনায় মস্তিষ্ক এতটা টলিয়া উঠিত কি না সন্দেহ।

ঘরে ঢুকিলাম। প্রবেশপথে দ্বার ও আমাদের মাঝে যেটুকু ব্যবধান ছিল, তাহারই ফাঁকে অসংখ্য বাদুড় ও চামচিকা উড়িয়া পলাইতে লাগিল। তবে কি চপেটাঘাত বাদুড়ের ডানার ঝাপটার? হইতেও পারে। কিন্তু নারী খরগোশ নয়—নারী কল্পনা নয়, নিতান্ত সে সত্য। যদিও বা সে প্রেত-লোকেরই সত্য হয়, তথাপি তাহাকে আর একবার দেখিব। দেহ স্পর্শ করি নাই, সম্পূর্ণ আকৃতি দেখি নাই। কেবল গঠনের তীব্র লালসাপূর্ণ আকর্ষণ উপলব্ধি করিয়াছি নিরবছিন্ন কল্পনার তাড়নায়—অস্পষ্ট আলোকে। অস্পষ্টতা যদি এই ভাবে মনকে মাতাল করিতে পারে, তাহা হইলে পূর্ণাবয়ব দেখিলে কি হইবে, অনুমান করিতে পারিতেছিলাম না। মাতাল যখন হইয়াছি, তখন তাহার শেষ দেখিতে হইবে। মৃত্যুতে অবহেলা করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। পাঁড়ে বয়সে ঘুণ ধরাইয়াছে ; সুতরাং সে কেমন

করিয়া বুঝিবে, যৌবনোন্মত্ত হইলে যুবকের মনের অবস্থা কি হইতে পারে!

স্থপতির খিলান দেখিলে মনে হয়, ঘরটিতে পাশ্চাত্য প্রভাব রহিয়াছে। পরিধিতে ঘরটি নিতান্ত ছোট নয়। অধিকাংশ জানালা দরজা বন্ধ। কোথাও গাছের শিকড় কব্জার সহজ গতি বন্ধ করিয়াছে, কোথাও দীর্ঘকাল ধরিয়া মরিচা পড়িয়া লোহাকে জমাট করিয়া দিয়াছে। দেওয়ালে ওস্তাদ কারিগরের নিখুঁত পঙ্খের লেপন এখনও স্থানে স্থানে সুস্পষ্ট। যেখানে পঙ্খ উঠিয়া গিয়াছে, সেখানে উইপোকা মানচিত্রের মত অসংখ্য রেখার দ্বারা সর্বত্র কাটিয়া ফেলিয়াছে। লণ্ঠনের আলোয় যতটুকু দেখা যায়, তাহাতে লক্ষ্য করিলাম, সিলিং কোন কালে সুনিপুণ চিত্রশিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল। ছবিগুলি শ্যাওলা ও ছাদ-নির্ঝরিত বারিপতনে কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির ধ্বংসের লীলায় পুরাতন শিল্পীর কাজের উপরেও কত নব রূপের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাবুক কেহ এখানে বসিলে, দেওয়ালে শ্যাওলা-অঙ্কিত ছবির নকল করিয়া শিল্পী হিসাবে নাম কিনিতে পারিত। ছবি সম্বন্ধে বাল্যকালে সামান্য দুর্বলতা ছিল, সেই কারণেই অপ্রত্যাশিতভাবে উহাদের নিকটে পাইয়া একবার চোখ না বুলাইয়া পারিলাম না। প্রথমেই আলো লইয়া ভাঙা জানালাটা পরীক্ষা করিলাম, নখরের আঁচড়ের চিহ্নমাত্র নাই। বদ্ধ দ্বার খুলিবার সাহস পাইতেছিলাম না। কিন্তু ভিতরে কি আছে জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলাম। ঝকঝকে সাদা মার্বেলের মেঝে দেখিয়া চমকিত হইলাম। যে অঞ্চলে মানুষ দিনের বেলা একলা চলিতে সাহস পায় না, সেইখানে নানাগল্পজড়িত ভগ্ন দেউলের ভিতর শ্বাপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া কে আসিল মেঝে পরিষ্কার করিতে! সন্দেহ গাঢ় হইয়া উঠিল। মেঝেতে পায়ের দাগ খুঁজিতে লাগিলাম। কোন জীবের পদচিহ্ন নাই, তবে সরীসৃপের গতায়াত যে আছে, তাহার প্রমাণ পাইলাম—দুই তিনটি খোলস ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখিয়া। দেওয়ালের উত্তর কোণে মেঝের একটি পাথর স্থানচ্যুত হইয়াছে। ঠিক তাহারই নীচে একটি সন্দেহজনক গর্ত এবং তাহার অতি নিকটে প্রায় সম্পূর্ণ একটি খোলস পড়িয়া আছে। মাথার অংশ পরীক্ষা করিতে আতঙ্কিত হইয়া উঠিলাম, একেবারে জাত সাপ। তবে কি এই গর্তটাই উহার আবাস-ভূমি? একান্তই যদি অনুমান সত্য হয়, তাহা

হইলে এখানে বেশীক্ষণ থাকা উচিত হইবে না। ফিরিয়া পাঁড়েকে বাহির হইতে বলিব ভাবিতেছি, এমন-সময় তাহার গলায় অর্ধজড়িত গোঁঙানির শব্দ শুনিলাম। মুখের দিকে তাকাইয়া দেখি, সে ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। যাহা বলিতে চাহিতেছে, তাহা প্রকাশ হইতেছে না—কেহ যেন অদৃশ্যভাবে তাহার

আলো পড়িলে দেখিলাম, মাথাটি অস্থিময় নরমুণ্ড

গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। কোন প্রকারে সে হস্ত উত্তোলন করিয়া ঘরের বিপরীত দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। স্থানটি লক্ষ্য করিতে মনে হইল, কার্নিসের হামাগুড়ি-দেওয়া জীবটি একটি ভগ্ন

সিঁড়ির ধাপের উপর আসিয়া উঠিয়াছে এবং পূর্ববৎ মাথা নাড়িতেছে। আলো পড়িতে দেখিলাম, মাথাটি অস্থিময় নরমুণ্ড। সমস্ত রক্ত হিম হইয়া আসিতে লাগিল।

একই সঙ্গে দুইজন ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। পাঁড়ে দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে দেখিয়া তাহাকে ঝাঁকুনি দিলাম। বুঝিলাম, সে জ্ঞান হারাইয়াছে। সে জড়পদার্থের মত বসিয়া পড়িল। বাধা দিলাম না। কম্বল তাহার পিঠে ঝুলিতেছিল, মেঝেতে পাতিয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিলাম। ঘরের ভিতর সজ্ঞানে জীবিত মানুষ এখন আমি একা। নিজের অজ্ঞাতে সিঁড়ির ধাপের দিকে আবার দৃষ্টি অনুধাবিত হইল, আর কিছু দেখিতে পাইলাম না।

আলোটা আরও জোর করিয়া পাঁড়ের কম্বলের কোণে একটু স্থান করিয়া তাহার নিকট বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরেই সে চক্ষু খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না ; অর্দ্ধনিমীলিত চোখে জল চাহিল।

তৃষ্ণার্তকে জল দিই কি প্রকারে? কাপড় ভিজাইয়া নদী হইতে জল আনিতে পারি, তবে গোক্ষুরা যে পথে ছোবল মারিয়াছিল, সেই দিক দিয়াই যাইতে হইবে, অন্য পথ তো জানা নাই! পাঁড়েকে অসহায় অবস্থায় ঘরে একলা ফেলিয়া যাইতে মন সায় দিতেছিল না। অথচ জল না পাইলে হয়তো আবার সে অজ্ঞান হইয়া যাইবে। সব দিক ভাবিয়া জল আনাই ঠিক করিলাম। আলো হাতে লইতেই পাঁড়ে নিতান্ত কাতর ইঙ্গিতের দ্বারা জানাইল, আমাকে একলা ফেলিয়া যাইও না। অগত্যা তাহার নিকট আবার বসিলাম। মাথায় হাত বুলাইতে সে ধীরে ধীরে তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। পাঁড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

অত্যন্ত শোকাতুর মানুষ যে ভাবে শ্মশানে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তি পায়, সেই ভাবে আমি ভয় সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া আসিতেছিলাম। বাঁচি বা মরি কিছুতেই আপত্তি নাই। পাঁড়ের লোহা-বাঁধানো লাঠিটা অতি নিকটে রাখিয়া সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। এক-নলা সরকারী ঠাসা বন্দুকটার কথা মনে পড়িল। থিয়েটার দেখিবার শখ ঘাড়ে না চাপিলে এত তাড়াহুড়া করিতাম না এবং বন্দুক সঙ্গে আনিতেও ভুল হইত না। তাহার

পর ভাবিলাম, থিয়েটারের হুজুক না থাকিলে আমি নিজেই বা আসিতাম কেন? বরাবর বরকন্দাজ দিয়া খাজনা পাঠাইয়াছি, এবারও তাহাই করিতাম। কি কুক্ষণেই শহরের ছেলেরা গ্রামে আসিয়াছিল! যদি বা আসিল তো বন-ভোজন করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলেই পারিত। শান্ত পল্লীজীবনে অযথা শহুরে আর্ট না দেখাইলে কি চলিত না! ভাবিলাম, আমার এলাকায় পাইলে কোন অছিলায় প্রহারের ব্যবস্থা করিব। তিন বৎসর ধরিয়া লাখ টাকা হস্তবুদের মহাল চালাইতেছি, গোটাকয়েক কলেজে-পড়া ছোকরাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিব না? এইটুকু ক্ষমতা যদি আমার নাই, তবে বাবুদের নায়েব-গিরি করিতেছি কিসের জন্য? ছোট তরফের বড়বাবু সেদিন কলিকাতার বড় রাস্তায় কোন বিলাত-ফেরতা বাঙালী সাহেবের মোটর হুকুম দিয়া ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছিলেন। কি হইয়াছিল তাঁহার? কতকগুলা চায়ের পার্টির জরিমানা হইয়াছিল মাত্র। হ্যাঃ, লেখাপড়া শিখিলেই বনিয়াদী জমিদারের মত হুকুম চালানো যায় কিনা! আর আমি সেই জমিদারের নায়েব হইয়া ঠিক করিলাম, প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে শহুরেদের শিক্ষা দিব। হ্যাঃ, জমিদারিতে কত কি কাণ্ড ঘটিয়া যাইতেছে, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। ও তো কয়টা শহুরে ছেলে মাত্র। কিন্তু ট্রামে উহাদের সাহস দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এক হাতে বইয়ের গাদা, তথাপি ঝট করিয়া চশমা খুলিয়া সেই ফিরিঙ্গীটাকে একটা ন্যালাক্ষ্যাপা মড়ার মত ছোকরা কি চড়ানটাই চড়াইয়া দিল! হ্যাঃ, শুধু হাতে ফিরিঙ্গী চড়ানো সোজা, আমাদের পোশাক-পরা পাঁগড়ি-আঁটা বরকন্দাজ মারা চলিবে না, হ্যাঃ। মনে মনে জমিদারের নায়েব বলিয়া বেশ গর্ব অনুভব করিতেছিলাম। আত্মস্তুতিতে অন্যমনস্ক কতকটা হইয়াছিলাম। শ্মশানে শৃগাল প্রহর ডাকিল। রাত্রি গভীরতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ভুল নাই। শরীর ঝিমঝিম করিতেছিল। দেওয়ালে ঠেসান দিবার উপায় থাকিলে আরাম বোধ করিতাম। কিন্তু এত স্যাঁৎসেঁতে যে, ভরসা পাইলাম না। অর্ধজাগ্রত অবস্থায় ঝিমাইতে লাগিলাম।

ঝিমানো অবস্থায় কতটা সময় কাটিয়াছিল স্মরণ নাই। ভয়, ক্লান্তি ইত্যাদির একত্র সমাবেশে সিদ্ধির নেশার মত লাগিতেছিল। নূতন উদ্যমে অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিলাম।

পায়ের তলায় মাটি থাকিলেও তাহা বিশ্বাস করিবার মত মনের অবস্থা নাই। মাথার উপর ছাদ তিরোহিত হইয়াছে। আমি অসীম ব্যোমের মাঝে বিচরণ করিতেছি। অথচ পৃথিবীর বাস্তবতাকে হারাই নাই।

মনের এই অস্বাভাবিক অবস্থা লইয়া, কেন বলিতে পারি না, ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কাঁটাঝোপ, সাপের গর্ত অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। নেশা তাহার অপূর্ব শক্তি দ্বারা আমাকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিয়াছে।

মাঝে মাঝে মাথাটা, মনে হইতেছিল, ধড় হইতে খানিকটা ঊর্ধ্বে উঠিয়া পড়িতেছে—হাত বাড়াইয়া তাহাকে আবার স্কন্ধের উপর যথাস্থানে বসাইয়া দিতেছি। মাথা বসিতেছে তো হাত দেহ হইতে খুলিয়া যাইতেছে। ভাবিলাম, ভগবান আমাদের গঠনে বল্টু এবং নাট-এর ব্যবস্থা করিলে প্রতি অঙ্গের ফিটিংগুলি এত আলগা হইত না। চুলায় যাক। ভগবান কি এইটুকু ভুল করিয়াই থামিয়াছেন? তাঁহার ভুলের বিরাট দৃষ্টান্ত তো আমি নিজে। আমি নায়েব না হইয়া যদি জমিদার হইয়া জন্মাইতাম! এতবড় ভুলের জন্য একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কে দায়ী হইতে পারে? ধর, আমি যদি জমিদার হইতাম, তাহা হইলে সর্বপ্রথম ঐ ম্যানেজারবাবুটিকে তাড়াইতাম। অল-ফাউন্ড হাজার টাকা মাহিনা। কাজের মধ্যে তো কেবল পরের মেয়েদের দেখা, আর বড় বড় সরকারী অফিসারদের সহিত চা খাওয়া। আমি জমিদার হইলে দশ লাখ টাকা মুনাফার সম্পত্তি, সোজা কথায় দুই কোটি টাকা দুই বৎসরে উড়াইয়া দিতাম। পাতালপুরীতে রাজ্যস্থাপনা করিতাম, পৃথিবীর যত সুন্দরীকে একসঙ্গে জড় করিতাম। তাহাদের কেবল দেখিতাম। হয়তো একটু আদরও করিতাম। কেহ জানিতে পারিত না, আমার চরিত্র স্খলিত হইয়াছে। দিনের বেলা মাটির উপর গদিতে আসিয়া বসিতাম। সোনার ফরসিতে দিল্লীর এক শত টাকা ভরির তামাক খাইতাম। সন্ধ্যার প্রারম্ভে গোলাপের রু, চামেলীর খস, ফরাসী শ্যাম্পেন সমস্ত আবেষ্টনীকে মশগুল করিয়া তুলিত। হাওয়ার মৃদু দোলায় হাজার-ডালি ভিনিসিয়ান ঝাড় ঠুনঠান করিয়া সঙ্গীতের মৃদু ধ্বনি তুলিত। এমনই একটি সময় আমার পদসেবা করিত পারস্য দেশের কন্যা সুন্দরী গৌরী। নিদ্রাবেশ আসিলে নিতান্ত

কৃপার সহিত বলিতাম, ব্যস্ করো। গৌরী উন্নত বক্ষ আবৃত করিয়া চলিয়া যাইত, আমি পাশ ফিরিয়া শুইতাম।

সিদ্ধি হয়তো বা খাইয়াছিলাম। কাছারি হইতে বাহির হইবার পূর্বে পাঁড়ে যে শরবতটা দিয়াছিল, তাহা একটু কেমন কেমন লাগিয়াছিল। কারণ যাহাই হউক, আমার চলা থামে নাই। দুই তিন বার হোঁচট খাইয়াছি, কিন্তু পাঁড়ের কৃপায় কোথাও ব্যথা পাই নাই। কেন জানি না, অনুভব করিতেছিলাম, আমার নেশা কাটিয়া গিয়াছে। দেখিলাম, সেই নারী অনতিদূরে অতৃপ্ত বাসনার জ্বলন্ত মূর্তি লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেহের প্রতি অঙ্গ হইতে কামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া আসিতেছে। তাপের সামনে যে কেহ পড়িবে, পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। নারী আমাকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। ইঙ্গিতের পিছনে দৃঢ় আদেশ ছিল, অমান্য করিতে পারিলাম না।

আমরা চলিয়াছি—ভগ্ন দেউলের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইতেই কবাটহীন তোরণদ্বার দেখিতে পাইলাম। নারী অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া আমাকে ভিতরে ঢুকিতে বলিল। প্রথমটা দ্বিধা আসিয়াছিল, কিন্তু তর্জনী তখনও দ্বারপথ স্থিরভাবে নির্দেশ করিতেছিল। ঢুকিলাম। নারীর রূপের বিষাক্ত ঝলক আমাকে মোহমুগ্ধ করিয়াছিল ; মাকড়সার কোন এক শ্রেণী মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও যেমন প্রেম করিতে অগ্রসর হয়। নারীর যৌবন প্রজ্বলিত অগ্নির মতই লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া আমাকে দগ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছিল। দেহের কোন গঠনই দেখিতে পাইতেছি না, তথাপি তাহার রূপ বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া আমার মনের উপর ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে।

গন্তব্য স্থান কোথায় জানা নাই। পথটি প্রাচীন সুড়ঙ্গের মত। হয়তো জটিল উদ্দেশ্যে কাটা হইয়াছিল। সুড়ঙ্গ আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃত অজগরের মত অসাড়ভাবে পড়িয়া আছে। ঊর্ধ্বে, নীচে, বামে, দক্ষিণে কেবল পাথরের দেওয়াল। পায়ের তলায় পিচ্ছিলতা অনুভব করিতেছি।

অনেকটা পথ আসিয়া পড়িয়াছি। হঠাৎ দেওয়ালে আমার মাথা ঠুকিয়া গেল। দেখিলাম, পথ রুদ্ধ। সামনেই একটি কাঠের দরজা কোন্ সুদূর অতীতে অসংখ্য লোহার পরিবেষ্টনে মজবুত করা হইয়াছিল। তলাটা এক

ফুট স্থান অধিকার করিয়া তখনও ঝুলিতেছে। কিন্তু কবাটের অপর অংশের সহিত যোগ নাই। নিকটে গিয়া লক্ষ্য করিলাম, তালা ভগ্ন। এখন কি করিব, বুঝিতে পারিতেছিলাম না। পিছন ফিরিয়া আদেশ লইতে গিয়া দেখি, নারী সেখানে নাই। ফিরিব কি না ভাবিতেছি, এমন সময় সামনের কবাট উন্মুক্ত হইয়া গেল। কব্জা ও জমাট মরিচার সংঘর্ষণে নিদ্রিত অতীতকে যেন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। চৌকাঠ পার হইতেই সন্দেহ হইল, একরাশ স্বর্ণমুদ্রার উপর পা দিয়া ফেলিয়াছি। মুদ্রার শব্দে সাংঘাতিক আকর্ষণ ছিল। কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না, এক মুঠা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিলাম। বাস্তবিকই সেগুলি স্বর্ণমুদ্রা, তবে দিল্লীর সম্রাটের নয়। কিছু সঞ্চয় করিবার লোভ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় শুনিলাম, পিছন দিক হইতে কেহ চাপা গলায় কাঁদিতেছে। হস্তস্থ স্বর্ণমুদ্রা সেইখানেই ফেলিয়া দিলাম। অনুমান করিলাম, ক্রন্দনরতা আর কেহই নয়—সেই নারী। হয়তো তাহাকে কেহ পীড়ন করিতেছে। অত্যাচারীকে বধ করিব বলিয়া তেজীয়ান হইয়া উঠিলাম। শব্দ অনুসরণ করিয়া উন্মুক্ত কবাটের দিকে ফিরিলাম। কিন্তু সেখানে আর কবাট নাই ; শূন্য প্রবেশপথ নিরেট পাষাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। দেওয়ালের স্থাপত্যও সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া গিয়াছে। কোথা হইতে ক্ষীণ আলো আসিতেছিল, একটি পথ আবিষ্কার করিলাম। ক্রন্দনের অস্পষ্ট ধ্বনি তখন শুনিতে পাইতেছি। কোথাও ধাপের পর ধাপ মাটির নীচে নামিতেছি। সুড়ঙ্গ চলিয়াছে—কোথায় জানিবার উপায় নাই। চলিতে চলিতে বুঝিলাম, যে পথে আসিয়াছিলাম, তাহার সহিত আমার গম্যস্থলের কোন মিল নাই। তবে কি ফিরিবার পথ আর খুঁজিয়া পাইব না? না পাই ক্ষতি কি? যে সুন্দরীর সন্ধানে আসিয়াছি, তাহার সহিত মিলনের জন্য সব কিছুই পরিত্যাগ করিতে পারি। বেশ খানিকটা পথ চলিয়াছিলাম। একটু দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইতেই আমার হাতের সামনে উজ্জ্বল একটি তীরের ফলক দেখিতে পাইলাম—মুখ তাহার বিপরীত দিকে, যেন কিছুর নির্ভুল সঙ্কেত। পরক্ষণে আমার পায়ের তলে চতুষ্কোণযুক্ত পথ বাহির হইয়া পড়িল। যে পাথরের দ্বারা পথটি গুপ্ত ছিল, তাহা নিজস্ব গতিতে ঠিক আমার দক্ষিণ দিকে আসিয়া থামিয়া গেল। তাহার পরই আর একটি স্বর্ণ-

ফলক; দেখিলাম, ফলকের নীচে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। পরমুহূর্তে স্বর্ণফলকের সম্মুখে আমার বাম দিকে একটি কারুকার্যখচিত দ্বার দেখিতে পাইলাম। দ্বারটি একটি অতি বৃহৎ ঘরের সহিত সংযুক্ত। হঠাৎ শুনিলাম, দুর্দান্ত শার্দূলের বজ্রনিনাদের মত গর্জন পাতালপুরী কম্পিত করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। ধীরে ধীরে নরখাদকের নির্দয় হুঙ্কার নিকটে আসিতে লাগিল। আর সামান্য অগ্রসর হইলেই আমাকে দেখিয়া ফেলিবে। পলাইবার পথ নাই, নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

এমন সময় শুনিলাম, বাম দিকের প্রশস্ত ঘরটিতে কে গুরুগম্ভীর গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। ধূপধুনার গন্ধে সমস্ত স্থানটি ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। চলিবার পথ দুইটি—একটি মাটির তলায়, আর একটি বাঁয়ে। মানুষের গলা অনুসরণ করিয়া দ্রুত বড় ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িলাম। কিন্তু সেখানে পূজার কোন অনুষ্ঠান দেখিতে পাইলাম না। বিস্মিত হইয়া কি করিব ভাবিতেছি, অকস্মাৎ ঘর আলোকিত হইয়া উঠিল। ঠিক আমার বিপরীত দিকে দেখিলাম, অসীমশক্তিসম্পন্ন কোন পুরুষ। নিম্ন অঙ্গে রক্তবর্ণ বসন, বিশাল বক্ষ রুদ্রাক্ষের মালার দ্বারা আবৃত। দৃষ্টি কঠোর, বাহু দৃঢ় পেশীবহুল। হস্তে পানীয় সহ নরমুণ্ডের অর্ধখণ্ড। ভগবানের পূজারী, তথাপি দৃষ্টির কঠোরতায় দয়ার লেশমাত্র নাই, যেন ধ্বংসের দেবতা নরমূর্তি গ্রহণ করিয়া আমার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। নিজের ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া অজ্ঞাতে খানিকটা পিছাইয়া আসিয়াছিলাম, দেওয়ালে হাত লাগিতেই লোহার শিকলের স্পর্শ অনুভব করিলাম। সামান্য দোলায় ঝনঝন শব্দ প্রতিটি দেওয়ালে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে আলোকের তীব্রতা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। অলৌকিক রশ্মি তখন সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই—সেই বিরাট পুরুষকে আর দেখিতে পাইতেছি না।

শিকল পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখি, ঠিক আমার মাথার উপর একটি নরমুণ্ড ঝুলিতেছে। নীচের চোয়াল তখনও খসিয়া পড়ে নাই। অসম্ভব কোন কারণে তখনও অপর অংশের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে। পায়ের তলায় দেহের বাকি অস্থিগুলি বিক্ষিপ্ত। শিহরিয়া উঠিলাম। আজই হয়তো আমার শেষ দিন। হঠাৎ যে পথে ঢুকিয়াছিলাম, সেই স্থানটিতে ভারী

পাথরের ঘর্ষণশব্দ শুনিলাম। ফিরিয়া দেখি, কারুকার্যখচিত কবাট সেখানে নাই। একটি অতি বৃহৎ চতুষ্কোণযুক্ত পাথর প্রবেশপথ রুদ্ধ করিতেছে। পাথর ও দেওয়ালের মাঝে যেটুকু ব্যবধান আছে, তাহা বাহির হইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বাহির হইবার কোন উপায় থাকিলেই বা কি হইত? ঐ পথেই তো ব্যাঘ্রের গর্জন শুনিয়াছি।

ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর বন্দী হইতে লাগিলাম। দ্বার ও দেওয়ালের সমতা এক হইতেই ভূমিকম্পের মত স্থানটি দুলিয়া উঠিল। শিকলে শিকলে কি সাংঘাতিক ঠোকাঠুকি! এই অবসরে আলো-আঁধারি কাটিয়া গিয়াছিল। কোথা হইতে অবর্ণনীয় এবং অস্বাভাবিক তেজোময় রশ্মি আসিতে লাগিল। দেখিলাম, নরকঙ্কালে ঘরটি পরিপূর্ণ। বহু মুণ্ড তখনও শিকলে আটকাইয়া আছে, কতক মেঝের উপর পড়িয়া আছে। অসাড় জড় প্রাণবান হইয়া নানাভাবে মুখব্যাদান করিতেছে। কতকাল ধরিয়া হত্যার ভয়াবহ শৌখিনতা এই ঘরটিতে চলিয়াছিল কেহ বলিতে পারে না। আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নিজের পায়ের শক্তির উপর বিশ্বাস হারাইতেছিলাম। দেওয়ালে ঠেস দিবার চেষ্টা করিতেই তাহা সামনে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। পায়ের তলায় মেঝেও যেন কুঞ্চিত হইয়া আসিতেছে—আমার নড়িবার শক্তি নাই। পরক্ষণেই স্পষ্ট দেখিলাম, দেওয়ালগুলি সব দিক হইতে ঘরের পরিধি ছোট করিয়া আনিতেছে—একেবারে পিষিয়া মারিবার ব্যবস্থা।

বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতে গলা হইতে জড়িত আর্তনাদ বাহির হইয়া আসিয়াছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে শুনিলাম, বামাকণ্ঠের অভয়বাণী।

পরক্ষণেই মনে হইল, ভোজরাজের প্রাসাদে দাঁড়াইয়া আছি। দেওয়ালগুলি সম্পূর্ণ কাঁচ দিয়া ঢাকা—তাহার উপর চৈনিক শিল্পী মনের সাধে ছবি আঁকিয়াছে। আসবাবপত্র মালিকের অতুলনীয় সুরুচি ও কল্পনাতীত ঐশ্বর্যের পরিচয় দেয়। মাঝে মাঝে রেশমের কাপড় ঝুলিতেছে, তাহার উপর আঁকা ছবি। জোরদার তুলির টানে কোন শিল্পী বাঁশঝোপের তলায় বাঘ আঁকিয়াছে। হয়তো যাহার গর্জন শুনিয়াছিলাম, তাহার প্রতিকৃতিই হইবে। কোন শিল্পী মাকড়সার জাল আঁকিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য কায়দায় গঠিত মূর্তিরও অভাব নাই। আবেষ্টনীর

পরিবর্তনে অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলাম। কতকটা দমিয়াও গেলাম। মাত্র দুই কোটি টাকায় তো এই শৌখিনতা কুলাইবে না। তবে কি পরজন্মেও আমার একমাত্র কাম্য বস্তু পাইব না?

আদেশের স্বরে কেহ বলিল, মহারানী দুর্গাদেবী আসিতেছেন। পথিক, মাথা নত কর

তালে তালে ঝমর ঝম, ঝমর ঝম—বহু নূপুরের ধ্বনি একই সঙ্গে শুনিতে পাইলাম। একেবারে পল্টনের অনুকরণে যেন সুন্দরীরা গোষ্ঠী-পরিবেষ্টিত হইয়া আমার দিকে হাঁটিয়া আসিতেছে। ঘরের স্থাপত্যও

অদ্ভুত রকমের। কোন্ দিক গোড়া, কোন্ দিক শেষ, বুঝিবার উপায় নাই। শঙ্খ বাজিতেই আদেশের স্বরে কেহ বলিল, মহারানী দুর্গাদেবী আসিতেছেন। পথিক, মাথা নত কর। তোমার স্থান স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনের পদতলে।

সিংহাসন তো এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই। বাস্তবিকই তো উহা অদূরে রক্ষিত রহিয়াছে। সামান্য একটি বসিবার স্থান, তাহাই কত রকমের বহুমূল্য জহর পান্না দিয়া অলঙ্কৃত। পাদপীঠও সোনার। তাহার উপর তুলার পাঁজ ও লাল মখমল দিয়া নরম করা হইয়াছে। হয়তো যিনি আসনে বসিবেন, তাঁহার পদযুগল চামড়ার নয়। তবে কি সিদ্ধির নেশা এখনও কাটে নাই? বিহ্বল হইয়া গিয়াছিলাম। অদৃশ্য ব্যক্তি গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে আদেশ করিল, পথিক মাথা নত কর। আদেশের সহিত বড় বড় দ্বার বন্ধ হইবার আওয়াজ কর্ণে আসিতে লাগিল।

আবার ঝমর ঝম—ঝমর ঝম—ঝমর ঝম। কিছুই দেখিতেছি না, কিন্তু নিশ্চয় বুঝিতেছি, যে সহচরীর দল মহারানীর সহিত আসিয়াছিল, তাহারা চলিয়া গেল। মাথাটা বেসামাল লাগিতেছিল। মনে হইল, আমি মহারানী দুর্গাদেবীর পদতলে বসিয়া পড়িয়াছি। স্থিরভাবে লক্ষ্য করিতেই বুঝিলাম, মহারানী আর কেহই নহেন, উনি সেই বিধবা। কিন্তু এ কি পরিবর্তন! পরিচ্ছদে মণিমুক্তা স্থানাভাবে হুড়ামুড়ি লাগাইয়াছে। এ সৌন্দর্য যেন সাজাইয়া রাখিবার, বাস্তবতার সহিত কোন যোগ নাই। কল্পনা যেন রূপকে নিখুঁত করিয়া ছাড়িয়াছে।

যাহার যৌবন অল্পক্ষণ পূর্বে আমার মনে লালসার আগুন জ্বালাইয়াছিল, পরিচ্ছদ ও আবেষ্টনীর পরিবর্তনে তাহাকেই ভিন্নভাবে দেখিতেছি। মাথা আপনা হইতেই নত হইয়া আসিতে চায়, আদেশের দ্বারা নত করাইবার প্রয়োজন হয় না।

ঘরে আমরা দুইজন ছাড়া এখন আর কেহ নাই। মহারানী সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পাদপীঠে আমার নিকট বসিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস অন্তরের চাপা দুঃখের দারুণ যন্ত্রণা ঘোষণা করিতে লাগিল। আচরণ যেন সহানুভূতি ভিক্ষার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। বেশ খানিকটা

সময় এই ভাবে কাটিবার পর মহারানী কি বলিতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না। পরক্ষণেই নিজের দুর্বলতাকে বশীভূত করিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। তাহার পর বলিতে শুরু করিলেন, পথিক, তুমি অপরিচিত। তথাপি যখন এতটা ভয়সঙ্কুল দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আমাকে জানিবার জন্যই আসিয়াছ, তখন আমার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া যাও। মহারানীর হৃদয় নিষ্পেষিত করিয়া আবার দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। তিনি বলিতে লাগিলেন—

আসিবার পথে যাহাদের কঙ্কাল দেখিয়াছ, তাহারা জীবিতাবস্থায় আমার বিচারেই নরপিশাচ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। ওই ঘরটা নারী-নির্যাতনকারীদের জন্য প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। অনাহারে, অন্ধকূপে ধীরে ধীরে মৃত্যুকে ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধি করাইয়া উহাদের জগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করানো হইত। প্রবল দুর্বলকে ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে তাহাকে বাঘের ঘরে ফেলিয়া দিতাম।

এই ঘরটি তোমার মত কামুকদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ভোগের নিত্য নব উত্তেজনায় কামুক জর্জরিত হইয়া উঠিলে তাহাকে চিরজীবনের জন্য নিস্তেজ ও অকর্মণ্য করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। রুদ্রাক্ষের মালাভূষিত মহাপুরুষ আমার আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। কাপালিকের বেশ পরিয়া নরহন্তার বিচার করিতেন এবং কোন বিচারই আমার সম্মতি ব্যতিরেকে শেষ সিদ্ধান্ত হইত না। এই সিংহাসন আমার আরাধ্যদেবতা মহারাজা রঘুনন্দনের। এখন এই ঘরটি আমি নিজে ব্যবহার করিতেছি।

এইবার বোধ হয় বিশ্বাস করিবে, রাজ্যচালনায় মানুষকে কত কঠোর হইতে হয়। তথাপি আমার অন্তরে দয়া ছিল। আমার চরিত্রে বাস্তবিকই কোন দোষ নাই, কিন্তু লোকে জানে, আমি কুলটা—আমি আত্মঘাতিনী। এ ধারণা যে ভুল, তাহা বহির্জগতে তোমাকে প্রকাশ করিতে হইবে। আমার প্রতি দারুণ অবিচার চলিয়াছে। ইহা অসহ্য হইলেও প্রতিবাদ করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া পাই নাই। কারণ কেহই আমার সন্ধানে এতটা আসিতে পারে নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ দুই একজন আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই ফিরিয়া যান নাই। মাঝপথেই তাঁহাদের অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। দস্যুর দল রত্ন-

সন্ধানে আসিয়াছিল, কিন্তু রত্ন লইয়া ফিরে নাই। ভীতি তাহাদের ভবলীলা প্রথম দ্বারপথেই শেষ করিয়া দিয়াছিল। তুমি তাহাদের পরিত্যক্ত স্বর্ণমুদ্রা কুড়াইয়া লইয়াছিলে; কিন্তু অর্থের প্রলোভন তোমার অনুসন্ধিৎসু মনকে নিস্তেজ করিয়া দেয় নাই। যে কারণেই আমার প্রতি আসক্তি আসিয়া থাকুক, তাহার তুমি অমর্যাদা কর নাই। আমাকে পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য তেজীয়ান হইয়া উঠিয়াছিলে মৃত্যুকে অবহেলা করিয়া। তুমি বিশ্বাস-যোগ্য—তোমাকে সব কাহিনী অকপটে বলিব। ওগো, জীবন্ত জগতে জানাইয়া দিও, আমি বাস্তবিকই কুলটা নই। মহারানী আবেগে নিজ মর্যাদা ভুলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া চলিলেন, ওগো অপরিচিত অতিথি, আমার আত্মার তৃপ্তির জন্য এই অনুরোধটি রাখিবে না কি?

মহারানী অল্পক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পুনরায় আরম্ভ করিলেন, আজ যে স্থানটিকে তোমরা বল্লভপুরের মাঠ বলিয়া জান, উহা আমার রাজ্য-সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কালীমন্দির আমার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের কাহাকেও অভুক্ত রাখিব না বলিয়া এই বিরাট পান্থশালার প্রয়োজন হইয়াছিল। অভুক্ত কথাটা শুনিয়া নিশ্চয় আশ্চর্যান্বিত হইতেছ। মন্দির ও পান্থশালার প্রয়োজন কেন হইয়াছিল বলিতেছি। তখন নবাবের সৈন্যের অভাব প্রায় লাগিয়া থাকিত। তাঁহাকে লোক সরবরাহ করিতে করিতে আমার কোতোয়ালিতে মানুষের অভাব ঘটিতে লাগিল। এই সুযোগে ডাকাত ও ছোট ছোট বর্গীর দল নিরীহ পল্লীবাসীদের লুণ্ঠন করিয়া নিঃসহায় করিয়া ফেলিতে লাগিল। ঠিক এই সময় ফসল না হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষও যোগ দিল। ভদ্রসন্তান অনাহারে মরিতে লাগিল, তথাপি ভিক্ষার দ্বারা প্রাণে বাঁচিবার চেষ্টা করিল না। দেশকে এই ভাবে লোকক্ষয় হইতে রক্ষা করিতে হইলে দেবীর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় দেখিলাম না। আমি জানিতাম, মানুষের নিকট মানুষ সব সময় মাথা নত করিতে না পারিলেও দেবীর দ্বারে অন্ন লইতে কাহারও বাধিবে না। ইহাই মন্দির প্রতিষ্ঠা ও পান্থশালার ক্ষুদ্র ইতিহাস। এইবার কুলটার কথা বলি, যে কাহিনী বলিবার জন্য এতকাল তোমার অপেক্ষায় ছিলাম।

সে আজ দুই শত বৎসর আগের কথা। যৌবন তখন দেহ-মনকে ঘিরিয়া

ধরিয়াছে। বৃদ্ধ স্বামী আমাকে নিঃসন্তান রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। আমার পিতাও তাঁহার অনুগামী হইলেন। আমি দুইটি রাজ্যের মহারানী হইলাম। পাশাপাশি দুইটি ছোট রাজ্য এক করিবার জন্যই আমার পিতা মহারাজা সূর্যসিংহ এই বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমার মতামত জানা তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই। প্রজার মঙ্গলের জন্য কন্যাকে স্থবিরের নিকট উৎসর্গ করিয়াছিলেন—রাজনীতির কূটবিচার আমাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করিয়াছিল। আমি অভিযোগ করি নাই, ভবিতব্যকে মানিয়া লইয়াছিলাম।

বিবাহের পরদিন স্বামীর প্রাসাদে মহাসমারোহে মহারানীর সিংহাসনে অধিরূঢ়া হইলাম। প্রজাদের জয়োল্লাসে মনে হইল, আমাকে উহারা মহারানী বলিয়া অকপটে মানিয়াছে। নিমন্ত্রিতদের আনন্দবর্ধনের জন্য দরবার-ঘরে নানা দেশ হইতে নর্তকীরা আসিয়াছিল। অভিষেক শেষ হইবার পর দরবার ভঙ্গ হইল। আমাকে মহারাজার আত্মীয়ারা বাসরগৃহে লইয়া গেলেন।

ঘরটি ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া ছিল। মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল। ভাবিলাম, স্বামী বৃদ্ধ হইলেই বা? তিনি স্বামী তো! ধীরে ধীরে নানা উপদেশ দিয়া ও রসিকতা করিয়া সকলেই চলিয়া গেলেন। পরিচারিকা অনতিবিলম্বে মহারাজার আগমনবার্তা জানাইল এবং কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া আমাকে বিবস্ত্রা হইতে বলিল। প্রস্তাবটি এমন আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক—বিশেষ করিয়া যখন একটি সামান্য দাসীর নিকট হইতে আসিল, তখন ভাবিলাম, উহার মস্তিষ্ক সুস্থ নাই। দাসীকে ক্ষমা করিয়া মহারাজার আসার অপেক্ষায় রহিলাম। দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল। তিনি আসিলেন গভীর রাত্রে দুইজন নটীর স্কন্ধে ভর করিয়া। নটীদের বেশ দেখিয়া ঘৃণায় মন ভরিয়া উঠিল। মহারাজ কি তবে আমাকে নিতান্ত বার-বনিতার মত ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন? মহারাজকে পালঙ্কে বসাইয়া দেওয়া হইল। সকলেই সুরার কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া গিয়াছে। সহজ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি কাহারও নাই। একজন নটী অশ্রাব্য ভাষায় রসিকতা করিয়া হঠাৎ পিছন হইতে আমাকে সামনে ঠেলিয়া দিল। আমি মহারাজার ক্রোড়ের উপর আসিয়া পড়িলাম। এই বীভৎস রসিকতা তিনি

প্রাণ ভরিয়া সমর্থন করিলেন। আমি কি করিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। মহারাজার মুখের দিকে তাকাইবার উপায় নাই। লালা-মিশ্রিত অর্ধচর্বিত খাদ্যের কতক অংশ মুখ হইতে কখনও বাহির হইয়া আসিতেছে, কখনও তাহা ভিতরে টানিয়া লইতেছেন। স্থানটি ক্রমে আমার নিকট নরকের মত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে অপর নটী আমার নিকট আসিয়া বস্ত্র টানিবার চেষ্টা করিল। মহারাজা ইহা দেখিয়া বাহবা দিয়া উঠিলেন। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রথম দ্বারীর হস্ত হইতে উলঙ্গ তরবারি কাড়িয়া লইলাম। সে এমন অদ্ভুত ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। হতভম্ব হইয়া গেল। কালবিলম্ব না করিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিলাম। উভয় নটীকে আমার সামনে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বলিলাম। আজ্ঞা অমান্য করিবার শক্তি তাহাদের ছিল না। একজন করজোড়ে ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা চাহিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রার্থনা সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইবার পূর্বেই দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িল। আর একজন পলাইবার চেষ্টা করিতেই পাশ্চাত্য প্রথায় তরবারিকে কিরিচের মত ব্যবহার করিলাম। তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া অস্ত্র পৃষ্ঠের দিকে খানিকটা বাহির হইয়া আসিল। আমি নরঘাতিনী হইয়া ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া রহিলাম। মহারাজা এই ভয়াবহ দৃশ্যকেও পরমানন্দে বাহবা দিয়া উপভোগ করিলেন। তাহার পর আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, নিজেকে এলাইয়া দিলেন।

পুষ্পসজ্জিত বাসরঘর তখন রক্তপ্লাবনে ধৌত হইয়া গিয়াছে। দ্বার উন্মুক্ত। প্রহরী সবই দেখিতেছিল। তাহার মুখে বাক্য নাই, নিশ্চলভাবে আদেশের অপেক্ষা করিতেছে। দুইটি নোংরা জীবকে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে সরাইয়া উপযুক্ত স্থানে দাহ করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। প্রহরী চলিয়া গেল। অল্প সময়ের ভিতরেই তাহার অধীনের আটজন সৈন্যকে লইয়া আসিল। নটীর নৃত্য শেষ হইল নিজের রক্তে পদরঞ্জিত করিয়া। শিক্ষাকালীন অসিখেলায় বহুবার মানুষের রক্ত দেখিয়াছি, কখনও বিচলিত হই নাই। কিন্তু বাসরঘরের ঘটনা আমাকে দুর্বল করিয়া আনিতেছিল। রক্ত ইতিমধ্যে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। ভিন্ন প্রহরীকে নূতন গালিচা আনিতে

আদেশ করিলাম। সে আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, অন্তঃপুরিকারা জানিতে পারিলে প্রাসাদে আমার স্থান কোথায় থাকিবে! ক্রূর চক্রান্তে মস্তিষ্ক পূর্ণ হইয়া উঠিল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যাহা করিতে হইবে ঠিক করিয়া ফেলিলাম। প্রহরীরা নূতন গালিচা লইয়া ফিরিতেই প্রাসাদের পুষ্পোদ্যান হইতে যথেষ্ট ফুল আনিতে বলিলাম। নূতন গালিচা পাতা হইল। আবার পুষ্পে তাহা ভরিয়া গেল। কিন্তু রক্তের জমাট দৃশ্যের স্মৃতি অন্তরকে কলুষিত করিয়া দিতেছিল। আমি মহারাজার পার্শ্বে গিয়া শুইলাম। ভোর হইতেই শানাই বাজিয়া উঠিল এবং অল্প-সময়ের ভিতর প্রাসাদ আবার উৎসবের নূতন আয়োজনে মুখরিত হইয়া উঠিল। কেহ জানিল না, বিদেশী নটীদের কি হইল।

বিবাহের পর বৎসর না কাটিতেই হঠাৎ একদিন হৃদ্‌রোগ মহারাজার ভবলীলা শেষ করিয়া দিল। তাহার পর পিতা স্বর্গগামী হইলেন, পূর্বেই ইহা বলিয়াছি।

পিতা ও স্বামীর মৃত্যুর পর উভয় রাজ্য চালনার ভার পড়িল আমার উপর। আমি মহারানী হইলাম। রাজ্য-চালনার কঠোর কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করিতেছিলাম। কিন্তু কোন কাজেই শান্তি পাইতেছিলাম না। জননী হইবার আকাঙ্ক্ষা ও তাহার অসম্ভবতা আমাকে সব কাজেই উদাসীন করিয়া আনিতে লাগিল। নানা উপায়ে আত্মপীড়ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু অতৃপ্ত বাসনা আমাকে ক্রমান্বয়ে সকল নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছিল। মনের এমন অধোগতি হইল যে, মাঝে মাঝে বিচারাসনে বসিয়া কুলটার নীচ কীর্তিকে প্রশ্রয় দিতে লাগিলাম। নিজের চরিত্রের স্খলন দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছিলাম। হয়তো অদূরভবিষ্যতে রাজ্য ব্যভিচারে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ঠিক করিলাম, কিছুদিন তীর্থভ্রমণ করিয়া আসি। সাব্যস্ত হইল কাশীধামে যাওয়া। আড়ম্বরে প্রবৃত্তি ছিল না। সামান্য কয়জন লস্কর ও দাসদাসী সহ বাহির হইয়া পড়িলাম।

দূরপথে যাইতে হইলে তখন পাল্কি, গো অথবা উষ্ট্রযান ছাড়া উপায় ছিল না। চলার পথে দস্যু ও ঠগীর আক্রমণের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। আমাদের লস্করের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। সুতরাং নির্বিঘ্নে

তিন রাত্রির পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম। আমার জীবনের পরিবর্তন ঘটিল তীর্থযাত্রার মাঝপথে।

অনেকটা পথ হাঁটিয়া সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বিপ্রহরে যেখানে আস্তানা গাড়া হইয়াছিল, সেখান হইতে উঠিতে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া তাঁবু উঠাইতে আদেশ করিলাম। ঠিক এই সময় কোথা হইতে ডাকাতের দল আমাদের আক্রমণ করিল। অপ্রস্তুত অবস্থায় লস্কররা অস্ত্র লইবার মত যথেষ্ট সময় পাইল না। দেখিতে দেখিতে সব কয়জন ভূমিসাৎ হইল। সব কয়জনই প্রাণ উৎসর্গ করিল। এ অবস্থায় নিজে অস্ত্র না ধরিলে আত্মসম্মান রক্ষা হইবার উপায় নাই। তরবারিহস্তে পাল্কি হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। ডাকাতদের সম্মুখীন হইতেই তাহাদের বিচিত্র আচরণে বিস্মিত হইয়া গেলাম। সকলে অস্ত্রচালনা বন্ধ করিয়াছে সর্দার-মুখোচ্চারিত একটিমাত্র শব্দে—থাম। সকলে কাঠের পুতুলের মত অসাড়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বশ্যতার অদ্ভুত নিদর্শন দেখিয়া চমকিত হইলাম।

প্রথম দর্শনেই সর্দারের রূপে মুগ্ধ হইলাম। স্বচ্ছ পীতাভ উত্তরীয় যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে দেহের উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সংস্পর্শে। দীর্ঘকায়, কবাট-বক্ষ, সিংহকটি পুরুষ যেন সৌন্দর্যের নিখুঁত আদর্শ হইয়া আমাকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। মানুষ এত সুন্দর হইতে পারে ধারণা করিতে পারি নাই। মন্ত্রমুগ্ধের মত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। রূপের আকর্ষণ আমার দৃষ্টি বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। আমি আত্মহারা হইয়া গেলাম। আমার হাত হইতে তরবারি স্খলিত হইয়া পড়িল।

সর্দ্দার শান্তভাবে আমার নিকট আসিয়া ধূলিলুণ্ঠিত শাণিত অস্ত্র আমার সামনে তুলিয়া ধরিলেন। তাঁহার শুভ্র অঙ্গুলিপ্রান্তের স্পর্শ বোধ হয় আমি পাইয়াছিলাম। দেহ-মনে একটি নূতন পুলক আবিষ্কার করিলাম। ভাবিলাম, আর একবার তরবারি ফেলিয়া দিই, আবার বলিষ্ঠ অথচ সুগঠিত অঙ্গুলির স্পর্শ লাগুক। হাতে তখন আমার তরবারি রহিয়াছে, এমন সময় সর্দার সম্মান প্রদর্শন করিয়া বলিল, আমি স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার করি না। যাহার সৌন্দর্য এক মুহূর্ত আগে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল,

তাহারই অবজ্ঞা আমার আত্মাভিমানকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। আমার অহমিকা ছিল, অসিক্রীড়ায় গুরুদেব ছাড়া এ অঞ্চলে আমার সমকক্ষতা কেহ দাবি করিতে পারে না। সর্দারের ধৃষ্টতা এক মুহূর্তে চুরমার করিয়া দিবার সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া ফেলিলাম। বাম দিক হইতে দক্ষিণে সর্বশক্তি দিয়া অসি চালাইলাম। চকিতে আমার অস্ত্র দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধূলিস্পর্শ করিল। পুরুষ যেন এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন।

অস্ত্রের ভগ্নাংশ তুলিয়া তিনি নিজের কোমরবন্ধে রাখিলেন। এত বড় অপমান আমাকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। কটিবন্ধের ছোরা তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া আততায়ীকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পুরুষ আমার সঙ্কল্প বুঝিয়া নিজের তরবারি আমার পদতলে ফেলিয়া দিলেন এবং নিরস্ত্রভাবে আমার আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষতস্থানে লবণের ছিটা দেওয়া হইল। উপযুক্ত দ্বন্দ্বে পরাজিত হইলে হার স্বীকার করা অস্বাভাবিক নয় ; কিন্তু যুদ্ধের মাঝে শত্রুর কৃপা অসহ্য।

পুরুষকে আমি অস্ত্র তুলিয়া লইতে আদেশ করিলাম। দস্যুর সর্দার সম্মান প্রদর্শন করিয়া হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনি ছোরা ব্যবহার করিতে পারেন। আমি নিরস্ত্র হইলেও আত্মরক্ষার স্পর্দ্ধা রাখি। আমাদের বচসার মাঝে দস্যুর দল নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়াছিল। বুঝিলাম, কি ভাবে প্রভুত্ব করিতে হয় সর্দ্দার তাহা জানে। আমি উত্তর করিলাম, নিরস্ত্রের বিরুদ্ধে কখনও অস্ত্র ব্যবহার করি নাই। তোমার পৌরুষ থাকিলে লোক-বলের শক্তি লইয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতে না। তুমি বীর স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এখন আমার নিকট অস্ত্র আছে। শক্তির অভাব না হইয়া থাকিলে আমার শাণিত ছোরাকে তোমার দীর্ঘ তরবারি দিয়া অভ্যর্থনা কর।

পুরুষ বলিলেন, মহারানী, এখন তর্কের সময় নাই। আপনি অস্ত্র ব্যবহার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেই আমরা গন্তব্যস্থানে যাইতে পারি। আপনি আমার বন্দী।

জীবনে কখনও সাধারণকে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আদেশের স্বরে এই ভাবে কথা বলিতে শুনি নাই। নিজের শক্তির প্রতি এইরূপ অটল বিশ্বাসও কাহারও দেখি নাই। ভাষাও মার্জ্জিত, অথচ দৃঢ়। আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ

করিতে হইলে মনে যথেষ্ট বলের প্রয়োজন হয়।

আমি জোর দিয়াই বলিলাম, আমি কে জানিলে তোমার ধৃষ্টতা দেখাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে। গুরু শ্যামসুন্দরের নাম নিশ্চয় শুনিয়াছ, আমি তাঁহার প্রধানা শিষ্যা।

দলপতি শান্তভাবে উত্তর করিলেন, আচার্য শ্যামসুন্দরকে আমি চিনি এবং ইহাও জানি আপনি মহারানী দুর্গাদেবী, যাঁহার প্রতাপের খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং যে খ্যাতির আশ্রয় লইয়া কুলটারা দিনের পর দিন নির্বিবাদে সংখ্যা বাড়াইয়া চলিয়াছে। কোতোয়ালির সর্বাধিকারী হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং দেওয়ান পর্যন্ত ভদ্রমহিলাকে কুলটা প্রমাণ করাইয়া বলপ্রয়োগে তাহাদের ভোগ করিতেছে। বিশৃঙ্খলা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধান বিচারপতির উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আপনি এই অঘটন ঘটাইয়াছেন। পূজনীয় শ্যামসুন্দর আপনার গুণকীর্তন এমনভাবেই করিতেন, যাহাতে অনেক সময় আপনাকে দেবী ভাবিয়াছি। আজ মানবীকে দেখিয়া দুঃখিত হই নাই, তবে দেবী ভাবিতে পারিতেছি না। কত দিন ধরিয়া এই শুভ মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করিয়াছি, আপনি হয়তো জানেন না। শুধু আপনাকে দেখিবার জন্য কত সময় নিজের কর্তব্য অবহেলা করিয়া আপনার ঘোষণা শুনিবার উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছি। দূর হইতে আপনাকে দেখিতাম, কারণ নিকটে আসিবার উপায় ছিল না—আমার মাথার দাম অযথা অত্যন্ত বেশী হওয়ায়। আমার মাথার বিনিময়ে প্রচুর অর্থ ঘোষণা করিয়া এই নগণ্য বস্তুকে কেন যে দুর্মূল্য করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কৌতূহল দমন করিতে পারিতাম না। আমার সম্বন্ধে আপনি ঘোষণাপত্র পড়িবেন—ডঙ্কার দ্বারা প্রচারিত হইলেই আমি সেই স্থানটিতে ভিড়ের মাঝে অপেক্ষা করিতাম এবং আপনাকে দূর হইতে প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতাম। আপনার রূপে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। কি বলিতেন, তাহা হয়তো অনেক সময় শুনিতামও না। আপনার রূপ আমাকে উন্মাদ না করিলে আজ হয়তো অশিক্ষিত লস্করগুলি প্রাণ হারাইত না। নেহাৎ মহিষের মত গুঁতাইতে আসিয়া লোকগুলি মারা পড়িল।

দস্যুর নির্লজ্জ আচরণ সহ্য করিতে পারিলাম না। বাধা দিয়া রূঢ়ভাবে

বলিলাম, মানুষ মারিয়া আলাপ করা কি তোমার নিত্য কর্ম?

দলপতি উত্তর দিলেন, মানুষ মারাই আমার ধর্ম নয়। তবে প্রয়োজন বোধ করিলে বধ করিতে আমার বাধে না। আমি যাহাদের মারি, তাহারা অনেক সময় অস্ত্রের সাহায্য লইয়া আত্মরক্ষার অবকাশ পায়। কিন্তু আপনি বিচারের অছিলায় সামান্য কোতোয়ালের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া কত সময় নিরীহ মানুষকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

সামান্য দস্যু রাজনীতির সন্ধান রাখে কি করিয়া? কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি?

দস্যুদলপতি তেজোময় মূর্তি লইয়া উত্তর করিল, সর্দার রঘুনন্দন ছাড়া আপনার অসি দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে কে? পূজনীয় শ্যামসুন্দর আমার পিতা। আমার অসি-শিক্ষা পিতৃদেবের নিকট।

স্তব্ধ হইয়া গেলাম ; প্রাতঃস্মরণীয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গুরুদেব শ্যামসুন্দরের পুত্র রঘুনন্দন দস্যুর দলপতি! এই রঘুনন্দনের মাথার জন্য নিজে সাধারণের সামনে দাঁড়াইয়া কতবার লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছি, কিন্তু কেহই সন্ধান দিতে পারে নাই! আজ সেই দস্যুর সামনে নিতান্ত অসহায়ভাবে বন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া আছি! মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। নিজেকে তিরস্কার করিলাম, নীচের প্রতি আসক্ত হইয়াছিলাম বলিয়া। অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত বলিলাম, দস্যুবৃত্তি তোমার জীবিকা, লুণ্ঠনের দ্বারা অর্থসংগ্রহ করাই তোমার বাঁচিয়া থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমাকে ছাড়িয়া দিলে প্রচুর অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে ; আমাকে বিশ্বাস করিতে পার। তবে তুমি যাহা পাইবার আশায় এতগুলি প্রাণীহত্যা করিলে তাহা পাইতে হইলে আর একটি জীবকে মরিতে হইবে। আমার জীবন্ত দেহ স্পর্শ করিবার পূর্বে তাহাকে নিতান্তই জড় করিয়া দিব। আমি মৃত্যুকে কখনও ভয় করিতে শিখি নাই।

রঘুনন্দন উত্তর করিল, বর্তমান ঘটনার সহিত অর্থের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যদি থাকিত, তাহা হইলেও আপনি দিতে পারিতেন না ; কারণ দেওয়ান আপনার রাজকোষ নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। রাজকর্মচারীরা বেতন পাইতেছে না, সব কয়টি পুষ্করিণী কাটার কাজ বন্ধ হইয়াছে ; সংক্ষেপে অরাজকতার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় দেওয়ানকে

বধ না করিয়া উপায় ছিল না। দেওয়ান বধ হইলেও রাজ্য যাহাতে সহজ-ভাবে চলে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি। রাজ্য সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। আপনার রাজ্য এবং সৈন্য সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার আছে। তবে ইহা উপযুক্ত স্থান ও সময় নহে। আমার সঙ্গে চলুন, পরে বলিব।

রঘুনন্দন প্রত্যেকটি কথা এমন দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করিল যে, তাহা না মানিয়া উপায় ছিল না। মনে হইতেছিল, সুন্দর পুরুষ যেন আদেশ মানাইবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমি বন্দী—স্বীকার করিলাম। অদূরে পানসি ও বজরা অপেক্ষা করিতেছিল। রঘুনন্দন সেই দিক নির্দেশ করিয়া অগ্রগামী হইতে অনুরোধ করিল।

এইখানে নারী যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। তাহার পর খানিকটা দম লইয়া আবার বলিয়া চলিলেন—

দিনের আলো অল্প সময়ের ভিতর তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। দাঁড়ের ছপছপ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। সামনের জানালাটা খুলিয়া কালো জলের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। আশ্চর্য হইলাম, একটি দাঁড়ীও কথা বলিতেছে না। রঘুনন্দন আমার সঙ্গে চলিয়াছে কি না, তাহাও জানিবার উপায় নাই। রঘুনন্দনের অতুলনীয় রূপের প্রভাব সকল সংস্কার চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেছিল। তাহার চরিত্র ভাবিতে গিয়া ঘৃণায় মন তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তথাপি তাহার চিন্তা মন হইতে সরাইয়া দিতে পারিতেছিলাম না। সকল নীতির বাধা অসঙ্গত বিচারে নিজেই ধ্বংস করিয়া দিতেছিলাম—তাহার দেহ স্পর্শ করিবার জন্য প্রাণ মাঝে মাঝে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। সেই প্রথম পুরুষ, যে নিঃসঙ্কোচে আমার রূপের প্রশংসা করিয়াছিল, নিরবচ্ছিন্ন নারী হিসাবে পাইবার কামনা রঘুনন্দন ছাড়া আর কেহ করে নাই। এই সূত্রে স্থবির বৃদ্ধ স্বামীর কথা মনে পড়িল। বাসর-ঘরের কথা ভাবিতে লাগিলাম। বাসররাত্রির পর একদিনের জন্যও স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। অন্দরমহল ও বাহিরের মাঝে কঠিন ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিলাম। মহারাজা বহু সাধ্যসাধনা করিয়াও আমার নিকট

আসিতে পারেন নাই। রঘুনন্দন নীচ দস্যু ; তবে কেন তাহার সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি! সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। যখন এইরূপ সম্ভব এবং অসম্ভব অনেক কথা ভাবিতেছিলাম, হয়তো সেই সময়ের ভিতর আমার বজরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছিল। হঠাৎ তীব্র আলোকরশ্মি মুখে পড়ায় চমকিত হইয়া উঠিলাম। সামনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই দেখিলাম, অদূরে একটি বৃহৎ সমুদ্রগামী জাহাজ। আকার তাহার ফরাসী ধরনের। জাহাজের উপর লোকে লোকারণ্য। সকলেই ব্যস্ত, ছুটাছুটি করিতেছে। বিদেশী সুরের সহিত দেশী তাল মিশ্রিত হইয়া হাওয়ার তরঙ্গে সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে। যেন একটি মহা উৎসবের সূচনা মাত্র। ডাকাত মহারানী দুর্গাদেবীকে বন্দী করিয়াছে। সংবাদটি নিশ্চয় পার্নাসির লোকেরা বহু আগেই পৌঁছাইয়া দিয়াছে। বড় রকমের উৎকোচের ব্যবস্থা হইয়াছে—রঘুনন্দন নিশ্চয়ই ফরাসী দস্যুর আজ্ঞাবহ সামান্য একটি দলের সর্দার মাত্র। ফরাসী দস্যুরাজ যাহা আদেশ করিয়াছেন, রঘুনন্দন তাহাই পালন করিয়াছে। এইবার বেশ ভীত হইয়া পড়িলাম। আমি কি তাহা হইলে ম্লেচ্ছের ভোগ-লালসা মিটাইবার জন্য চলিয়াছি? অসম্ভব। আমার হীরক-অঙ্গুরীয়ের দিকে তাকাইতেই নিশ্চিন্ত হইলাম। ইহার তলায় যে বিষ আছে, তাহা যে কোন মানুষকে শেষ করিতে আধ মিনিটের বেশি সময় লাগিবে না। ম্লেচ্ছ আমার দেহ স্পর্শ করিবে? মনে মনে হাসিলাম। তাহার পর বাস্তবিকই হীরক উত্তোলন করিয়া দেখিলাম। সিক্ত পাতলা তুলায় হলাহল যথাস্থানে রহিয়াছে। মৃত্যুর লোল জিহ্বা যেন লকলক করিতেছে। কি সাংঘাতিক আকর্ষণী শক্তি তাহার! হৃদয় দুরু দুরু করিয়া উঠে। হীরক দ্বারা হলাহল আবৃত করিলাম। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি, তথাপি হৃদয়ে এই কম্পন কেন? মনে মনে হাসিলাম।

ইতিমধ্যে আমার বজরা জাহাজের আরও নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। সহসা নৌকা হইতে তূরীধ্বনি হইল। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য প্রতিধ্বনি শুনিলাম জাহাজের উপর হইতে। বজরা আরও নিকটে আসিতেই জাহাজের আলো একের পর এক নিবিয়া গেল। অদ্ভুত আচরণ! পরক্ষণেই অনুমান

করিলাম, বজরার তলা মাটি স্পর্শ করিয়াছে। আমার নিজের বজরায় এইরূপ ঘটিলে মাঝি ও দাঁড়ীর দল চীৎকার করিয়া হাট বসাইত। নিঃশব্দে নোঙ্গর ফেলা হইল। তাহার পর দেখিলাম, দুই তলা সমান উঁচু জাহাজের প্রান্ত হইতে একজন শ্বেতাঙ্গ সেনাপতির বেশে নামিয়া আসিতেছেন। পিছনে সৈন্যদল। সকলের হাতে বিদেশী আলো। অঙ্গুরীয়ের প্রতি আর একবার তাকাইলাম। উৎসবের আয়োজন কিসের, জানিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু সেনাপতির ব্যবহার কিরূপ হইবে যতক্ষণ না বুঝিতেছি, ততক্ষণ জাহাজের উপর যাওয়া উচিত হইবে কি? মনকে নানা প্রশ্নে অস্থির করিয়া তুলিলাম।

সেনাপতি আমার সামনে আলো ধরিয়া সামরিক প্রথায় অভিবাদন করিলেন। তাহার পর দক্ষিণ হস্ত বক্ষে রাখিয়া বাম হস্ত দ্বারা গম্য পথ দেখাইয়া দিলেন। কেন জানি না, রঘুনন্দনকেই এখন পরম বন্ধু বলিয়া মনে হইতেছিল। কই, তিনি তো এখানে নাই, ম্লেচ্ছকে বিশ্বাস করি কি করিয়া? ছোরা দেহকে স্পর্শ করিয়াছিল, কিছু অভয় পাইলাম। কিন্তু ম্লেচ্ছকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। বিশ্বাস করি বা না করি, আদেশ না মানিয়া উপায়ই বা কি আছে?

আমি সেনাপতিকে অনুসরণ করিলাম। পথ শূন্যে ঝুলিতেছে। অর্ধ হস্তের অধিক প্রশস্ত নহে। পায়ের তলায় কয়েকটি কাঠের তক্তা বাঁধা। দুই ধারে মোটা নারিকেলরজ্জু চলিবার সময় ওজনের সমতা ঠিক রাখিবার জন্য পথের তিন হস্ত উপরে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অনভিজ্ঞ সন্তর্পণে দড়ি ধরিয়া না চলিলে গভীর জলে যে কোন সময় পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশি। সেনাপতি অবলীলাক্রমে দোদুল্যমান পথটি অতিক্রম করিয়া জাহাজের অতি উচ্চ মঞ্চে গিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আলোর ক্ষীণ রশ্মিতে মনে হইল, রঘুনন্দন ফরাসী সেনাপতির পিছনে ঊর্ধ্বতর মঞ্চে দাঁড়াইয়া আছেন। মাঝপথে আসিয়াছি, এমন সময় কি কারণে বলিতে পারি না, দোলায়মান রজ্জুপথে টাল সামলাইতে না পারিয়া গভীর জলে পড়িয়া গেলাম।

সাঁতারে আমার পারদর্শিতা ছিল! কিন্তু অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়িয়া

যাইবার জন্য কোন ভাবেই সাবধানতার আশ্রয় লইতে পারিলাম না।

অনুভব করিতেছিলাম, বালি স্পর্শ করিয়াছি। একটি কোন সজীব পদার্থ আমাকে বেষ্টন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, উহার কবল হইতে নিস্তার নাই। এদিকে সিক্ত শাড়িও ঘনীভূতভাবে আমাকে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। কিছুক্ষণ নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সফল হইলাম না। হাতে বাঁধন পড়ে নাই। যতই আমি বলপ্রয়োগ করিতে লাগিলাম, ততই বেশি করিয়া জড়াইয়া যাইতে লাগিলাম। ক্রমে আমার শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল; জ্ঞানও লুপ্ত হইতেছিল। এমন সময় মনে হইল, কঠিন মাংসপেশীযুক্ত কাহার বাহু আমার বক্ষের নীচে হইতে সাংঘাতিক শক্তির দ্বারা উপরে ঠেলিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। একবার দুইবার—এই ভাবে আমার ত্রাণকর্তা চেষ্টা করিলেন। তাহার ঠিক পরের ঘটনা আমার মনে নাই।

সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে দেখিলাম, আমি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া আছি। ঘরটি অনতিপ্রশস্ত। পাশ্চাত্য অনুকরণে সজ্জিত। আমার পার্শ্বেই একটি স্ত্রীলোক, হয়তো দাসী—হাতপাখার দ্বারা ব্যজন করিতেছে। তাহার পার্শ্বে পীঠিকা—পীঠিকার উপর একটি জলপাত্র। তাহা হইতে তীব্র সুরার গন্ধ উঠিতেছে। আমার মুখেও গন্ধ পাইলাম। জল হইতে উত্তোলন করিয়া হয়তো আমাকে পান করাইয়া দিয়াছিল। আমার উদ্ধারকর্তা নিশ্চয়ই রঘুনন্দন;—বাহুতে অত শক্তি রঘুনন্দন ছাড়া আর কাহার থাকিতে পারে?

দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি কোথায়?

দাসী উত্তর করিল, জাহাজে।

জাহাজ কোথায় চলিয়াছে?

দাসী কোন উত্তর দিল না। আবার প্রশ্ন করিলাম, জাহাজ কোথায় চলিয়াছে?

উত্তর নাই। প্রভুর আদেশানুসারে দাসী প্রশ্ন যাচাই করতিছে, সুতরাং কিছু জানিবার চেষ্টা বৃথা। আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাঠের উপর বহু লোকের দ্রুত গমনাগমনের আভাস পাইতেছিলাম। খাঁটি ফরাসী বিদেশিনীর

মৃদু রসযুক্ত তিরস্কারও শুনিয়াছিলাম—হয়তো সেই সেনাপতির স্বদেশী প্রেমিকা।

সেনাপতির দেশ বিদেশ ঘুরিয়া হয়তো স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করা আর একটি নেশা। পুরুষ একের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে চায় না। নূতনের প্রতি উহাদের সাংঘাতিক আকর্ষণ। ইহা উহাদের স্বভাবদোষ ; কিছু বলিবার নাই। রঘুনন্দন আমাকে জয় করিল। কিন্তু আমি চলিয়াছি ম্লেচ্ছের ভোগের জন্য। আরও কত কথা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

কপালে পুরুষের তালু স্পর্শ করিতেই ঘুম ভাঙিয়া গেল। অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় দেখিলাম, রঘুনন্দন আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কপালে অতি মৃদুভাবে হাত বুলাইতেছেন। কি দীপ্তিময় কান্তি! কিছুতেই দস্যু ভাবিতে মন চায় না। নীচ দস্যু আমাকে অবাধে স্পর্শ করিতেছে, আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না। তাঁহার স্পর্শে অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। নীতি সঙ্কোচের বাধা আনিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। তাঁহার হাতটি নিজের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতেই চারিত্রিক সংস্কার যেন চাবুক মারিয়া জানাইয়া দিল, তুমি হিন্দু বিধবা, তুমি মহারানী—ও অধিকার তোমার নাই। ধিক্কারে মন ভরিয়া উঠিল। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রূঢ়ভাবে বলিলাম, স্পর্শ দ্বারা আমার দেহ কলুষিত করিও না। রঘুনন্দন কিন্তু উঠিল না। আদেশ অগ্রাহ্য হওয়ায় অপমানিতা বোধ করিতেছিলাম। পূর্ব দুর্বলতা ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম, পশু! বন্দী করিয়া আমাকে ভোগ করিতে চাও? এ সুযোগ তোমার মত কাপুরুষেরাই লইয়া লইয়া থাকে। তুমি গুরু শ্যামসুন্দরের পুত্র হইতে পার না।

রঘুনন্দনের বিশাল বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল—ক্রোধে নয়, দুঃখের দীর্ঘ-নিশ্বাস অন্তর ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিল। আমার প্রত্যেকটি কথা দারুণভাবে তাঁহাকে আঘাত করিয়াছিল। তিনি হাত কপাল হইতে তুলিয়া লইলেন, নির্বাক প্রতিবাদে আমাকে জর্জরিত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজা বন্ধ হইবার পূর্বে পিছন হইতে তাঁহার গঠনের অপূর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলাম। দৃষ্টি ফিরাইবার শক্তি ছিল না, উলঙ্গ পৃষ্ঠে শুভ্র যজ্ঞোপবীত আজানুলম্বিত অবস্থায় ঝুলিতেছে। সর্ব

দেহ মন পবিত্রতায় মূর্ত্তিময় হইয়া উঠিয়াছে।

ভাবিলাম, একবার ডাকিয়া বলি—ওগো চিরবাঞ্ছিত, একবার তুমি নিজমুখে জোর দিয়া বল, দস্যুবৃত্তি তোমার পেশা নয়; তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান—গুরু শ্যামসুন্দর সত্যই তোমার পিতা। ওগো, তোমাকে বিশ্বাস করিতে চাই, তোমাকে ভালবাসিতে চাই, তোমার দাসী হইয়া থাকিতে চাই। সশব্দে দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। আমি আবার কঠোর হইয়া উঠিলাম। পরক্ষণেই ভাবিলাম, চলিয়া গেল? কি দোষ করিয়াছি আমি? আমার রূঢ়তা যে নিতান্তই বাহ্যিক! উহা তো আমার হৃদয়ের বাণী নহে! কেমন করিয়া বুঝাই, মহারানী দুর্গাদেবী ও আমার অন্তরের নারী এক নয়? নিজের ব্যবহারে দগ্ধ হইতেছিলাম, অবসাদ আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ক্লান্তি বোধ করিতেছিলাম; শয্যার আশ্রয় লইলাম।

জাহাজ চলিয়াছে। মৃদু দোলায় ঝাড়ের ঠুনঠান শব্দ ঘরের বাহিরে সঙ্গীতের তানে কোন কোন পর্দায় মিলিয়া যাইতেছে। অন্য সময় হইলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। কিন্তু একজনের অনুপস্থিতিতে সব কিছুই প্রাণহীন মনে হইতেছিল। দুর্বলতা ও সুরার হালকা প্রভাব তখন কাটিয়া গিয়াছে।

উঠিয়া বসিলাম। ঘরের ভিতর তখন কেহই ছিল না। তাঁহাকে শুধু দেখিবার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিলাম না। জানালাটার দিকে অগ্রসর হইতে যাইব, এমন সময় দাসী প্রবেশ করিল। হস্তে তাহার স্বর্ণপাত্র—কিছু ফল ও খাবার লইয়া আসিয়াছে। খাদ্যে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। প্রত্যাখ্যান করিয়া নির্লজ্জের মতই জিজ্ঞাসা করিলাম, দস্যুদলপতি রঘুনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে না?

যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া দাসী প্রতিবাদ করিল, রঘুনন্দন দস্যু-দলপতি নহেন; তিনি মহারাজ রঘুনন্দন। বুঝিলাম, ইহা একটি চমৎকার অভিনয়ের সূত্রপাত। বলিলাম, মহারাজ! রাজ্যহীন মহারাজকে একবার ডাকিতে পার? যুবতী কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অত্যন্ত বিনম্রভাবে উত্তর করিল, মহারাজা রঘুনন্দনের রাজ্য বহুবিস্তৃত। রাজধানী মাটির তলায়। বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম। কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। প্রশ্ন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাটির তলায় রাজধানী? সে কোথায়? কোন উত্তর

পাইলাম না। তখন রঘুনন্দনের সাক্ষাৎ লাভের জন্য দাসীকে নিতান্ত কাতর-ভাবে অনুরোধ করিলাম।

দাসী অতি বিনীতভাবে করজোড়ে জানাইল, মহারানী! আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। মহারাজার নিকট যাইবার অধিকার আমার মত সামান্য দাসীর নাই। তিনি যদি আসেন তো নিজেই এদিকে আসিবেন। এখন তিনি ফরাসী সেনাপতির সহিত মন্ত্রণা-ঘরে ঢুকিয়াছেন। দূত শত্রুপক্ষের অপ্রস্তুত অবস্থার সংবাদ আনিয়াছে—আজ রাত্রেই বোধ হয় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জাহাজ চালানো হইবে। আমরা আপনাকে আপনার রাজ্যের নিকট পোঁছাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছি। আমাদের বজরার সহিত বারোটি পানসিতে সশস্ত্র সৈন্য যাইবে। পথে বিপদের সম্ভাবনা নাই।

বিপদের কথা উত্থাপন করিতেই একটা রূঢ় কিছু বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিলাম। যুবতী জানে না, বিপদকে আমি কতটা অবহেলা করিয়া থাকি। যাহা ভাবিতেছিলাম, তাহা প্রকাশ করিলাম না। নিজেকে সংযত করিয়া আবার মহারাজার দর্শন লাভের জন্য দাসীকে অনুরোধ করিলাম।

দাসী বিব্রত হইয়া পড়িল। মস্তক নত করিয়া স্বর্ণপাত্র আমার দিকে অগ্রসর করিয়া বলিল, মহারাজার অনুরোধ—কিছু আহার করুন। মহারাজা রঘুনন্দন সদ্‌ব্রাহ্মণ, আমি অস্পৃশ্যা নহি।

মনের ক্ষুধা মহারাজা বোঝেন নাই। দৈহিক ক্লেশ নিবারণের জন্য অন্ন পাঠাইয়াছেন। যাহা হউক, মহারাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিব না—পাত্র হইতে দুই একটি ফল তুলিয়া লইলাম।

হঠাৎ কামানের গর্জন রাত্রের নিস্তব্ধতা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল। পরক্ষণেই চতুর্দিকে তূরীর আওয়াজে প্রস্তুত হইবার সঙ্কেত শুনিলাম। দামামা ও রণডঙ্কার সহিত নৌসেনারা জয়োল্লাসে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দিল। যেন তাহারা কখনও পরাজিত হয় নাই। বিদেশী ভাষায় একদল সৈন্য চীৎকার করিয়া উঠিল—ভাইভা লে মহারাজা রঘুনন্দন, ভাইভা লে মন্‌সিয়ের। তাহার প্রত্যুত্তর আসিল দেশী সৈন্যদের দৃঢ়তর উচ্চারণে—জয় মহারাজা রঘুনন্দনের জয়, জয় মন্‌সিয়েরের জয়।

দেশী বিদেশী সৈন্যেরা মহারাজা রঘুনন্দনের অধীনে একত্র মিলিত হইয়া

চলিয়াছে আত্ম-বলিদানের জন্য। মহারাজার সৈন্য-চালনায় তাহাদের কি অটল বিশ্বাস! চীৎকার করিয়া বলিতে চাহিলাম, বীর রঘুনন্দন, তুমি শুধু সৈন্যদের মহারাজা নহ—তুমি শুধু মন্‌সিয়েরের মহারাজা নহ, তুমি আমারও মহারাজা। পরক্ষণেই ভাবিলাম, যুদ্ধ কাহার সহিত? এই বিপুল বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা কোন্ প্রবল-পরাক্রমশালীর বিরুদ্ধে? দাক্ষিণাত্যের এই যুদ্ধে যোগ নাই তো? বাংলার নবাব কি তাহা হইলে—? চিন্তা বৃথা। কে আমাকে সদুত্তর দিবে? মহারাজাকে অন্তর্য্যামী ভাবিতে ভাল লাগিল। মিনতি করিয়া জানাইলাম, মহারাজ, আমাকে যুদ্ধে লইবে না? মহারানী দুর্গাদেবী কি ভাবিতেছ, মরিয়াছে? ওগো মহারাজ, অসি-চালনায় তোমাকে গুরু বলিয়া মানিতে রাজি আছি। কিন্তু আমার যেটুকু দক্ষতা আছে, তাহার অবমাননা করিও না। আমাকে যুদ্ধে সঙ্গী করিয়া লও। আমাকে তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তোমার দেহরক্ষী হইতে দাও। তোমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়া জীবন সার্থক করি।

আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। দাসীর দুইটা হস্ত বক্ষে টানিয়া লইলাম। ভিক্ষার্থীর মত তাহার কৃপা চাহিলাম। যুদ্ধে যাইবার আগে একবার মহারাজার দর্শন পাইব না কি? দাসীর সামনে আমার সকল অহমিকা নত করিয়া বলিলাম, শুধু তাঁহার পদধূলি লইয়া শেষ বিদায় চাহিব—আমার এই প্রার্থনাটি প্রত্যাখ্যান করিও না।

সামান্য দাসী হইলেও সে নারী। মহারানী দুর্গাদেবীর নিটোল নরম বক্ষের নিগূঢ় অন্তরে যে উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, তাহা সে বুঝিয়াছিল। চক্ষু তাহার জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। আমাকে স্থিরভাবে একবার দেখিল। তাহার পর ভীতভাবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। হৃদয় তখন কি ভাবে স্পন্দিত হইতেছিল, বলিতে পারি না। অনতিবিলম্বেই মহারাজ কঠোরভাবে আদেশ করিলেন, বাঁদীকো কোতল করো—অভি।

প্রতিটি মুহূর্ত এক একটি দণ্ডের মত মনে হইতেছিল। আকস্মিক পদ-শব্দে চমকিত হইয়া উঠিতেছিলাম। প্রত্যেকটি পদশব্দে মহারাজার আনুমানিক আগমন-বার্তা আমার বক্ষকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে হৃদয়ের দারুণ আলোড়নে। প্রতি বারই শব্দ দ্বার অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল

আমাকে প্রতারিত করিয়া। বুঝিলাম, দাম্ভিকার শাস্তি শুরু হইয়াছে। যদি হইল তো মহারাজা সাক্ষাৎ দিয়া আরও কঠোরতর যন্ত্রণার ব্যবস্থা করিলেন না কেন? দয়া ও সম্মান মহারানীর প্রাপ্য ; আমার নয়। আমি নারী। স্থবির রঘুনন্দন বুঝে নাই বুভুক্ষু নারীর অন্তরের ক্ষুধা। একদৃষ্টে দরজার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মহারাজার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। মহারাজা আসিলেন না, দাসীও ফিরিল না।

হঠাৎ আবার কামান গর্জন করিয়া উঠিল। দামামা ও ডঙ্কার শব্দ অনুসরণ করিয়া বুঝিলাম, নৌসেনার দল ক্রমে দূরে চলিয়া যাইতেছে, কি দ্রুত গতি তাহাদের! নৌবাহিনী যুদ্ধযাত্রার পথে চলিয়াছে। দাসীও ফিরিয়া আসিল না। দাসী ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার অনতিকাল পরেই মহারাজা হুকুম দিয়াছিলেন, বাঁদীকো কোতল করো—অভি। সামরিক আইন লঙ্ঘন করায় তবে কি দাসী আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিল? বেদনায় মর্মাহত হইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময় রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। মহারাজ যোদ্ধৃবেশে প্রবেশ করিলেন। রণবেশে তাঁহাকে বিশ্ববিজেতার মত লাগিতেছিল। মুগ্ধ হইয়া স্থিরভাবে তাঁহাকে দেখিতেছিলাম। লজ্জার কোন আবরণ টানি নাই। চোখের ভাষা অকপটতা সরলভাবে প্রকাশ করিতেছিল, মহারাজা নিশ্চয় তাহা বুঝিয়াছিলেন।

যে জীবন্ত দেবতার চরণতলে নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য এতক্ষণ প্রস্তুত হইতেছিলাম, তাঁহাকেই নিকটে পাইয়া বাক্‌রোধ হইয়া গেল। নারীর আদি প্রকৃতি ও নীতির সংস্কার চিতার দাবানলের মত আমাকে দগ্ধ করিয়া দিতে লাগিল। মহারাজা সামরিক প্রথায় আমাকে অভিনন্দন জানাইলেন। তাহার পর স্থিরভাবে আমার সর্বদেহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দৃষ্টিতে তাঁহার স্পর্শ-শক্তি ছিল, ভালই লাগিতেছিল।

মহারাজা দরজার নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভোগের অত্যন্ত লোভনীয় বস্তু অতি নিকটে এবং সম্পূর্ণ নিজের কবলে পাইয়াও তাহা দাবী করিলেন না। মুখাবয়ব হইতে মনে হইল, তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম অভ্যন্তরে দুঃখের ঝটিকা দুর্দমনীয় প্রবাহে ঘূর্ণমান হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ বিস্ফোরণে হয়তো প্রত্যেকটি পাঁজরার অস্থি লৌহবর্ম ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া আমারই

সামনে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে। কিন্তু সৈনিক বিরাট শক্তি দ্বারা নিজেকে সংযত করিয়া রাখিয়াছেন। উভয়ের দৃষ্টিই উভয়ের প্রতি গাঢ়ভাবে আবদ্ধ—উভয়ের অন্তর একই ঝটিকায় ঘোরতরভাবে আন্দোলিত হইতেছে। কিন্তু বাহ্য প্রকাশে উভয়েই প্রতারণার আশ্রয় লইয়াছি। মহারাজা সংযমী, আমি বাক্‌হীন।

এই অবস্থায় বেশ খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। তূরীধ্বনি হইতেই মহারাজা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কি যেন বলিতে চাহিতেছিলেন। হয়তো আমার আদেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমি বলিলাম, মহারাজ, আপনার যদি কিছু বলিবার থাকে বলিতে পারেন—আমি সব রকম শাস্তি লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি। আমার মুখ হইতে 'মহারাজ' কথাটি শুনিয়া রঘুনন্দন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু পুলকের পূর্ণ প্রকাশ হইবার পূর্বেই তিনি বলিতে লাগিলেন, মহারানী, আপনার নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছি। আমি সৈন্য ; যুদ্ধের ডাক আসিয়াছে। এমন সময় নাই যে প্রাণ খুলিয়া সব কথা বলিতে পারি। তথাপি অনুমতি পাইলে দুই চারিটি কথা বলিতে চাই। হয়তো আর ফিরিয়া আসিব না।

মহারাজ বলিয়া চলিলেন, আপনি আমাকে নীচ দস্যু ভাবিয়াছেন। আপনার এ ধারণা ভুল। আমার কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ দেওয়া এখন সম্ভব নয়। তবে আমাকে নীচ ভাবিবেন না। যদি যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিতে পারি এবং আপনার সহিত সহজভাবে সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আমার সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিবার অবকাশ পাইবেন। আজ এইটুকু অনুরোধ করিতেছি, আমাকে নীচ ভাবিবেন না। আপনার সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া দুর্বলতা পোষণ করিয়া আসিতেছি। আপনাকে নিজের সহধর্মিণী হিসাবে পাইবার আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ভয়ে কখনও আমার প্রধান সেনাপতিকে আপনার নিকট পাঠাই নাই। লোকে আমাকে মহারাজা বলিলেও আমি রাজবংশীয় নহি। এ দিক দিয়া আমার ক্ষুদ্রতা মনকে পীড়ন করিয়াছে। আজ বিকালে আপনাকে বন্দী

করিয়াছিলাম প্রাণ খুলিয়া বিবাহের প্রার্থনা জানাইব বলিয়া, আপনি রাজি হইলে হয়তো শুভকার্য্যটি আজ রাত্রেই সমাধান হইয়া যাইত। আসিবার সময় জাহাজে যে উৎসবের আয়োজন দেখিয়াছিলেন, তাহার জন্য দায়ী আমার ফরাসী সেনাপতি। তিনি নিজ ব্যয়ে এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ফরাসী-দেশীয় বীর শুধু আমার সেনাপতি নহে, আমার বন্ধুও বটে। আমার বিবাহ সম্বন্ধে সেনাপতি ও তাঁহার স্ত্রীই বেশী উদ্যোগী। অনেক রাজকন্যার সন্ধান আনিয়াছিলেন। একজনকেও আমি আমার মহারানী করিবার মত উপযুক্তা ভাবি নাই। আপনার পাণিপ্রার্থী হইয়া দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছি, কিন্তু পাইলাম না। আমি পিতৃদেবের ন্যায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ নহি। সত্য কথা বলিতে হইলে বলিব, আমি ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষিত এবং আমি যোদ্ধা। এই কারণে অনেক বিদেশী ম্লেচ্ছাচার আমাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সুরা তাহাদের মধ্যে একটি। আমি জানি, সুরাকে আপনি কতটা ঘৃণা করেন। তথাপি আমি বাস্তবিকই যেগুলি দোষ বলিয়া মনে করি, তাহা প্রকাশ না করিয়া পারিতেছি না। আরও হয়তো ছোটখাটো দুর্বলতা আছে। শুনাইবার অধিকার যদি কখনও পাই, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন। আপনি মহারানী। মহারানীর উপযুক্ত ব্যবহারই আপনি করিয়াছেন। এই সূত্রে আপনাকে কয়েকটি বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতে চাই। আপনি যাহাতে নিরাপদে আপনার রাজধানীতে প্রবেশ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু দেশে ফিরিয়া আপনি ঠিক মহারানীর সব ক্ষমতা পাইবেন না। কারণ আপনি আপনার রাজ্যের ভিতরেই আমার বন্দিনী হইয়া থাকিবেন, আপনার সৈন্যেরা আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। রাজকোষও এখন আমার অধীনে। ইহার প্রয়োজন হইয়াছে বাংলাকে বাঙালীর করিবার জন্য। যে উদ্দেশ্য লইয়া আমি আত্মোৎসর্গ করিয়াছি, তাহা সফল হইলে বাংলার বাঙালী অকারণ সর্বহারা হইবে না। আমার ধারণা, আপনার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইব না। আর একটু বলিতে চাই। আমার এই উপদেশগুলির বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না। যদি করেন, তাহা হইলে প্রয়োজনানুসারে আপনার প্রাণ-বিয়োগও হইতে পারে। দেশের কল্যাণের জন্য আমি যাহাকে সত্যই ভালবাসিয়াছি, তাহাকেও বধ করিবার আদেশ দিতে বাধিবে না। আরও কয়েকটি কথা আছে। জলপথে

আপনার রাজ্যে যাওয়া সম্ভব নয়। মাঝপথে মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে। ফরাসী সেনাপতি আপনার সহিত সেই পর্যন্ত যাইবেন। তাহার পর ফিরিয়া আমার সহিত যোগ দিবেন। সেনাপতি চলিয়া আসিলেও আপনি প্রাসাদে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমার সৈন্য ও দাসীরা আপনার সহিত থাকিবে। সুড়ঙ্গ আপনার কালীমন্দিরের ঠিক নীচে পর্যন্ত গিয়াছে। কালীবাড়ির মাঠ আমার দক্ষিণবাহিনীর কুচকাওয়াজের জন্য প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করিতে হইত। কালীমন্দিরের উত্তর দিকে আপনার প্রাসাদ। মানচিত্রে উহা নির্দিষ্ট আছে। সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ঠিকভাবে বুঝিতে পারিলে কোনই অসুবিধা হইবে না। পথ দীর্ঘ ; আশা করি, মহারানী দুর্গাদেবী তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন। কিন্তু একটি বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিতে চাই। মানচিত্রে বর্ণিত উপযুক্ত স্থানে সাঙ্কেতিক চিহ্ন না পাওয়া পর্যন্ত কখনও চলিবার চেষ্টা করিবেন না। সামান্য ভুল পদবিক্ষেপে স্থাপত্য সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং ভয়াবহ বিপদকেও হয়তো অজ্ঞাতে বরণ করিয়া ফেলিবেন। মাটির নীচে বিরাট স্থাপত্যের জন্য যে সব স্থপতি দায়ী, তাহারা আজ কেহই জীবিত নাই। সকলেই স্বেচ্ছায় মহারাজ রঘুনন্দনের সম্মুখে নিজহস্তে পিস্তলের দ্বারা নিজেদের মাথা উড়াইয়া দিয়াছে।

এই বিরাট কেল্লা ও প্রাসাদ আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহাদের নিকট এই প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলাম যে, কেল্লা শেষ হইলেই তাহারা আমার সামনে আত্ম-বলিদান দিবে। বীর শিল্পীরা অঙ্গীকারের পূর্ণ মর্যাদা রাখিয়া গিয়াছে। রাজনীতিতে আমি কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি নাই। দেশকে বড় করিবার জন্য যাহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছিল, নিজের দুর্বলতার জন্য তাহাদেরই প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম ; তাহারা স্বেচ্ছায় মরিয়া নিজেদের অমর করিয়া গিয়াছে।

ফরাসী সেনাপতি আমার পরম বন্ধু। তথাপি আপনার রূপের আকর্ষণ যে কোন নীতির আইনকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। এ দিক দিয়া আমি অতি নিকট-বন্ধুকেও বিশ্বাস করি না। সেই কারণে আপনাকে আমার নিজের পিস্তল দিতে আসিয়াছি। মানচিত্রও গ্রহণ করুন।

এতটা বলিয়া মহারাজা যেন অবসাদ-ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর

ধীর পদবিক্ষেপে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি পদ-ক্ষেপ আমাকে মাতালের মত অভিভূত করিতেছিল। মনের এরূপ চঞ্চলতা বোধ হয় কখনও জীবনে অনুভব করি নাই। নিজের রাজ্যে বন্দী হইয়া থাকিব? আশ্চর্য হইলাম না। মহারাজা সম্বন্ধে এখন সব কিছুই বিশ্বাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি।

মহারাজা পিস্তল ও মানচিত্র আমার সামনে ধরিলেন। সর্বশরীর তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল—দুর্বলতা গোপন করিবার শক্তি নাই। সব ভুলিয়া মহারাজার হস্ত ধরিলাম। আমাদের মিলন ঘটিল। হয়তো কিছু সময় এইভাবে কাটিয়াছিল। হঠাৎ মহারাজা আমাকে বিশাল বক্ষে টানিয়া লইলেন। তাঁহার সর্ব অঙ্গের স্পর্শ সর্বদেহ দিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। ক্রমে তাঁহার পেশীবহুল বাহুর চাপ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, পেষণে আমার দেহটা বুঝি চূর্ণ হইয়া যাইবে। বলবান, দেহ ও মন দিয়া প্রেমের নিগূঢ় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে। বাধা সে মানে না, বাধা দিতেও চাহি নাই। মনের আনন্দ দেহের সব যন্ত্রণা সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। সুরার গন্ধমিশ্রিত ঘন ঘন তপ্ত নিশ্বাস আমার গণ্ডের উপর পড়িতেছিল। খারাপ লাগিলেও অসহনীয় মনে হইতেছিল না। মহারাজার তেজোময় ও স্নিগ্ধ মুখ আমার মস্তকের অতি নিকটে আসিল। তাহার পর দীর্ঘ চুম্বনে আমার ওষ্ঠকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিলেন। জীবনে এই প্রথম পুরুষের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলাম। বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা ছিল না, কারণ নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। অবশেষে শক্তিশালীর কাম্য যাহা কিছু ছিল, স্বেচ্ছায় তাহা পূর্ণ করিয়া দিলাম।

ঘর্মাক্ত কপাল রেশমী রুমাল দ্বারা মুছিয়া মহারাজা তেজোময় মূর্তিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর শান্ত অথচ কম্পিত গলায় বলিয়া চলিলেন, এখনই আমার আদেশপত্র পরিবর্তন করিতে হয়। আমার অনুপস্থিতি অথবা অবর্তমানে তোমার নিজের রাজ্য ছাড়া আরও সাতটি রাজ্য চালনার ভার তোমাকে বহন করিতে হইবে। আমাদের সন্তান যদি কখনও ভূমিষ্ঠ হয়, সে পুত্র অথবা কন্যা হউক, তাহাকে মহারাজ রঘুনন্দনের সন্তান বলিয়া ঘোষণা করিবে। সেনাপতিকে ডাকিতেছি। যুদ্ধযাত্রার

জয়োল্লাসের সহিত ক্ষণিকের জন্য আমাদের বিবাহ-আসরের ব্যবস্থা হউক। উহার প্রয়োজন আছে।—এতটা বলিয়া তিনি বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, আমি বাধা দিলাম। আমার মুক্তার সাতনরী তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলাম।

বটবৃক্ষের দৃঢ়মূলযুক্ত গোড়া যেন শ্বেতচন্দনে চর্চিত হইয়া উঠিল। হীরক-অঙ্গুরীয় খুলিয়া পরাইতে গেলাম, বংশদণ্ডের ন্যায় গাঁটে নারীর অঙ্গুরী স্থান পাইল না। অগত্যা তাঁহার রক্তাভ তালুর উপর রাখিয়া দিলাম। তিনি বর্মের ভিতর হইতে যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া তাহাতে বাঁধিয়া লইলেন। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রভুর পদধূলি লইলাম। সাতটি রাজ্যের একচ্ছত্রপতি অসমসাহসী অজেয় মহারাজের চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে বীর মৃত্যুকে নিরবচ্ছিন্ন ক্রীড়ার বস্তু মনে করেন, যে বীর রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়াও শান্ত হন নাই, সেই মহাপুরুষ আমার বক্ষের উপর নিতান্ত অসহায় শিশুর মতই কাঁদিতে লাগিলেন। আমার মধ্যে জননী তখন জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। আমি মহারাজকে শিশুর মতই সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলাম। আবার তূরী বাজিয়া উঠিল। মহারাজ ত্রস্তে আমাকে ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার হাত ধরিয়া অনুরোধ জানাইলাম, আর একটু থাক। সৈনিক নিজের কর্তব্যকে একমাত্র আরাধ্য বস্তু করিয়াছেন। যুদ্ধই তাঁহার ধর্ম্ম। মহারাজার গতি রোধ করিতে পারিলাম না। মানচিত্র ও পিস্তল আমার পালঙ্কে পড়িয়া রহিল।

এতটা বলিয়া মহারানী উভয় হস্তে নিজের মুখ ঢাকিলেন। দুঃখের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। আভিজাত্যের দুর্লঙ্ঘনীয় সঙ্কোচ এখন বিধ্বস্ত; নারী নিজের পূর্ণ রূপ প্রকাশ করিতে পাইয়া কতকটা সান্ত্বনা বোধ করিতেছিলেন। আমার কিছুই বলিবার ছিল না। পরের ঘটনা শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

অল্পক্ষণ পরেই ক্রন্দনরতা নিতান্ত ভিখারীর মতই আমাকে অনুরোধ করিলেন মাত্র কয়টি কথায়—ওগো বিদেশী, হে ভদ্রসন্তান, এখন নিশ্চয় বুঝিতেছ, আমি আত্মঘাতিনী নই, আমি বাস্তবিকই মহারানী। আমার মহারাজা ফিরিয়া আসেন নাই সত্য। ইহাও সত্য, আমি তাঁহার সন্তানের
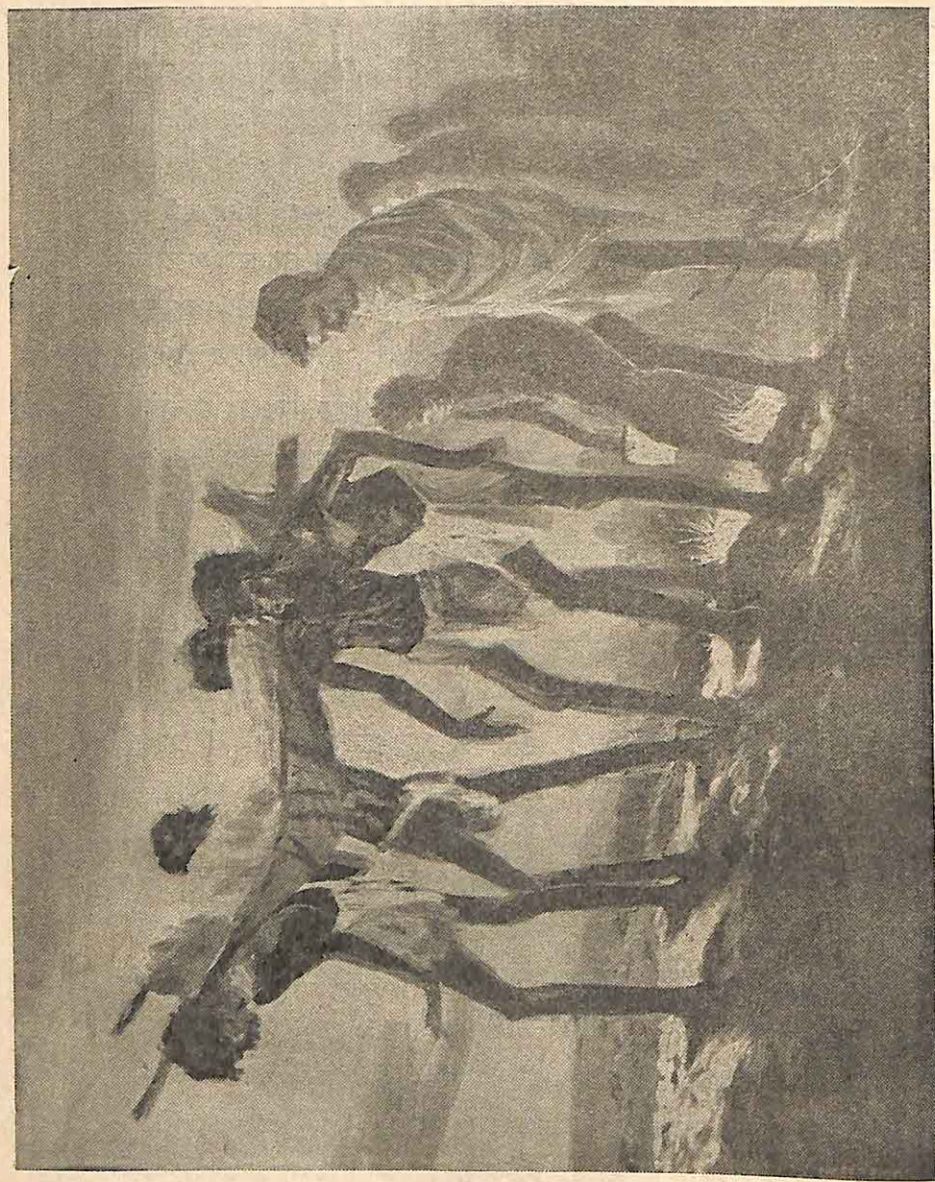
দূরে শুনিলাম—'বল হরি—হরিবোল!'

মাতা হইবার ভাগ্য লাভ করি নাই। কিন্তু মহারাজার প্রত্যেকটি আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছি। জীবন্ত জগতে গিয়া এই সত্যটি প্রচার করিবে কি?

আমি কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না। সামান্য নায়েবগিরি করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকি। মহারানীর আদেশ যে শিরোধার্য, তাহাতে প্রশ্ন উঠিবার কি আছে? পুনরায় তাঁহার দিকে তাকাইলাম, কিন্তু মহারানীকে আর দেখিতে পাইলাম না। পরক্ষণেই ঘর অন্ধকারে জমাট হইয়া উঠিল। মনে হইল, আমার জ্ঞান লুপ্ত হইতেছে। সোজা হইয়া আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। একটু হেলান দিবার চেষ্টা করিতেই পিঠে বরফের মত কঠিন ও সমতল পদার্থ অনুভব করিলাম। হাত নড়িতেই একটি মাংসযুক্ত নরদেহ স্পর্শ করিলাম। মড়াও যদি হয় ক্ষতি নাই, তথাপি মাংস আছে। কিছু সাহস পাইলাম। পা ছড়াইতেই আবার শিকলের ঝনঝন শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। এবার জোর করিয়া নিজেকে সামলাইবার চেষ্টা করিয়া বুঝিলাম, তখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাই নাই। মরিয়া হইয়া চোখ রগড়াইলাম। ঘরে তখন আলো আসিয়াছে। অলৌকিক কিছু নয়, একেবারে ভোরের আলো মনে হইতেছিল। পরিচিত আলোয় অনেকটা ভরসা পাইলাম। একটু পাশ ফিরিতেই পায়ের তলায় টাকার থলিটা ঝনঝন করিয়া উঠিল। সব কিছুই জাগ্রত অবস্থায় দেখিতেছিলাম। কি সর্বনাশ! আমি ভিজা দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আছি। পাঁড়ে আমার পার্শ্বে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছে। তাহাকে ঠেলা মারিতেই সে কষ্টে উঠিয়া বসিল। আমার কপালে হাত দিতেই মনে হইল, সামান্য জ্বর আসিয়াছে। পাঁড়েরও চলিবার শক্তি নাই। ঠাণ্ডা পাথরের মেঝেতে শুইয়া তাহার সর্ব্বদেহে সাংঘাতিক বেদনা হইয়াছে। কি ভাবে কাছারিতে পৌঁছাইব ভাবিতেছি, এমন সময় দূরে শুনিলাম—'বল হরি—হরিবোল!' কে মহাপ্রস্থানের পথে চলিয়াছে। শ্মশানযাত্রীরা আমাদের এলাকার দিক হইতেই আসিতেছিল। পাঁড়েকে ভাল করিয়া পাগড়ি ও কোট পরিতে বলিলাম। লোকগুলি নিকটে আসিলে দুইটা পাল্কির ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। পাঁড়েকে উঠাইয়া মন্দিরের চাতালে আসিয়া বসিলাম। এমন সময় দেখিলাম, রাত্রের সেই হামাগুড়ি দেওয়া জীবটি অদূরে ক্লান্তভাবে শুইয়া

পড়িয়াছে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতেই নিঃসন্দেহ হইলাম, উহা একটি শৃগাল। মুখে কি ভাবে নরমুণ্ড আটকাইয়া গিয়াছে। কাঁকড়া শিকারের চেষ্টায় হয়তো নরমুণ্ডের নীচের দিক হইতে মুখ ঢুকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। বেকায়দায় ঐ অবস্থায় পড়িয়া নর-শিবার রূপ হইয়াছে।

গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা ম্যানেজারবাবুকে বলিতে তিনি রাসভারী গলায় শুধু একটি 'হুঁ' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু টাকা বুঝিয়া লইয়াই অনেকগুলি অপ্রিয় বিশেষণ ব্যবহার করিয়া সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, অজানা স্থলে রাত্রিবাসের সহিত স্খলিত-চরিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অভিজ্ঞতা তাঁহার বিশ্বাসকে অটল করিয়া দিয়াছে। সুতরাং প্রতিবাদ করিবার সাহস পাই নাই।

যথাসময়ে নিজের কাছারিতে ফিরিলাম। দাওয়ায় উঠিতেই অপ্রত্যাশিত-ভাবে স্থানীয় দারোগাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তিনি আমার ভাঙা চেয়ারটায় বসিয়া অসিহষ্ণুভাবে গোঁফে চাড়া মারিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে লাউডগা সাপের মত বেতটা বুটের উপর ঠুকিতেছিলেন। ইহার অর্থ যে জটিল, তাহা যে কোন নায়েবেরই জানা আছে। আমি তাঁহার নিকটবর্তী হইতেই কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া কন্‌স্টেব্‌লকে হাতকড়ি পরাইয়া দিতে বলিলেন। গ্রেপ্তারের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, মানুষ গুমি। যাহা ভাবিতেছিলাম, ঠিক তাহাই ঘটিল। হুঁশিয়ার ম্যানেজারবাবু আমার নিকট রাত্রের গল্প শুনিয়া খবরটি থানায় পৌঁছাইয়া দিতে কালবিলম্ব করেন নাই। লৌহবলয় পরিয়া আমরা থানায় গিয়া উঠিলাম। গোমস্তা, মুহুরী, পাইক, বরকন্দাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বামুন-ঠাকুর পর্যন্ত জানিয়া ফেলিল, নায়েববাবু গুমির অপরাধে হাজতে গিয়াছেন। বারান্দায় বসিয়া নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছি, এমন সময় আমার কাছারির বামুন-ঠাকুর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি ঠাকুর? সে তখন হাঁপাইতেছিল। তথাপি বলিল, শীতল মরে নাই। বাকি কয়দিনের মাহিনা চাহিতে আসিয়াছে। দারোগাবাবু নিকটেই বসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

এতবড় একটা কেস—প্রোমোশনের নির্ভুল অবলম্বন, এইভাবে ফাঁসিয়া যাইবে ভাবিতে পারেন নাই।

প্রাণটা আমার। সুতরাং বাঁচিতে হইলে তাঁহাকে সুদ্ধ কাছারিতে টানিতে না পারিলে উপায় নাই। জেরার মুখে শীতল যদি বলিয়া বসে, তাহার নাম শীতল নয়, হনুমান সিং! প্রয়োজনবোধে আমরাই তো কতবার এই রকম কেস খাড়া করিয়াছি। কচিমুদ্দিন মিঞাকে আমরা যোগেশ চাটুজ্জে সাজাই নাই? দাড়ি কামাইয়া পৈতা পরাইতে যা একটু অসুবিধা হইয়াছিল। আরে সর্বনাশ, আর দেরি করা নয়। দারোগাবাবুকে জোড়হস্তে কাছারিতে আসিতে মিনতি করিলাম। প্রাণের দায়ে আমার ভাষা ও তাহার প্রকাশভঙ্গি কিরূপ হইয়াছিল মনে নাই। নিশ্চয় চাটুবাক্য প্রয়োজনের অধিক ব্যবহার করিয়াছিলাম। দারোগাবাবু খুশি হইয়া শীতলকে নিজ নামে সনাক্ত করিয়াছিলেন এবং আমরা গোটা দেহ লইয়া কাছারিতে ফিরিয়াছিলাম।

এই ঘটনায় ম্যানেজারবাবু চটিয়াছিলেন। ফলে ত্রিরাত্রি না কাটিতেই উপরওয়ালার হুকুমে দারোগাবাবু কোন দূর থানায় বদলি হইয়া গেলেন। হাজার হোক, দশ লাখ টাকা মুনাফার সম্পত্তির ম্যানেজার—বড় বড় সাহেবদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া চা খায়, তাহাকে চটাইলে একটি সামান্য দারোগার চলে? দারোগা চুলায় যাক। আমি বাঁচিয়া গিয়াছি।

বৎসরাধিক হইতে চলিল, নাক কান মলিয়া নায়েবগিরি ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু উপরি-পাওনা কচি-পাঁঠার কথা মনে পড়িলেই উপযুক্ত শ্রোতা ধরিয়া বল্লভপুরের মাঠ ও নায়েবগিরির সুবিধা সম্বন্ধে গল্প করিয়া থাকি।

ডাস্টবিন

গ্রীষ্মকাল, অপ্রশস্ত পিচের রাস্তা দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপে ঝলসিয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে ফুটন্ত গুড়ের মত পিচ গলিয়া বুদ্বুদ বাঁধিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জনহীন পথ। ল্যাম্প-পোস্টের উপর কেবল একটা দাঁড়কাক কর্কশ স্বরে চীৎকার করিতেছিল। চলিতে চলিতে আমিও ঝলসিয়া উঠিয়াছিলাম, পাশের একতলা বাড়ির শূন্য রোয়াকটা আমাকে আকর্ষণ করিল। দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার সুযোগ পাইলাম।

সারা সকালটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কলের জল ছাড়া ক্ষুন্নিবৃত্তির আর কোন ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। আমি একজন চিত্রশিল্পী, একদিন আমার খ্যাতি ছিল, কিন্তু যুগের রুচিতে আজ আমি বাতিল হইয়া গিয়াছি। ছবি লইয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়াছি, বিক্রয়ের দিক দিয়া অকৃতকার্য হইতে হইয়াছে। ছবি কিনিতে কেহই প্রস্তুত নহেন। অনেকে এক ঘণ্টা ছবি দেখিয়া অবশেষে ছবির ভুল ধরাইয়া দিয়াছেন, কোথাও এই বিলাসিতার ব্যবসা ছাড়িয়া দিবার উপদেশ পাইয়াছি। ভুল যাঁহারা ধরাইয়াছেন, তাঁহাদের বিচার না মানিয়া উপায় ছিল না, ধন্যবাদও দিতে হইয়াছে। আবার পিঠে ছবি ঝুলাইয়া ফিরি করিতে বাহির হইয়াছি। অবশেষে কাকের আহবানে এই রোয়াকের সন্ধান পাইলাম। রোয়াকটি বেশ পরিষ্কার, বুঝিলাম, চলতি পথে আরামভোগীদের মধ্যে আমিই প্রথম ভাগ্যবান। জানালার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, সব বন্ধ; সাবধান হওয়ার প্রয়োজন ছিল, হঠাৎ বাড়ির কর্তা উঠিয়া অবিলম্বে চলিয়া যাইতে আদেশ করিতে পারেন।

ছবির বোঝা রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিতেই পায়ের তলায় জ্বালা অনুভব করিলাম। জুতা খুলিয়া দেখি, জুতার তলার ছিদ্রস্থানটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পাতলা পিচবোর্ড দিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, তাহা দীর্ঘকাল ঘর্ষণের ফলে নিঃশেষিত হইয়াছে, শততালিযুক্ত পাদুকা পুরা ষোলো মাস ধরিয়া মালিকের পদসেবা করিয়া আসিতেছে। আর নূতন তালি

লাগাইবার স্থান পর্যন্ত নাই। ভাবিলাম, এ দুইটাকে ডাস্টবিনে ফেলিয়া দিলে কি হয়? মুচিরা পর্যন্ত জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। তাকাইয়া দেখে, কিন্তু মেরামত বা পালিশের জন্য ডাকে না; পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু পিচের দগ্ধ আকৃতি দেখিয়া এবং পথপার্শ্বের জুতার দোকানদারের ভয়ে বিরত হইলাম। আর একটা পিচবোর্ড সংগ্রহ না করিতে পারিলে চলে না।

ধীরে ধীরে তন্দ্রার আবেশ আসিতেছিল, দেওয়ালে মাথা রাখিয়া একটু জিরাইয়া লইব ঠিক করিতেছি, এমন সময় দুইটি কুকুরের চীৎকারে আবেশ কাটিয়া গেল। উভয়ে খাদ্য ভাবিয়া এক পাটি জুতা লইয়া টানাটানি লাগাইয়াছে। সবল প্রবলবিক্রমে দুর্বলকে আক্রমণ করিল। জুতাটা তখন মাটিতে লুটাইতেছে। দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম, জুতার পাটিটা আমার নয়, ডাস্টবিন হইতে এটাকে উহারা বাহির করিয়াছে। জুতাটায় একটিও তালি পড়ে নাই—কেবল ডগাটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে; সুতার ছিন্ন অংশগুলি হিংস্র জন্তুর দাঁতের মত মনে হইতেছে, মনে হইল—অভিজাতকুলোদ্ভব অপমানে জর্জরিত হইয়াই হিংস্র মূর্তি ধারণ করিয়াছে। কোন সময় সাহেবী দোকানে তাহার জন্ম হইয়াছিল। এখন রূপের জলুস নাই, সামান্য ছেঁড়াতেই মালিকের নিকট অব্যবহার্য হইয়াছে। ভাবিলাম, কুকুর দুইটাকে তাড়াইয়া দামী জুতার চামড়াটা নিজের কাজে লাগাই। মুচিকে চামড়ার দাম দিতে হইবে না—এমন লোভনীয় চামড়া পাইলে হয়তো মজুরিটাও ছাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু মনকে প্রস্তুত করিবার আগেই জয়লব্ধ জুতাটি লইয়া বলবান বেগে বড় রাস্তার দিকে ছুটিল। কামড় খাইয়া দুর্বল কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। বেচারার সমস্ত শরীরে লোমের চিহ্নমাত্র নাই, কঙ্কালময় দেহ গলিত চামড়ায় আবৃত, পিঠের ঘায়ে মাছি ভনভন করিতেছে, লেজটা কে মুচড়াইয়া দিয়াছে। পিছনের একটি পা কাটা, কোন অসংযমী চালক তাহার উপর চাকা চালাইয়া থাকিবে। দেহটাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া কোন প্রকারে ডাস্টবিনের নিকট আনিল। তাহার পর ঝিমানো অবস্থায় সামনের দুইটি পায়ের উপর মুখ রাখিয়া উদাসভাবে তাকাইয়া রহিল। তাহার সমস্ত উদ্যম নিঃশেষিত হইয়াছে—হয়তো আর উঠিবে না। না উঠুক, আমার তাহাতে কি,

আমিও কতদিন অনাহারে থাকিয়াছি—আজও আহার জুটে নাই, জুটিবে কি না স্থিরতাও নাই। মনে মনে হাসিলাম, আমি কেন দয়ার কথা ভাবিতেছি—আমার উচিত ওই বলবান কুকুরটার মত হওয়া, কিন্তু শক্তি পাইব কোথা হইতে? অকারণ অতীতের স্মৃতি একের পর এক চলচ্ছবির ন্যায় স্বপ্নের মত প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। কে বিশ্বাস করিবে যে, কোন সময় আমার সন্তুষ্টির জন্য দাস-দাসী সব সময় তটস্থ হইয়া থাকিত? চাটুকার গুণ-ব্যাখ্যার জন্য নিত্য নব বিশেষণ আবিষ্কার করিত? ইচ্ছার সামান্য আভাসে দুষ্প্রাপ্য বস্তু কত সহজ-লভ্য ছিল? এখন অর্থ নাই, জীবিকা অর্জনের একমাত্র অবলম্বন চিত্রাঙ্কনবিদ্যা।

এক সময় আমার ছবির মালিকানা-স্বত্ব জাহির করিবার জন্য রাজায় রাজায় মূল্যবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা পর্যন্ত হইয়াছে। তখন শিল্প-সমালোচকেরা আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিলে নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। কিন্তু আজ আমি মরিয়াছি। কারণ নূতন ফ্যাশনে, হালের রুচিতে আমি বাতিল, পুরাতন। সাহেব-বাড়ির ঐ পুরাতন পাদুকাটার মতই আজ পছন্দ হইলেও দুই চার টাকার বিনিময়ে আমার ছবি কেহ কিনিতে চায় না, পাছে অতি-আধুনিক কেহ বলিয়া বসে, এ তো ব্যাক্‌ডেটেড আর্টিস্ট!

ক্রমশ সব জড়াইয়া পাকাইয়া যাইতেছে, ঘুম গাঢ় হইয়া আসিতেছে। সমস্ত দেহটাই ভারী বোধ হইল, প্রসারিত করিয়া দেহ এলাইয়া দিবার প্রবল বাসনা হইল।

কিন্তু ছবির পোঁটলাটাকে বালিশ করিয়া শুইতে গিয়া একটা ঘটনার কথা মনে পড়িল।

সেদিনও এমনই গৃহস্থের রোয়াকে সবেমাত্র বসিয়াছি, এমন সময় পিছনের খোলা জানালা দিয়া উচ্ছিষ্ট খাদ্য ও থালা-ধোওয়া জল একেবারে মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল।

শুইবার আগে ভাল করিয়া দেখিলাম, জানালাটা বন্ধই আছে। কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

সহসা বুকের উপর আঘাত পাইয়া উঠিয়া বসিলাম, দেখিলাম, বুকের উপর একটা ভিজা বিঁড়া; অদূরে খড় ও দড়ির বিঁড়ায় সজ্জিত হইয়া একটি

পাগল দাঁড়াইয়া আছে। একটি হাত দিয়া ডাস্টবিন হাতড়াইতেছে, অপরটি আমার প্রতি নির্দেশ করিয়া নিক্ষিপ্ত বিঁড়া দেখাইতেছে। আমার পাঞ্জাবির উপর-অংশ ভিজিয়া চপচপে হইয়া গেল। লক্ষ্যের অব্যর্থ সন্ধানে পাগলের কি উৎকট হাসি!

প্রথমটা রাগিয়াই উঠিয়াছিলাম, কিন্তু পরমুহূর্তেই লোকটার মুখ দেখিয়া হাসি আসিল; লোকটাকে পরম সুখী মনে হইল। ইতিমধ্যে পাগল আমাকে ছাড়িয়া রত্নসন্ধানে মনোনিবেশ করিয়াছে। ছেঁড়া নেকড়া, ভাঙা কলসী, শতছিন্ন মাদুর একের পর এক ডাস্টবিন হইতে তুলিয়া ফেলিতে লাগিল। পাগলের পিঠের মেরুদণ্ড রৌদ্রের ঝলকে রেলের লাইনের মত চকচক করিতেছে, প্রত্যেকটি হাড় গোনা যায়। কত রকমের শুকনা ফুল, নীল লাল কাগজ মাথার বিঁড়াকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। হাতে পায়ে কোমরে সর্বত্রই বিঁড়ার অলঙ্কার। পাগলের সৌন্দর্যবোধ বিঁড়ার বাহিরে আসিতে পারে নাই। পাগলকে কে বুঝাইবে, এখন বিঁড়ার ফ্যাশন প্রচলন হয় নাই। মেয়েরা সবে এখন মাথার দুই পাশে খোঁপার বিঁড়া বাঁধিতে শুরু করিয়াছে মাত্র। যাক, সমস্ত দেহে বিঁড়া পরিবার চলন যখন আসিবে, তখন এই ফ্যাশনের স্রষ্টা পাগলাকে মহাপুরুষ বলিয়া লোকে স্মরণ করিবে।

ইতিমধ্যে দুইটি চলন্ত নরকঙ্কাল ডাস্টবিনের সামনে আসিয়া উপস্থিত। একটি পুরুষ, অপরটি স্ত্রী—মেয়েটির কোলে কঙ্কালসার একটি শিশু। মেয়েটির পরনে গুনচট; পুরুষটি প্রায় দিগম্বর, একটা ছেঁড়া নেকড়ার কৌপীন মাত্র সম্বল। মেয়েটি মাঝে মাঝে অস্থির হইয়া মাথা চুলকাইতেছিল—হয়তো উকুনের উৎপাত হইবে। ডাস্টবিনে ভাগীদার পাগলের পছন্দ হইল না। মেয়েটাকে সে মুখ ভেংচাইল ; ফলে ইহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মারিতে উদ্যত হইল। দুইজনের বিরুদ্ধে একলা লড়াই করিতে পাগল বোধ হয় সাহস পাইল না। সে দখল ছাড়িয়া দিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে চলিয়া গেল।

নিষ্কণ্টক আধিপত্যের অধিকারী হইয়া ঐ পাগলের মতই পুরুষটি যাহা হাতের সামনে পাইল, তাহাই মাটিতে ফেলিতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে রাশীকৃত অবর্ণনীয় ও অস্পৃশ্য বস্তু গৃহস্থের বাড়ির সামনে স্তূপীকৃত

হইয়া উঠিল।

সহসা পুরুষটির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, ডাস্টবিনের ভিতরে সে উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া সন্তর্পণে বাহির করিয়া আনিল একটা হাঁড়ি। তারপর হাঁড়ির ভিতর হইতে বাহির করিল একটা মোচড়ানো কলাপাতার ঠোঙা। অতি সন্তর্পণে ঠোঙাটা খুলিতেই অভ্যন্তরস্থিত বস্তু প্রকাশিত হইল—সামান্য উচ্ছিষ্ট খাদ্য, প্রাচুর্যের অপ্রয়োজনীয় অংশ। কবে কে ফেলিয়াছে, নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই। সমস্ত পাতাটায় পোকা কিলবিল করিতেছে, আমার সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করিয়া উঠিল।

মেয়েটি দাঁড়াইয়া সন্ধানের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোলের ছেলেটি এক ফোঁটা দুধের জন্য মায়ের শুষ্ক স্তন আকর্ষণ করিয়া কিছু না পাইয়া অবশেষে কাঁদিয়া উঠিল—প্রত্যেকটি চীৎকারে গলার শিরগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবারও তাহার শক্তি নাই—গলা ধরিয়া যাইতেছে। মায়ের সেদিকে লক্ষ্য নাই, সে লোলুপ দৃষ্টিতে ডাস্টবিনের দিকে আগাইয়া গেল। সন্ধানের ফলাফল তখনও জানা যায় নাই, ইহার উপর শিশুর অত্যাচার তাহার সহ্য হইল না, সজোরে সে ছেলেটার গালে একটা চড় বসাইয়া দিল, ছেলেটা এবার ককাইয়া উঠিল—শব্দ বাহির হইল আধ মিনিট পরে, এবার আর কান্না নয়—কেবল একটা আনুনাসিক ঘড়ঘড় শব্দ মাত্র। তাহার পর মাতার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নিঝুমের মত পড়িয়া রহিল। ভাবিলাম, কিছু হইয়া গেল না তো?

বেশ খানিকটা সময় অতিবাহিত হইবার পর লোকটা সোজা হইয়া দাঁড়াইল; তাহার পর স্ত্রীর বক্ষস্থলের নেকড়াটা ছিনাইয়া লইল, আবার ভিতরে বসিল। আবার অল্পক্ষণ পরেই ডাস্টবিনের বাহিরে আসিল, হাতের নেকড়াটা তখন পোঁটলার আকার ধারণ করিয়াছে। সঙ্কেতে স্ত্রীকে নিকটে আসিতে বলিয়া সে মাটিতে পোঁটলাটা বিছাইয়া ফেলিল, দূর হইতেই দেখিলাম, খানিকটা ভাত ও তরকারি তাল পাকাইয়া আছে। উভয়ের মিলিত চেষ্টায় ভাত ও তরকারি যথাসম্ভব পৃথক হইলে পুরুষটি খাদ্য ভাগ করিতে বসিল, স্ত্রীকে তৃতীয়াংশের এক অংশ দিয়া দুই অংশ নিজে টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল।

আকাশ হইতে তখন আগুন ঝরিতেছে। রাস্তার পিচ গলিয়া প্রায় তরল হইয়া উঠিয়াছে। শহরের বুকে অশোভনীয় নিস্তব্ধতা, সমস্ত শহরটাকে যেন একটা গোরস্থানের মত মনে হইল। অকস্মাৎ শিশু আবার কাঁদিয়া উঠিল—ক্ষুধাগ্নি তাহার পেট পুড়াইয়া দিতেছে, কাহারও শাসন সে আর মানিতে প্রস্তুত নয়। মেয়েটি অথবা পুরুষটিও তাহাতে বিচলিত হইল না। আপন আপন অংশের ভাত ও তরকারি মাখিয়া তাহারা মুখের ভিতর পুরিয়াই চলিয়াছে। এমন সময় গুরুগম্ভীর কণ্ঠে শাসনবাক্য ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সচকিত হইয়া তাহারা উপর দিকে তাকাইল—পিছনে কর্পোরেশনের চাপরাসী ; ভীষণ মূর্তি ধরিয়া স্তূপীকৃত জঞ্জাল ও বুভুক্ষুর দিকে তাকাইয়া আছে। চাপরাসীর ধারণা জন্মিয়াছে, ডাস্টবিন হইতে ময়লা বাহিরে আনার জন্য দায়ী ক্ষুধায় প্রপীড়িত ওই পুরুষটি। চাপরাসীর এদিক দিয়া অভিজ্ঞতা পুরাতন, সুতরাং ধারণার পিছনেই নিশ্চয়তা দৃঢ় হইয়াছিল। অন্তত একটা লাঠির খোঁচা মারিতে পারিলে কর্তব্যের দিকটা ফাঁকি পড়ে না। চিন্তা ও কার্যের সমাধান একই সঙ্গে হইল।

খোঁচা খাইয়াও বাড়া ভাত ফেলিয়া উঠিতে পুরুষের মন সায় দিতেছিল না। তাড়াতাড়ি বাঁধিতে যাইবে এমন সময় পায়ের উপর গুরু আঘাত পাইয়া ডাস্টবিন হইতে খানিকটা সরিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, লাঠি যখন ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন ক্রোধের উপশম হইতে দেরি হইবে না ; মার খাইয়া আহার সংগ্রহ করা তাহার নূতন নয়—ইহা এক রকম দৈনিক ঘটনা বলিলেই চলে। কিন্তু সব চাপরাসীর কর্তব্যবোধ যে এক রকমের হইতে পারে না, তাহা সে তলাইয়া ভাবে নাই।

দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া চাপরাসী তাড়া করিল। শেষ পর্যন্ত পুরুষ পলাইয়া স্ত্রীর সহিত যোগ দিল।

চাপরাসীটা লাঠির ডগা দিয়া সংগৃহীত আহার্য লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কুকুরটাও চাপরাসীকে দেখিয়া যথাসময়ে সরিয়া পড়িয়াছিল। লাঠি ও লাঠিধারীর অন্তর্ধানে কুকুরটা ধীরে ধীরে বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টের দিকে অগ্রসর হইল। এক পা দুই পা চলে, আবার পিছন ফিরিয়া তাকায়। আতঙ্ক তাহার

স্বভাবদোষে দাঁড়াইয়াছে। কে বলিতে পারে, ডাস্টবিনের একছত্রপতি মহাশক্তিমান চাপরাসীর পুনরাবির্ভাব হইবে কি না! ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া লোলুপ গ্রাসে খাদ্যের উপর যেন হুমড়ি খাইয়া পড়িল। এক গ্রাস খাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার করিয়া যে দিকে চোখ যায়, সেই দিকে ছুট দিল। পলাইবার এত শক্তি সে পাইল কোথা হইতে? ব্যাপার কি জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না, উঠিয়া গিয়া তাহার বসিবার স্থানটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম, একটি প্রকাণ্ড তেঁতুলে বিছে, গায়ে মোটা মোটা আঁশ, বয়সে প্রাচীন হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় ডাস্টবিন হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। পথে কুকুরের সহিত সাক্ষাৎ—বিষ যখন আছে, তখন তাহার প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন বোধ করিয়াছে। বৃশ্চিক স্বধর্ম রক্ষা করিয়া গৃহস্থের বাড়ির দিকে চলিতে লাগিল, শত পদ একসঙ্গে চলিয়াছে, যেন একটা সৈন্যের বাহিনী—যেখানে বাধা পাইবে, সেইখানেই সংহার-মূর্তি ধারণ করিবে। খাড়াই নর্দমা অতিক্রম করিতে না পারিয়া একটা ঝাঁঝরির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

ঘুম ছাড়িয়া গিয়াছে, আবার উঠিবার সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু পায়ের ফোস্কা টাকার আকারে ফুলিয়া উঠিয়াছে, এমন অবস্থায় এক টুকরা পিচবোর্ড খুঁজিয়া বাহির না করিতে পারিলেই নয়। অথচ ডাস্টবিন খুঁজিবার উপায় নাই। চেনা মুখ দেখিলেই হয়তো—! অদূরে একটা পাহারাওয়ালার লাল-পাগড়িযুক্ত মাথাটা দেখা যাইতেছে, স্বর্গদূত বিড়ি ফুঁকিতেছেন।

কিন্তু পায়ের তলায় ফোস্কায় অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, অগ্ন্যুত্তপ্ত লোহার পাতের মত পিচের রাস্তাটার উপর পা দিতেই সমস্ত শরীরের স্নায়ুশিরা ঝনঝন করিয়া উঠিতেছে। এতটা পথ ফিরিব কি করিয়া? এক টুকরা পিচর্বোড না হইলে উপায় নাই, জুতার সোলের ছিদ্রে দিতে হইবে। একমাত্র ভরসা ওই ডাস্টবিন, ডাস্টবিনে অবশ্যই মিলিবে।

স্বর্গদূত বিড়ি ফুঁকিতেছেন, হয়তো দেখিয়া ফেলিবেন। তা ফেলুন, আমার উপায় নাই। ডাস্টবিনের দিকে আগাইয়া চলিলাম। লজ্জা করিয়াই বা ফল কি? কিছুদিন পরেই হয়তো পাগলটার মত বিঁড়া পরিয়া ডাস্টবিনে রত্ন সন্ধান করিয়া ফিরিব, অথবা ওই পুরুষটার মত, কল্পনা করিতেও সমস্ত

শরীরটা ঘিনঘিন করিয়া উঠিল। পরক্ষণেই হাসিয়া ফেলিলাম, মৃতের কবরে আপত্তির মতই আমার এ ঘৃণা অর্থহীন। আমি তো আজ মরিয়াছি। এই তো মৃত্যু। নহিলে সমস্ত দেশ আমাকে বাতিল করিয়া দিল কেন? জীবন থাকিলে সে জীবনকে বর্জন করে এমন সাধ্য কাহার? আমি মরিয়াছি—আমার ভিতরের চিত্রশিল্পী মরিয়াছে। আমার স্থান ওই ডাস্টবিনে। মুহূর্তে আমার মর্যাদা-বোধ, রুচি, লজ্জা, ভয় সব বিলুপ্ত হইয়া গেল। সংকল্প করিলাম, ছবির বোঝাটা এই ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নিষ্কৃতি লইব; —শান্তি পাইব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। গলিত শব বুকে জড়াইয়া আর থাকিব না। কিন্তু তাহার পূর্বে এক টুকরা পিচবোর্ড চাই। ছবিগুলির সঙ্গে চিত্রশিল্পীকে কবরস্থ করিয়া তখন আর পিচবোর্ডের সন্ধান করা সম্ভবপর হইবে না; মুখাগ্নি করিয়া পিছন ফিরিয়া চাহিতে নাই। ডাস্টবিনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলাম।

ছেঁড়া মাদুর, তরকারির খোসা, মাছের কাঁটা আঁশ, ভাঙা শিশি, রঙিন কাপড়ের টুকরা, কয়লা, ছাই, গলিত খবরের কাগজ, ভাঙা কুঁজার মুখ, ময়লা আবর্জনা;—কেবল এক টুকরা পিচবোর্ডেরই কি এই বিচিত্র রাজ্যে অভাব ঘটিল আমার ভাগ্যফলে?

আবার ঘাঁটিতে লাগিলাম। একটা ভাঙা পাখা, এক টুকরা লোহা, আবার এক প্রস্থ গলিত কাগজ। এটা কি? একখানা আর্টপেপার! একখানা ছবি! কোন শিল্পী আমার মতই মরিয়াছে। কি ছবি? সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।

পৃথিবীর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বতম আকাশলোকে উঠিতেছেন দিব্য-জ্যোতির্ময়-দেহ ক্রাইস্ট! করুণাপূর্ণ নেত্রে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া আছেন।

'Resurrection of Christ'!

ক্রাইস্টের পুনরুত্থান! কবর ভেদ করিয়া আকাশের ঊর্ধ্বতম লোকে চলিয়াছেন। কল্পনা নয়—সত্য, প্রত্যক্ষ সত্য, ডাস্টবিন হইতে ক্রাইস্ট উঠিয়াছেন, আমার চোখের সম্মুখে। শুধু ক্রাইস্টই নয়, এই ছবির স্রষ্টা বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী—তিনিও উঠিতেছেন ডাস্টবিন হইতে।

স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। স্থান কাল সব বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে,

পৃথিবীর রূপ দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে; দেখিলাম পৃথিবীর জ্যোতির্ময় রূপ।

পাহারাওয়ালাটা আগাইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সে কিছু বলিতে পারিল না, বিস্ময়ে অভিভূতের মত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আশ্চর্য, তাহাকে দেখিয়া আমারও ভয় হইল না, লজ্জা হইল না, ঘৃণা হইল না; কোন কথাও তাহাকে বলিলাম না। আকাশলোকে ক্ষণেকের জন্য প্রতীক্ষমান ক্রাইস্টের চরণে মাথা ঠেকাইয়া ছবিখানি সযত্নে পকেটে পুরিলাম। তারপর ছবিগুলি তুলিয়া লইয়া জ্যোতির্লোক-উদ্ভাসিত পৃথিবীর পথে অগ্রসর হইলাম। খালি পায়েই চলিয়াছি, ফোস্কার বেদনাও আর অনুভব করিতেছি না।

চলিতে চলিতে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইলাম, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডাস্টবিনকে প্রণাম করিলাম।

মাতাল

আমার গল্পের নায়ক জগৎমোহন রায় ওরফে মাতাল। মাতালকে নায়ক করিয়াছি ফরমায়-ফেলা সুদর্শন ব্যক্তি বলিয়া নয়—মানুষ-হিসাবে চিনিতাম বলিয়া। তাহার চরিত্র সাধারণের সহিত তুলনা করিলে বলিব একেবারে খাপছাড়া। শরীরের গঠনে কেমন অভদ্রোচিত জোয়ান ভাব। হয়তো কুস্তি কিংবা ঐ জাতীয় বিপদসঙ্কুল খেলাধুলা করিয়া থাকে। সেই কারণেই বোধ হয় কান দুইটা থেঁতলানো এবং নাকটা মুচড়াইয়া আছে। তথাপি মানুষটি আসলে ভীতিপ্রদ অথচ নির্দয় নয়, এ কথা যাঁহারাই তাহার সহিত সহজ-ভাবে মিশিয়াছেন, তাঁহারাই অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। মাতালকে দার্শনিক বলিয়া স্বীকার করিলেই সে পরম পরিতোষ লাভ করে, ওইটুকুই যাহা তাহার দোষ। কেহ যদি অজানাকে জানিয়া সত্যটি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে তো মাতাল তাহা ঘায়েল করিবার জন্য দৃঢ়পরিকর হইয়া উঠে।

মাতাল এ পাড়ায় উঠিয়া আসিল কেন বলা দরকার। কলেজে পড়িতে গিয়া একটি প্রাণস্পর্শী রসে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং তাহা জীবন্ত প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া। প্রাণীটি দত্ত সাহেবের কন্যা—বি-এ পড়িতেন। পাস করার পর কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাড়ি ভবানীপুরে; সুতরাং প্রেমের তাড়নায় মাতালও নিকটবর্তী বাড়ি ভাড়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ঘটনাটি বেশীদিনের নয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই পাড়ার সকলে জানিয়া ফেলিয়াছে—মাতাল মদ খায়। সত্যই মাতাল মদ খায়, কিন্তু টলে না। আশ্চর্যের বিষয়, মাতালের বাড়িতে কোন রাত্রিতেই অতিথির অভাব হয় না। সে সময় মাতাল যাহাকে সামনে পায়, তাহাকে ধরিয়াই দর্শনের নানা তত্ত্ব আলোচনা আরম্ভ করিয়া দেয় এবং হার মানাইতে পারিলে মাতালের বেশ হৃষ্টভাব দেখা যায়। অতিথিকে উদ্দেশ করিয়া বলে, 'আর এক পেগ নিন।' মাতালের গৃহে অতিথির সংখ্যা একটি নয়। নিরীহ ছাড়াও অন্যপ্রকৃতির মানুষও থাকে। দুই ঘণ্টা ধরিয়া উত্তেজক তরল পদার্থ জড় অন্তরে চলিতে থাকিলে তাহা প্রাণবান হইয়া ওঠে এবং অনুপযুক্তকেও ঊর্ধ্বতর সোপানে অধিষ্ঠিত করিয়া ছাড়ে।

রাত্রি গভীর হইতে থাকে। তখনও বোতল খোলার শব্দ শোনা যায়। আগন্তুকদের মধ্যে যাহারা টিকিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাতালের সহিত টক্কর দিয়া সোজা বসিবার চেষ্টা করে—কুক্কুটের বলকারক মাংসের সহযোগে বোতলস্থ পদার্থটুকুর পুনরাস্বাদনের আশায়। কিন্তু মৃত ও জীবন্তের মধ্যে তখন কোন প্রভেদ থাকে না। একের পর এক সজীব মাংস-পিণ্ড অসাড় জড় হইয়া স্তূপীকৃত হইতে থাকে।

মাতালের তিনটি বাড়ি পরেই রমেশ চক্রবর্তীর প্রসিদ্ধ রোয়াক। মাসান্তে করকরে তিরিশটি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে খুড়া আড়াইটি ঘর ও তৎসহিত এই রোয়াকটি দীর্ঘকাল ধরিয়া ভোগ করিতেছেন। চক্রবর্তী মহাশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ধর্ম-সংক্রান্ত সৎক্রিয়াগুলি তিনি সাক্ষী রাখিয়া করিয়া থাকেন। এই কারণেই তিনি প্রতিবেশীদের নিকট শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া আছেন। আট-দশজন স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে, রাস্তার ধারে এমন একটি রোয়াক—গল্পখোর ও তাসের খেলোয়াড়দের পক্ষে ভূস্বর্গ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা নিষ্কলঙ্ক হইয়া এই ভূস্বর্গটির ব্যবহার দাবি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে চক্রবর্তী, বোস মশাই, গণেশ, প্রেমেন মিত্তিরকে প্রধান বলিয়া গণ্য করা চলে। রোয়াকের তাস ও খোসগল্পই প্রধান আকর্ষণ। লোকাভাব অথবা নারী-হরণের অতি-আধুনিক খবর জানা না থাকিলে মাতালকে লইয়া আলোচনা চলে।

সেদিন চক্রবর্তী মহাশয় গোড়াতেই মাতালের কথা আরম্ভ করিলেন—দত্তসাহেব না হয় সাহেবী-ধরনের মানুষ মানলাম—একটু আধটু ভিতরে না পড়লে খিদে আসে না। খাবার আগে জমিদার মানুষ, বিলেত-ফেরতা মানুষ একটু খেলে—আচ্ছা খাও বাপু—তাই বলে উচ্ছৃঙ্খলতাকে এইভাবে প্রশ্রয় দেওয়াটা কি ভাল?...হাজার হোক তুমি পাড়ার পুরোনো বনেদী বাসিন্দা, গণ্যমান্য লোক! আর তোমার ছেলেটা কিনা রোজ মাতালের সঙ্গে আড্ডা দেয়! গিয়েছিলই না হয় সে বিলেত, তাই ব'লে একটা রয়-সয় আছে তো! ...শুধু কি ছেলে হে—সেদিন দেখি পিতাপুত্রে মাতালটার ঘরে ঢুকছে। পাছে আমাকে দেখতে পেলে সামলে নেয়, তাই কাণ্ডটা দেখবার জন্য মুখ ঢেকে রোয়াকে ব'সে রইলাম। ঝাড়া দু ঘণ্টা পরে বাপ ছেলের কাঁধে হাত রেখে বেরিয়ে এলেন।

বোস মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, আর বলতে হবে না, আমি আর জানি নে? পুরুষমানুষ, জমিদার মানুষ—না হয় কিছু ক্ষমাঘেন্না করলাম, তাই বলে ঐ মাতালটাকে বাড়িতে ডেকে এক টেবিলে মেয়েদের সঙ্গে খানা খাওয়ানো! শুধু তাই, দত্তসাহেবের বি-এ পাস-করা ধপধপে ফরসা মেয়েটার সঙ্গে মেলামেশার কি ঘটা! আমি তো সেদিন খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে আমার দোতলার ঘরের জানালাটির সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছি—ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়ায়, এমন সময়ে শুনলাম পিছনে চাবির থোকার আওয়াজ। ফিরে দেখি, স্বয়ং গিন্নী দাঁড়িয়ে আছেন...ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম...কাঁচুমাচু হয়ে বললাম—এত রাত হয়ে গেল খেতে ডাকনি যে? গিন্নী সামনের লনের মানিকজোড় দেখে বললেন, এ পেশা কি তোমার নতুন? ...ও গুড়ে বালি—আসলে মেয়েটি ভাল। এখন খেতে চল, অনেকক্ষণ ভাত বাড়া হয়েছে—জুড়িয়ে গেল।...আমি তো স্বচক্ষে দেখলাম মেয়েটি কেমন?

প্রেমেন মিত্তির বয়সে ঠিক কাঁচা না হইলেও কাঁচার কিনারার কান ঘেঁসিয়া চলিয়াছে। কারণ ছিল বলিয়াই এতকাল তাহার বিবাহ হয় নাই। প্রেমেনের একটা মুদ্রাদোষ, অনেকক্ষণ সহজ মানুষের মত কথা বলার পর হঠাৎ কোন একটা জায়গায় থামিয়া যায়; এই সময় জোরে কিছুর উপর চপেটাঘাত করিতে না পারিলে কথাটি গিলিয়া ফেলিতে হয়। চড় যখন মারে, তখন কিসের উপর তাহা ব্যবহৃত হইতেছে তাহা লক্ষ্য করার অবসর থাকে না। লক্ষ্য করিলেই সাবধান হইতে হয়, এবং সাবধান হইলেই বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

মিত্তির জোরে মেঝের উপর একটি চড় মারিয়া বলিল, তাই ব'লে মাতালের সঙ্গে বি-এ পাস মেয়েটাকে দেখলে কি হয়?

চাঁটির আওয়াজ শুনিয়া বোস মহাশয় বেশ খানিকটা সরিয়া বসিলেন। তাহার পর মাতাল-সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনার পর এদিনের মত সভাভঙ্গ হইল।

পাড়ায় মাতালের স্থিতি সংক্রামক হইয়া উঠিল গণেশের কীর্তির পর। তাহার তৃতীয় পক্ষের বউ নোটিস দিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না বলিয়া গিয়াছে।

গণেশকে আমরা সকলেই পুরুষ বলিয়া জানি, কিন্তু ঘরে স্ত্রী না থাকায় তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। স্ত্রী কি শুধু একলাই গিয়াছে, সঙ্গে মশারিটাও লইয়া গিয়াছে। বউ গেল তো কি বহিয়া গেল, কিন্তু সে মশারিটা সঙ্গে লইল কোন্ অধিকারে! না হয় তাহার বাবা বিবাহের সময় যৌতুক-হিসাবে মশারিখানা দানই করিয়াছিল, তাই বলিয়া কি উহা একলার?

সমস্ত রাত্রি মশার কামড়ে জর্জরিত হইয়া প্রাতে অর্ধসিদ্ধ স্বপাক অন্ন কোন প্রকারে নাকে কানে গুঁজিয়া ডক-ইয়ার্ডে আপিস করা কি চারটিখানি কথা!

বড় মেয়েটাকে শ্বশুরালয় হইতে আনিয়া রান্নার ব্যবস্থা যে করিয়া লইবে, তাহারও উপায় নাই। বেয়াই-বাড়ি সে যায় কেমন করিয়া? গত বছরের জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব এখনও বাকি পড়িয়া রহিয়াছে। নিরুপায় হইয়াই পুরাতন ঝিটাকে আট আনা মাহিনা বাড়াইয়া রান্নার কাজটা গণেশ সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে। রান্না হইতেছে ঠিক, কিন্তু গণেশ বেচারা কোনদিনই পেট ভরিয়া খাইতে পাইতেছে না। গণেশ যাহাকে সামনে পাইতেছে, তাহাকেই নিজের দুর্দশার কথা বলিয়া সহানুভূতি নিংড়াইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে। অনেকেই আশ্বাস দিয়াছে, একটা কিছু ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ইহার উপর আরও যন্ত্রণা, বাদলার দিনে সর্দি-কাসি লাগিয়াই থাকে। কখন কাহার ঔষধ দরকার হইবে কে বলিতে পারে! বিনামূল্যে ঔষধ খাইতে হইলে একমাত্র মাতাল ছাড়া গতি নাই। দেখা হইলে অনেকেই একটা কিছু ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু আসল কাজে কেহ গা দিতে চায় না। অবশেষে গণেশ মরিয়া হইয়া আবার মাতালের নিকট আসিল। একটা কিছু বন্দোবস্ত না করিয়া উঠিবে না, ইহাই ছিল তাহার পণ।

ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল আসবাবপত্র পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। খালি মার্বেলের মেঝেটা বেজায় দামী পারস্য দেশের গালিচায় ঢাকা। চেয়ারগুলাও কেমন স্ফীত ভাব ধারণ করিয়াছে, মোটা লাল মখমলের গদি। পায়া ও হাতা রূপার উপর সোনার কাজে ভরা। জানালা-দরজার পর্দা মোটা রেশমের। তাহার উপর খানসামাটা চোখে সুরমার মত কালো কি লাগাইয়াছে। তাহার পোশাকও এত ধব্‌ধবে সাদা যে, সম্বোধনটা আগেভাগেই ঠিক করিয়া রাখিতে

হয়। গণেশের সব গোলমাল হইয়া গেল। সে মাতালকে বলিতে আসিয়াছিল, আমার কি সর্বনাশ করিলে, মদ খাইবার জন্যই আমার স্ত্রী যে পলাইয়াছে। কিন্তু বলিয়া ফেলিল, খানসামা মশাই, এক দাগ কড়া দাওয়াই দিতে পার?

খানসামা প্রস্তুতই ছিল। যাচিত বস্তুটি যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিট ব্র্যাণ্ডির গলাধঃকরণ-কার্যটি এক চুমুকে শেষ করিয়া ফেলিল।

মাতাল ঘরে ঢুকিয়াই গণেশের এই অবস্থা দেখিয়াছিল। খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিল, কয় পেগ দিয়া?

খানসামা উত্তর করিল, হুজুর! এক।

মাতালঃ আউর দো কিসনে পিয়া?

খানসামাঃ হুজুর ম্যঁয়নে নহি।

মাতালঃ কমবখ্‌ৎ, তুমকো রহিস্‌ কি চাল মালুম নহি!...ডিক্যাণ্টার লে আ—দে, বাবুকো আউর দে।

নিটের ক্রিয়া দ্রুততর। ইতিমধ্যেই তাহার নেশা পাগলা ঘোড়ার মত ছুটিয়াছে। এমন সময় হুকুমযুক্ত অভ্যর্থনা এবং সহানুভূতিপূর্ণ আদেশ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হইল না। ঔষধের পূর্ণমাত্রাই গণেশকে খাইতে হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাতাল বুঝিল, তাহার ঔষধ ধরিয়াছে। মাতাল বলিল, এইবার তোমার কি বলবার আছে বল।

গণেশ কহিল, আজ্ঞে, বলবার আর কি আছে! আপনি হলেন রাজা লোক। একটু আধটু নেকনজরে রাখবেন—আর কি বলব! তা গেলাসটা যে খালি হয়ে গেছে রাজা।

মাতালঃ তা তো দেখছি। কিন্তু এখন আর নয়। কারপেটটা নষ্ট করতে চাই না। একজন ভদ্রলোকের আসবার কথা আছে। হ্যাঁ, তোমার স্ত্রী সম্বন্ধে কি কথা বলছিলে?

স্ত্রীর কথা উঠিতেই গণেশ তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, আরে, রেখে দিন তার কথা। এখনও মাসে তিরিশ টাকা মাইনে পাই। তার উপর আট-দশ টাকা উপরিও আছে। ও ছুঁড়ীকে আর ঘরে ঢুকতে দেব ভেবেছেন? আপনি একটু সহায় থাকলে কর্তা—ও—ও রকম অ—অনেক মেয়েকেই শায়েস্তা ক'রে দিতে পারি।

মাতালঃ যদি জোর ক'রে ফিরে আসে?

তৃতীয় পক্ষের সেই বলিষ্ঠা কর্মপটু স্ত্রীটির কথা মনে আসিতেই গণেশের একটু দমিবার ভাব আসিতেছিল। মাতাল ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, আচ্ছা, আর আধ পেগ দিতে পারি, কিন্তু বেশী না।

আদেশানুসারে সুরার সহিত পাত্রটির আবার সংযোগ ঘটিল।

অল্পক্ষণের ভিতর পুরা সাড়ে তিন পেগ ব্র্যাণ্ডি অনভ্যস্তের অন্তরে মন্ত্রণা আঁটিতে থাকিলে নিতান্ত গোবেচারাও সাহসী হইয়া উঠে।

গণেশ বলিল, তা হ'লেও আর একটা বিয়ে করব। আজই করব—এক্ষুনি করব। আর তাগড়া বউ বিয়ে করব, যাতে ও ছুঁড়ী ফিরে এলেও আমায় না কিছু করতে পারে। দেখুন না, এখুনি ব্যবস্থা করছি।

গণেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত দুইটার সহিত কেহ যেন ভারী ওজন ঝুলাইয়া দিয়াছে। পা দুইটাও তালপাতার সেপাইয়ের মত হঠাৎ অকারণ বাঁকিয়া যাইতেছে। তথাপি সব কিছু অগ্রাহ্য করিয়া সে দাঁড়াইয়াছে। মাতাল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি উঠলে যে?

গণেশ ত্রিভঙ্গমুরারীকে অনুকরণ করিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর উত্তর করিল, আজ্ঞে রাজা, বিয়ের ব্যবস্থা করতে চলেছি।

বাড়ি ফিরিয়া গণেশ দেখিল, বাহান্ন কি তিপ্পান্ন বৎসরের হাঁপানী-রোগগ্রস্তা রুগ্না ঝিটা তখন উনানে ফুঁ দিতেছে আর বকিয়া চলিয়াছে—আর পারি না, আট আনার তরে আগুন তাত আর সয় না। বাবু অন্য লোক দেখুক—নয় চাকরি ছেড়ে দি। বাসনমাজা ছিল ভাল। এমন লক্ষ্মীছাড়া বউ কোথাও দেখিনি—স্বামী-সোহাগ করবি না তো কি বাইরের লোকের সঙ্গে সোহাগ করবি?...কর্ না, তখন দেখবি তোর অবস্থা হবে আমার মত।...আরও কত কি বকিতেছিল কে জানে।

গণেশ তখন টলিতে আরম্ভ করিয়াছে—মাথায় এবং পায়ে। কথাও যাহা বলিতেছে, তাহা মাঝে মাঝে তাল পাকাইয়া অর্থহীন হইয়া যাইতেছে। এক শ্রেণীর মাতাল আছে, যাহারা অনেকক্ষণ ঠিক থাকিয়া হঠাৎ বেসামাল হইয়া যায়। গণেশ আমাদের উক্ত শ্রেণীভুক্ত। ঝিকে সে ঝি দেখিল না। তাহার মনে হইল, গৃহলক্ষ্মী পূর্ণযুবতীর রূপ লইয়া সংসারধর্মে দেহমন উৎসর্গ

করিয়াছে। অন্তর্লোক হইতে কে যেন বলিয়া দিল—জাতিতে উহারা সদ্‌গোপ—বিবাহে কোন বাধা নাই।

গণেশ ডাকিল, এই ছুঁড়ী!...শুনে যা—তোকে আমি বিয়ে করব। আজই করব রে—গয়না দেব—পাউডার দেব—পাউডার্—পাউডার্ র্ র্ রে—

অদ্ভুত উচ্ছ্বাস তাহার উপরই প্রয়োগ হইতেছে, ঝি বিশ্বাস করিতে পারিল না। অধুনা যে কয়টি বিশেষণ নিত্যপ্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাদের মধ্যে হতচ্ছাড়ী নেকী হারামজাদী ইত্যাদিই প্রধান। ছুঁড়ী শব্দটি তাহার উপর খুব কম হইলেও তিরিশ বৎসর কেহ ব্যবহার করে নাই। সুতরাং বাবু মদ খাইয়া আসিয়াছেন এবং আবোল-তাবোল বকিতেছেন ভাবিয়াই ঘরে ঢুকিল আলো জ্বালিতে—হ্যারিকেনটা সবে তখন ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় গণেশ শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে ঝিয়ের পা জড়াইয়া ধরিল, তাহার পর মরিয়া হইয়া প্রেম নিবেদন শুরু করিয়া দিল। প্রকাশভঙ্গী তখন যৎপরোনাস্তি করুণ হইয়া উঠিয়াছে। সে বলিতেছিল, সত্যি তোকে বিয়ে...বিয়ে করব—তুই বড় মিষ্টি...এক সের গুড়ের চেয়েও মিষ্টি...ওরে তুই কত মিষ্টি...তুই কি জানিস!

দুই যুগ অতিবাহিত হইতে চলিল—ঝিকে এই ধরনের সম্ভাষণ কেহ করে নাই। বাবু হাত-পা ধরিতেই কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছিল। তাহার পর আকস্মিক বিবাহের প্রস্তাবটা যখন উপলব্ধি করিল, তখন—বাবারে...মারে...রক্ষে কর...মেরে ফেললে রে—বলিয়া চীৎকার করিয়া তো উঠিলই, অধিকন্তু নির্দয়ভাবে কর্দমাক্ত ফাটা পা দুইটাও কোন প্রকারে বাবুর আকর্ষণ হইতে মুক্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সোজা বড় রাস্তা ধরিল। গণেশ একলা ঘরের ভিতর বলিতে লাগিল, তুইও আমাকে ছেড়ে গেলি...এ প্রাণ আর রাখব না। কালই একটা ব্যবস্থা করব—দেখে নিস্...কালই। গণেশ সব কথা শেষ করিতে পারিল না, ঠাণ্ডা মেঝের উপরই শুইয়া পড়িল—রাস্তার ধারের দরজাটা খোলাই পড়িয়া থাকিল।

ঝি বাড়ি ফিরিয়া গণেশের মাতলামি ও কেলেঙ্কারির কথাটা একটু অতিরঞ্জিতভাবে রাষ্ট্র করিয়া দিল। ফলে পাড়ায় দারুণ আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেহ বলিল—আজ ঝিয়ের উপর অত্যাচার করছে, কাল ভদ্রলোকের মেয়ের উপর

করবে না, তার নিশ্চয়তা কি আছে! কেহ বলে—মাতাল পাড়ায় থাকিলে সমাজ যে ব্যাভিচারে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে মাতাল তাড়ানোর সত্যই একটা ছোটখাট কমিটি হইয়া গেল। প্রতিদিনই চক্রবর্তী মহাশয়ের রোয়াকে মন্ত্রণা চলিতে লাগিল—রেজোলিউশনের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল ; কিন্তু ম্যাও ধরিবার উপযুক্ত সাহস কেহ প্রকাশ করিল না।

অবশেষে ভোটে সাব্যস্ত হইল, বোস মশাই মাতালের নিকট যাইবেন এবং অপর সকলে দত্তসাহেবকে ধরিবেন।

মাতালের গৃহে প্রবেশ করিয়াই বোস মহাশয় সব কিছু নূতন ধরনের দেখিলেন। স্থানে স্থানে বিচিত্র কায়দায় সাহেবী ধরনের ফুলের তোড়া দিয়া ঘরটিকে সাজানো হইয়াছে। ঘরোয়া চেয়ার ছাড়াও ভাড়া করা চেয়ারও রহিয়াছে, বেশ ঠেসাঠেসি অবস্থা। আশু উৎসবের সূচনা সম্বন্ধে ভ্রম হইবার উপায় নাই। খাস খানসামা সাদা সাজ-পোশাক ছাড়িয়া জরিদার লাল আচকান পরিয়াছে। নিম্নাঙ্গে চুড়িদার সাদা ব্রিচেস্, কোমরবন্ধে ছোরা, বাঁট তাহার হস্তীদন্তের—স্বর্ণ ও কারুকার্যখচিত, বাঁটের তলায় সোনালী ঝুম্কি ঝুলিতেছে। মানুষটাকে দেখিলেই মনে হয় অত্যন্ত ব্যস্ত। মাঝে মাঝে তাহার অধীনে অন্য ভৃত্যদের হুকুম করিতেছে। বাড়ির ভিতর মেয়েদেরও হুলুধ্বনি শোনা যাইতেছে। বোস মহাশয়ের খটকা লাগিয়া গিয়াছে—ব্যাপার কি! খানসামা যে রকম ব্যস্ত, তাহাতে তাহাকে দাঁড় করাইয়া কথা বলিতেও ইতস্তত করিতে হয়। তথাপি চেনা লোক তো। সাহস সঞ্চয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খানসামা ঠাকুর, কি কাণ্ড বল তো?

খানসামা জরদা মুখে ফেলিয়া বলিল, হুজুরকী শাদী হ্যায়।

বোস মহাশয়ঃ আরে ঠাকুর, সাদী মানে বিয়ে তো? সাহেব বিয়ে করছেন নাকি?

খানসামাঃ জী। আজ উন্‌কে তিলক কা ইন্তজাম হো রহা হ্যায়। রাতমেঁ বাঈজীকা গানা ভী হ্যায়—খাস দিল্লীওয়ালী—হজার রুপয়া এক রাতকা মজুরা। বলিয়া একটু মুচকি হাসিল এবং চোখের বঙ্কিম ভঙ্গীতে

কি একটা ইশারাও জানাইয়া দিল।

বোস মহাশয়ঃ বাঈজী দিল্লী থেকে আসছে, আমরা মজলিসি গান শুনতে পাব না—পাড়ায় থাকি অ্যাঁয়?

খানসামাঃ জরুর। ম্যানেজারবাবু তো আপলোগেঁকা সুবিধা আফিরৎকে লিয়ে কেয়া কেয়া ন কর রহে হ্যাঁয়। আপও তসরিফ রখিয়ে, ম্যঁয় হুজুরকে পাশ জাতা হুঁ...মগর ইস বখৎ উনকা মিলনা মুশকিল হ্যায়, কেঁওকি উনকে বদনমেঁ আওরতেঁ হলদি লগা রহি হ্যাঁয়। আপ বৈঠেঁ, ম্যঁয় দেখু ক্যা কর সকতী,...আপকো শরাব দুঁ ক্যা? আরে ভুল হো গঈ—দওয়াই—দওয়াই—হাঁ দওয়াই দুঁ ক্যা।

বোস মহাশয়ঃ হ্যাঁ বাবা, একটু দিলে ভাল হয়। মাথাটা টিপ্ টিপ্ করছে।

যো হুকুম!—বলিয়া খানসামা ঔষধের পেগটি টেবিলে রাখিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দাওয়াই খাইতে খাইতে বোস মহাশয় বেশ মশগুল হইয়া উঠিতেছিলেন। বাঈজীর নাচের চিন্তা আর খানসামার ঐ ইশারাটা তাঁহার মনকে বেশ কাঁচা করিয়া আনিয়াছিল। কল্পনায় দেখিতেছিলেন, বাঈজী তাঁহার সামনে আসিয়া নাচের তালে দুইটি পাক খাইয়া গেল—গঠনের কি অপূর্ব দোলা!

আরে ছ্যাঃ, আমি থাকিতে আমার মাতাল সাহেবকে কে তাড়ায় দেখিয়া লইব! কমিটি কি করিতে পারে! এত বড় একটা দিলদার লোক, সে কিনা সমাজ নষ্ট করিতেছে?...সমাজের সকলকেই তো চিনি, যেন আমার চেয়ে তাহাদের চরিত্র ভাল...মাতাল আমাদের পাড়ায় থাকিবে এবং তাহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া সকলের সামনে ধরিব। ইহার জন্য খেঁদির মা আমাকে যদি ঝাঁটা-পেটাও করে তো কুছপরোয়া নেই।

মাতাল ঘরে ঢুকিল। ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন...সর্বাঙ্গে হলুদ মাখা। হলুদে সিক্ত যজ্ঞোপবীত বাম দিক হইতে আঁকিয়া বাঁকিয়া বিশাল বক্ষ অতিক্রম করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে। যেন পার্বত্য উপত্যকায় একটি ক্ষীণ জলস্রোত চলিয়াছে। বলিষ্ঠ আকৃতি জরায় প্রপীড়িত বোস মহাশয়কে আকর্ষণ করিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিলেন। মাতাল অনুরোধ করিল বসিতে। নিজে দাঁড়াইয়া রহিল, হয় তো এখনই অন্দরমহল হইতে ডাক আসিতে

পারে। কমিটির রেজলিউশন মনে পড়িতেই বোস ভয় পাইলেন। হয় তো ইতিমধ্যে কেহ মাতালকে উঠিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া ফেলিয়াছে। সন্দেহটা কাটাইবার জন্য কথাটা ঘুরাইয়া বলিলেন, শুনলাম, আপনি নাকি শীগ্‌গীর বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন?

মাতালঃ আজ্ঞে, সে কি! বাড়ি যে আমি কিনে ফেলেছি, তা ছাড়া, সামনের রবিবার আমার বিয়ে...এই বাড়ি থেকেই বিয়ে হবার কথা।...বাড়ির মালিক কিছু দিন থেকে গোলমাল করছিলেন...কোন কিছু সারাতে চায় না... তাই বাড়িটা কিনেই ফেললাম। আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ পান নি? আজ রাত্রে আসছেন তো?...একটু গান-বাজনা হবে। তারপর যাবেন। বোস মহাশয়ের চক্ষু আনন্দাশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার পর একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, এখন তা হ'লে উঠি বাবা। নমস্কার করিয়া মাতাল ভিতরে চলিয়া গেল। বোস মহাশয় সোজা দত্তসাহেবের বাড়িমুখো হাঁটিতে লাগিলেন।

ওদিকে দত্তসাহেবের বাড়িতে কমিটির বৈঠক বসিয়াছে। ড্রয়িং-রুমটি দেখিলে মনে হয় এখানে বাঙালী বাস করে না। প্রেমেন মিত্তির একাই একশো। সকলের হইয়া কথা বলিতেছে এবং নিজেই উত্তর দিয়া যুক্তিকে অকাট্য প্রমাণ করিয়া ছাড়িতেছে। এই সময় বোস মহাশয় সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—ভাবটা রীতিমত কড়া। দত্তসাহেব এখনও বাহির হন নাই—পোশাক-ঘরে রহিয়াছেন। তিনি ফিট্‌ফাট না হইয়া বাহিরের লোকের সামনে আসেন না। তিনি প্রস্তুত হইতে থাকুন, ইতিমধ্যে আমরা কমিটির আলোচনা শুনিয়া লই।

চক্রবর্তী মহাশয় উদ্ধত মিত্তিরকে বলিলেন, বোস যে বলছিল মানহানির মামলার কথা—তা হ'লে তো মাতাল আমাদেরও জড়াতে পারে—তোমাদের পাল্লায় প'ড়ে শেষ পর্যন্ত কি আদালতে ছোটাছুটি করতে হবে নাকি? কাজ কি বাপু, ও আছে, থাক না এক কোণে।

প্রেমেন জোর দিয়া বলিল, কখনই না। আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না। প্রেমেন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, কথাও আটকাইয়াছে, লক্ষণ সুবিধার নয় দেখিয়া চক্রবর্তী খুড়া সরিয়া বসিলেন। খুড়াকে না পাইয়া বহুকোণযুক্ত

বর্মাদেশীয় বাঁটকুল থালা-টেবিলে এক চাঁটি বসাইয়া দিল। টেবিলটি আলগোছে ব্যবহারের জন্য তৈয়ারি। সজোরে চপেটাঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় শোভাবর্ধনের সরঞ্জাম অনেকগুলি মাটিতে পড়িয়া গেল এবং কাঁচের দ্রব্যগুলি ভাঙিল। প্রেমেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত না করিয়া বলিয়া চলিল, আরে, রেখে দিন আপনার দয়া। না হয় পয়সাই কিছু আছে আর কোঁচানো কাপড় প'রে চাল মারে। তাই ব'লে ভদ্রপাড়ায় যা খুশী তাই—

বক্তব্যটা শেষ হইতে পাইল না, দত্তসাহেব ঘরে ঢুকিলেন। রংটা প্রায় সাহেবদের মত। তাহার উপর ঘষামাজায় প্রায় শব্দের ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় বোধ হইতেছিল। তিনি প্রেমেনের মূর্তি ও টেবিলের অবস্থা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেই মনে পড়িল, এই ভদ্রলোকই তো তাঁহার নিকট অল্প দিন আগে চাঁদা চাহিতে আসিয়াছিল এবং অকারণ ম্যানেজারবাবুর জানুর উপর এক চড় বসাইয়া দিয়াছিল। পরে তাঁহার পিঠটাও ব্যবহার করিবার চেষ্টায় ছিল। ফিট্‌স্ (fits) অনুমান করিয়া অঙ্গীকৃত চাঁদার দ্বিগুণ দিয়া অব্যাহতি পান। পূর্বের ঘটনা স্মরণ হওয়ায় প্রেমেনের নিকট হইতে বেশ একটু দূরে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি বলুন তো?

কমিটির রেজলিউশন যাহাতে প্রকাশ না হয়, ইহাই ছিল বোস মহাশয়ের অন্তরের কথা। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, কি আর বলব বলুন, মাথা-ধরা আর নানা অসুখ নিয়ে মারা গেলাম। কাছাকাছি একটা ডাক্তারখানাও নেই। থাকলেই বা কি হ'ত, আমরা কি ইচ্ছে করলেই পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনতে পারি?...আপনি যদি পাড়ায় একটা ডিসপেন্সারি ক'রে দেন, তা হ'লে আমরা সকলেই বেঁচে যাই—আপনাকে ধরব না তো কাকে ধরব? আপনি হলেন—

প্রেমেন ক্ষেপিয়া ছিল, টেবিলে আবার চাঁটি মারিয়া বলিল, স্যর্, আমাদের রেজলিউশন মোটেও ফ্রি ডিসপেন্সারি সম্বন্ধে নয়। আসল কথা, আমরা ঐ মাতালটাকে তাড়াতে চাই, এবং বোস মশাইয়ের মাতাল না হ'লে চলে না, সেই জন্যই বাজে বিষয় পেড়ে ফেলেছেন। বলব নাকি, কোন্ ওষুধ খেলে আপনার মাথা ধরা সারে?

দত্তসাহেব ব্যক্তিগত নিন্দাকীর্তন পছন্দ করিতেন না। কথাটা চাপা দিয়া তবে বলিলেন, আহা চটেন কেন! মাতালটা কে শুনি তো ব্যবস্থা করতে পারি।

মিত্তির এবার সত্যই উঠিয়া বোস মহাশয়ের নিকটে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল—কারণ ম্‌ম্‌মাতাল শব্দটি কোন প্রকারেই বাহির হইতে চাহিতেছিল না—গতিক খারাপ বুঝিয়া বোস মশাই নিজেই তাহার হইয়া শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মাতাল বলিয়াই জিব কাটিলেন। ইতিমধ্যে মিত্তির শব্দটি কি ভাবে বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার পর বাধা না থাকায় বলিয়া চলিল, সার্‌, পাড়ায় থাকেন, মাতাল কে জানেন না? আমাদের চরিত্র নিয়ে খেলা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। যাকে পাচ্ছে তাকে ধ'রেই—কি বলে—কি বলে, মদ খাইয়ে ছাড়ছে—এমন কি আমাকে পর্যন্ত। আপনাকে আর কি বলব, এখানে অতগুলো লোক দেখছেন, সকলেই ঐ মাতালের মদে মোটা হয়েছেন।

দত্ত সাহেবঃ তা মাতালটা কে, না জানলে—

মিত্তিরঃ মাতাল—একেবারে খাঁটি মাতাল সার্‌—ওর নামটা কি আর মনে রাখবার জিনিস? মাতাল বললেই এ পাড়ায় সকলে বোঝে, লোকটা কে! দাঁড়ান, মনে করছি—হ্যাঁ, পেয়েছি—জগৎমোহন রায়, ঠিক না বোস মশায়? ওকে না তাড়ালে আমাদের সকলের চরিত্র গেল।

বোস মশাই রেজলিউশন সমর্থন করিতে আসেন নাই, একবার মার খাইবার ভয়ে তাহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এবার সাবধান হইয়া গেলেন, সুতরাং কিছুই উত্তর দিলেন না।

দত্ত সাহেবঃ জগৎমোহন রায়!...আপনি মহারাজকুমার জগৎমোহন রায়ের কথা বলছেন নাকি? ছি ছি, আপনি বলছেন কি? মহারাজকুমার যে আমার জামাই হ'তে চলেছেন। সামনের রবিবার আমার লিলির সঙ্গে বিয়ে। কেন, আপনারা নিমন্ত্রণ-পত্র পান নি? আমি তো পাড়ার সকলের নাম নিজে লিখে দিয়েছি—Most irresponsible man is my secretary.

মাতাল—মহারাজকুমার জগৎমোহন রায়! দত্তসাহেব তাঁহার শ্বশুর হইতে চলিয়াছেন? প্রেমেন্দ্র বসিয়া পড়িল, রেজলিউশন প্রকাশ করা হইল না।

মুক্তি

জীবন-সংগ্রামে নানারূপ ঘাতপ্রতিঘাত এড়াইয়া লাবণ্য দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর নিজের সংসার শাসন করিয়া আসিতেছিল। আজ সেই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, কারণ সংসারে শাসিত হইবার প্রধান মানুষটি গৃহত্যাগী।

আদালতের আইন লাবণ্যের বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। এক-তরফা মকদ্দমায় বাদীর তরফ হইতে অনুপস্থিত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে যতগুলি কলঙ্কের তালিকা হাকিমের সামনে পেশ করা হইয়াছিল, সব কয়টি নিরবচ্ছিন্ন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে সময় লাগে নাই। শ্মশান-পুরোহিত দাহ-ক্রিয়ার পর দগ্ধ দেহের স্মৃতি বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যে ভাবে নির্বাপিত চিতা হইতে ভস্ম সঞ্চয় করিয়া থাকে সেই ভাবে, কর্তব্য শেষ করিয়া লাবণ্যের পক্ষের উকিল আইনসম্মত ডিক্রীর ছাড়পত্র লাবণ্যের হাতে হৃষ্টচিত্তে গুঁজিয়া দিল। মুক্তির আদেশ লইয়া লাবণ্য গৃহে ফিরিল।

আধুনিক ধরনের দোতলা বাড়ি, চতুষ্পার্শ্বে লন। উপরে উঠিতে উঠিতে সিঁড়ির সব কয়টি ধাপ উত্তীর্ণ হইলে শ্বেত পাথরের বাঁধানো চাতাল পাওয়া যায়, তাহার পরেই প্রশস্ত ড্রইং-রুম, প্রবেশপথে সুবৃহৎ তৈলচিত্র—বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী আঁকিয়াছিলেন। আলেখ্য বাস্তবের সত্যকে জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে। ছবি দেখিলেই মনে হয়, মানুষগুলির কিছু বলিবার আছে, এখনই হয়তো ওষ্ঠ নড়িয়া উঠিবে।

দেহ ও মন অবসাদে অচল হইয়া গিয়াছে, তথাপি লাবণ্য ছবির সামনে ক্ষণেকের জন্য না দাঁড়াইয়া পারিল না। স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র অতি নিকটে বসিয়া আছে—সকলেই সকলকে স্পর্শ করিয়া, কিন্তু ছবির বাহিরে তাহাদের ছুঁইবার উপায় নাই। একমাত্র সন্তান, সে চলিয়া গিয়াছে ইহজগতের বাহিরে। স্বামী—আজ পরিত্যক্ত ও নিরুদ্দেশ। গাঢ় এবং চাপা দীর্ঘনিশ্বাস হৃদয়ের অতল গহ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

স্বামীর গৃহত্যাগের পূর্বদিনের ঘটনা মনে পড়িল। যে দিন তিনি গভীর রাত্রিতে পূর্ণ উত্তেজনা লইয়া বাড়ি ফিরিয়াছিলেন। অনির্ভরশীল পা

দুইটার উপর বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই, টাল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। কোন প্রকারে নিজেকে টানিয়া তুলিয়াই নূতন বেয়ারাকে জুতার ফিতা খুলিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। জড়িত ভাষার আদেশ বেয়ারা বুঝিতে পারে নাই। বিলম্বে আদেশ অমান্য হইতেছে ভাবিয়া স্বামী তাঁহার বলিষ্ঠ হস্তের চড় বেয়ারার গণ্ডে বসাইয়া দিয়াছিলেন। বেচারা অকারণে চড় খাইয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিল। চড় মারিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। অনুপযুক্ত বেয়ারা বাহাল করিবার জন্য লাবণ্যকে সর্বসমক্ষে এমন ভাবে তিরস্কার করিয়াছিলেন, যাহা সুরুচির বাহিরের ব্যাপার।

পরের দিন নেশার কবল হইতে মুক্তি পাইয়া গত রাত্রির ঘটনাগুলি যখন অস্পষ্টভাবে মনে পড়িতে লাগিল, তখন তিনি নিজের কীর্তি নিজেই ক্ষমা করিতে পারিলেন না। প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইয়াছিল, যাহা তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়া ছাড়িল।

লাবণ্য ভাবিতে পারে নাই, সুরার প্রতিক্রিয়ায় এমন একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়া যাইবে।

ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিতেই ঘড়ির ঘণ্টা যাহা সংকেত করিল, তাহা গৃহ-কর্তার চা খাইবার সময়। ত্রস্তে লাবণ্য ডাকিল, বেয়ারা! বারো বৎসরের নিত্য অভ্যাস সে ভুলিতে পারে নাই—এখন যে সাহেবের চা খাইবার সময়।

বেয়ারা নিকটেই ছিল, সামনে আসিয়া আজ্ঞাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইল। লাবণ্য বলিতে চাহিয়াছিল, সাহেবের চায়ের জল তৈয়ারি কর; কিন্তু বলা হইল না, সাহেব তো আজ নাই। শান্তভাবে বেয়ারাকে চলিয়া যাইতে বলিল; তাহার পর একটি বৃহৎ কুশনযুক্ত সোফায় নিজেকে এলাইয়া দিল। এখান হইতে বিস্তৃত লন দেখা যায়—কলে কাটা ঘাস—যেন একটি বিরাট তাজা সবুজ-রংয়ের গালিচা পাতা রহিয়াছে। আশেপাশে কত সুগন্ধ ও রঙিন ফুলের গাছ। রজনীগন্ধা, হেনা, বারগেনডেলিয়া, আরও কত কি—স্বামী স্বহস্তে গাছের চারাগুলি লাগাইয়াছিলেন। সমস্ত দিন কাজের পর কর্মক্লান্ত গৃহকর্তা এইখানে আসিয়া বসিতেন। গাড়ি হইতে নামিয়াই লাবণ্যের নাম ধরিয়া ডাকিতেন। লনের যে স্থানটিতে উভয়ের বসিবার জন্য প্রত্যহ রঙিন বেতের চেয়ার রাখা হইত, আজ সেখানে কাহারও বসিবার ব্যবস্থা হয় নাই।

লাবণ্য চোখ ফিরাইয়া লইল, হয়তো অন্যমনস্কতার আশ্রয়ের জন্য দৃষ্টি ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু নিকটেই স্বামীর প্রিয় ও দুর্লভ পুস্তক-গুলি এলোমেলো অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখিয়া উঠিতে হইল। নিজের দামী শাড়ি দিয়াই এই কয়দিনের সঞ্চিত ধূলা পরিষ্কার করিল, চক্রাকার বুক-শেল্‌ফে পুস্তকগুলি গুছাইয়া রাখিল—ইহাতে সে যেন একটু সান্ত্বনাও পাইল।

ঘরের ভিতর বেশীক্ষণ থাকা অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতেছিল। প্রত্যেকটি আসবাবপত্রে স্বামীর স্মৃতি নিবিড়ভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকটি জিনিস স্বামী স্বহস্তে সাজাইয়াছিলেন। সুরুচির এরূপ দৃষ্টান্ত ক্বচিৎ দেখা যায়।

লাবণ্য ড্রইং-রুম ছাড়িয়া শুইবার ঘরে চলিয়া গেল। শুভ্রফেননিভ শয্যা আয়া অভ্যাসমত সাজাইয়া রাখিয়াছে। পাশাপাশি দুইটি মাথার বালিশ; একটির অধিক প্রয়োজন নাই, তথাপি আর একটি পুরাতনের দাবি ছাড়ে নাই—লাবণ্যের বালিশের পাশেই নিজের স্থানটিতে যেন কৃপাথীর মত পড়িয়া রহিয়াছে।

লাবণ্য এইখানে নিজেকে আর সংযত করিতে পারিল না, স্বামীর বালিশকে বক্ষের মধ্যে টানিয়া লইল। জড় কার্পাসে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যেন উহা অনুভব করিবার শক্তি পাইয়াছে। লাবণ্য বালিশটাকে নানাভাবে স্পর্শ করিল, অবশেষে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল—হয়তো বা কাঁদিতেছিল। কোন রোগ-যন্ত্রণাতেও সে এতটা অস্থির হইয়া উঠে নাই। বসন ও কেশবিন্যাসের পারিপাট্য শ্লথ হইয়া গিয়াছে, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় দরোয়ান দরজার বাহির হইতে টোকা মারিয়া বলিল, কতকগুলি ভদ্রলোক ও মহিলা মেমসাহেবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।

জড়িত উচ্চারণে লাবণ্য উত্তর করিল, ড্রইং-রুমে বসাও, আমি আসছি।

লাবণ্যের সহিত যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে, তাহারা সকলেই জানিত, সব রকম দুর্বলতাকে সে কতটা ছোট করিয়া দেখে। তাহার আত্মশাসন সাধারণের নিকট বিস্ময়ের বস্তু। রূপের দিক দিয়া যে খ্যাতি তাহার এক যুগ আগে প্রাপ্য ছিল, আজও তাহা রহিয়া গিয়াছে—বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু

যৌবনশ্রী ম্রিয়মাণ হয় নাই। যুবকের দল এখনও ঐ রূপে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু কাছে আসিতে সাহস পায় না তাহার চারিত্রিক কঠোরতার জন্য। অথচ চায়ের আসরে, ডিনার পার্টিতে, পিকনিকে লাবণ্য না থাকিলে হুজুক পুরাপুরি জমে না, কারণ সে এই সব ব্যাপারে ইচ্ছামত বয়স কমাইয়া ফেলিতে পারে।

লাবণ্য পাশের ঘরের বাথরুম হইতে মুখ হাত ধুইয়া ফিরিয়াছে। অতিথি-অভ্যর্থনার জন্য সে এখন প্রস্তুত। কে বলিবে, এই নারী অল্পক্ষণ পূর্বে শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। আয়নার সামনে গিয়া আর একবার মুখের পাউডার ঠিক করিয়া লইল, কারণ সে জানিত, যাহাদের অভ্যর্থনা করিতে চলিয়াছে, তাহারা লাবণ্যকে শোকাভিভূত অবস্থায় দেখিতে চায় না। তাহাদেরই নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত চেষ্টায় লাবণ্য আজ উচ্ছৃংখল স্বামীর অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইয়াছে। মুক্তি তো চায় নাই, কিন্তু ঘটনাচক্রের ঘূর্ণমান গতি তাহা ঘটাইয়া দিয়াছে।

লাবণ্য হাসিমুখে ঘরে ঢুকিল, যেন কিছুই হয় নাই। ঘরে ঢুকিতেই দিলীপ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, Here comes the merry widow, three cheers for her.

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ তকমা সংগ্রহ করিলেও লাবণ্য অনেক বিষয়ে সংস্কারবদ্ধ হিন্দু। বিধবা কথাটা বিদেশী ভাষায় উচ্চারিত হইলেও তাহার সাঙ্কেতিক অর্থ সাংঘাতিকভাবে হৃদয়কে আঘাত করিল, যাহার প্রতিক্রিয়া বিষাদের ছাপ মুখের উপর আনিয়া ফেলিতেছিল। দুঃখের বহিঃপ্রকাশকে অবলীলাক্রমে আড়াল দিয়া লাবণ্য উচ্ছ্বসিতভাবে দিলীপের সহিত করমর্দন করিল, এবং অপরদের যথোপযুক্তভাবে অভিনন্দন জানাইয়া বসিল।

সুরুচি—শিক্ষিতা সিনেমা-অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন, তিনিও সুখবর শুনিয়া congratulate করিতে আসিয়াছিলেন—বলিলেন, তুমি তো এখন বেজায় বড়লোক, এতবড় success কি ভাবে celebrate করছ বল।

রঞ্জন বলিল, আমার মনে হয় একটি ভাল রকম শ্যাম্পেন (champagne) পার্টি না হ'লে equal to the occasion হবে না।

দিলীপ বলিল, That's an excellent suggestion ; তা হ'লে লাবণ্যদি,

ব্যবস্থাটা শীঘ্র ক'রে ফেলো।

লাবণ্য অন্য কথা পাড়িয়া তখনকার মত প্রস্তাবটা চাপা দিয়া দিল। শ্যাম্‌পেনের কথা উঠিতেই সে মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিল, উত্তেজক তরল পদার্থটির অনুপ্রেরণায় মানুষ কতটা অধঃস্তরে নামিতে পারে—সে শুধু দেখে নাই, প্রত্যেকটি স্নায়ুর দ্বারা অনুভব করিয়াছে। আজ যে উৎসবের প্রস্তাব ও আয়োজন চলিয়াছে, তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল সাত বৎসর আগে, কোন উচ্চপদস্থ সাহেব বন্ধুর বাড়িতে রাত্রির খানা খাইতে গিয়া। সুরা-বিদ্বেষী স্বামী কিছুতেই মদ্য স্পর্শ করিবেন না, ইহাতেই হোস্ট (host) ও হোস্টেসের (hostess) বিশেষ অসুবিধা হইতেছিল—নিমন্ত্রিত পান না করিলে তাঁহারা উহা ব্যবহার করেন কেমন করিয়া! অস্বস্তিকর ঘটনাটি লক্ষ্য করিয়া লাবণ্য এক চুমুক পান করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল, কালেভদ্রে যৎসামান্য সুরা পান করিলে মানুষ উচ্চ চারিত্রিক আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে স্বামী সাহেবী ভদ্রতার অনুষ্ঠান মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে তিনি চুমুক দেন নাই, ঔষধ গলাধঃকরণের ন্যায় ক্ষুদ্র পাত্রে যাহা কিছু ছিল সব একসঙ্গে গিলিয়া ফেলিয়াছিলেন—বুক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ভদ্রাচারের শাসন লুকাইতে পারে নাই। কিছুক্ষণ পরে মনে যে আমেজ আসিয়াছিল তাহা উপভোগ করিয়াছিলেন, মনোরাজ্যে নূতনের সাড়া পাইয়াছিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে সুরা-বিদ্বেষী মানুষ সুরার ভিতর সঞ্জীবনী শক্তির সন্ধান পাইয়া গেলেন, নেশার রসগ্রাহী হইয়া উঠিলেন। রস তাঁহাকে লইয়া চলিতে লাগিল এমন একটি দিকে, যেখান হইতে ফিরিবার শক্তি তাঁহার আর রহিল না। লাবণ্য বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীকে এই দুর্বলতা হইতে মুক্ত করিতে পারিল না। সে ভাবিতে পারে নাই, মানুষ একবার সংস্কারভ্রষ্ট হইয়া কুপথে চলিলে তাহাকে নীতির বশ্যতা মানানো অসাধ্য হইয়া পড়িবে। অবশেষে হতাশ হইয়া সে দৈবকৃপার উপর নির্ভর করিয়াছিল ; ভাবিয়াছিল, ভবিষ্যতে একটি শুভদিন আসিবে যখন সে দেখিবে, তাহার শক্তিমান স্বামী সত্যই দুর্বলতা জয় করিয়াছেন। শুভদিনটি কি ভাবে আসিয়াছিল, তাহা গল্পের গোড়াতেই বলা হইয়া গিয়াছে।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বৎসরাধিক কাল কাটিয়া গিয়াছে। নানা দেশে লোক পাঠাইয়া এবং প্রাইভেট ডিটেকটিভের পিছনে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াও লাবণ্য নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধান পায় নাই।

ইতিমধ্যে অভিভাবকশূন্য লাবণ্যের গৃহে পুরুষ বন্ধুদের গতায়াত ঘন ঘন হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছিল, যাহা অনেক সময় দৃষ্টিকটু হইলেও ভদ্রতার খাতিরে লাবণ্য অসমর্থন করে নাই। ক্রমে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলনে ভদ্রাচার এমন একটি ঘটনা ঘটাইয়া দিল, যাহার জন্য লাবণ্যকে পুনরায় আইনের আশ্রয় লইতে হইল। এবার আইন বন্ধনের সহায়তা করিল। রঞ্জনের সহিত লাবণ্যের রেজেস্টারি করিয়া বিবাহ হইয়া গেল।

রঞ্জন যখন লাবণ্যকে দিদি বলিয়া ডাকিত, তখন লাবণ্য ভাবিতে পারে নাই, পাতানো সম্বন্ধটি একদিন ভিন্নভাবে পাকা হইয়া যাইবে। তাহার রূপের যে প্রকারেরই আকর্ষণ থাকুক না কেন, সে জানিত, কুঅভিপ্রায় সহ দৈহিক সান্নিধ্য-লিপ্সা কোন পুরুষের সফল হইবে না, কারণ সে তাহার শুচিতার জাগ্রত সান্ত্রীকে বিশ্বাস করিত।

পুরুষ বন্ধুদের ভিতর রঞ্জনই সর্বাপেক্ষা আজ্ঞাবাহী হইয়া উঠিয়াছিল। হগমার্কেটে বাজার করা, একসঙ্গে সিনেমায় যাওয়া, ইত্যাদি ব্যাপারে লাবণ্য রঞ্জনের সহায়তা ও সাহচর্যের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিত। রঞ্জনের সর্বদা-তটস্থ ভাবের ভিতর লাবণ্য কোনরূপ জটিলতা খুঁজিয়া পায় নাই।

রঞ্জন লাবণ্য অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট ; তাহা ছাড়া তাহার ধারণা জন্মাইয়াছিল, সে তাহাকে বড় ভগিনীর মত করিয়াই দেখে, তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকে। ডাকের আড়ালে সন্দেহ করিবার কিছু থাকিতে পারে ইহা ভাবিতেও লাবণ্যের কুণ্ঠা আসিত, কিন্তু যে প্রচণ্ড শক্তি সকল সংস্কারকে এক মুহূর্তে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে, সৃষ্টির সেই আদি প্রেরণা প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম অনুসারে নিশ্চিন্ত থাকে নাই—সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

সেদিন সিনেমায় উভয়ে অভ্যাসমত পাশাপাশি বসিয়া ছিল, দর্শকের ভিড় ছিল না। হঠাৎ বৈদ্যুতিক আলোর কল বিগড়াইয়া গেল—অনেকক্ষণের জন্য। সিনেমার দৃশ্যপট হইতে দৃষ্টি অপসৃত হইলেও মন বেকার বসিয়া

থাকে নাই, দৃশ্যপটে কামোন্মত্ত চুম্বনের দৃশ্যটি উভয়ের মনে পৈশাচিক প্রভাব বিস্তার করিতেছিল—যাহা একটি অবাঞ্ছনীয় সুযোগ আনিয়া দিল—সুযোগটি গাঢ় অন্ধকার ও নিরিবিলি কোণ। লাবণ্য ও রঞ্জন ছাড়া একটি মানুষও সেখানে নাই। সুযোগ যথাসময়ে লাবণ্যের অজ্ঞাতে উভয়ের মাঝে দৈহিক ব্যবধান ও মানসিক সঙ্কোচ সরাইয়া দিল। দীর্ঘকাল পরে অকস্মাৎ লাবণ্যের সুপ্ত ও শাসিত আবেগ সচেতন ও সবল হইয়া উঠিল, লাবণ্য নারী হইয়া পুরুষের নিকট ধরা দিল ; ক্ষণিকের উত্তেজনা এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার গতি লাবণ্যের জাগ্রত প্রহরী রোধ করিতে পারে নাই। লাবণ্য যখন বুঝিল, ভ্রাতা-ভগিনীর সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তখন সেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল রঞ্জনকে বিবাহ করিয়া।

রঞ্জন অতি-আধুনিক ধরনের মানুষ, ঘোরতর পাশ্চাত্যপন্থী, এই কারণে লাবণ্য বহুবার তাহাকে smart বলিয়াছে এবং স্বামীকেও তাহা শুনাইয়াছিল। স্বামী কিন্তু কখনও দর্জীর তৈয়ারী smart হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি ছিলেন ভিন্নমতাবলম্বী, পুরাতন দেশী বনিয়াদী চালে দীক্ষিত, রসের রাজা—উচ্চ অঙ্গের সংগীত ও সাহিত্যের চর্চায় সময় কাটানোই ছিল তাঁহার খেয়াল। দিলখোলা এবং বেপরোয়া ধরনের মানুষ। তাঁহার উগ্র রকমের খামখেয়ালি কেহ সমর্থন না করিলে বলিতেন, go to hell, you philistine—তিনি এইটুকু বুঝিয়াছিলেন, খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি জন্মিয়াছেন। তবে অপরে যে যাহাই বলুক, তাঁহার খেয়ালের অত্যাচারে কেহ কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। বড় বড় সাহেবী হোটেলেও পরিচ্ছদ ও আচরণ সম্বন্ধে নিজের খেয়ালে চলিতেন, ইহা লইয়া স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে তর্ক হইতে বচসা পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্বামী নিজের চাল বদলান নাই।

অপর দিকে রঞ্জন সাহেবী চালে টিকিয়া যাইবার চেষ্টা করিলে উক্ত প্রথায় বাঁচিয়া থাকাটা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হয় নাই ; অথচ লাবণ্যের রুচি অনুসারে smart হইতে হইলে ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ছাড়া উপায় ছিল না। সুপারিশের জোরে যে চাকরি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার মাহিনার দ্বারা কোন প্রকারেই বাবুগিরি করা চলে না। উপায়ান্তর না থাকায়

ঘৃতং পিবেৎ প্রবাদ-বাক্যটি দার্শনিক সত্য মনে করিত। সুতরাং ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছিল ; তাহা লাবণ্যের নিকটও গোপন থাকে নাই। ফলে নূতন স্বামীর ঋণ পুরাতন স্বামীর অর্থে শোধ হইতে লাগিল।

রঞ্জন ইহা জানিত, জানিয়াও না জানার ভান পুরাপুরি বজায় রাখিয়াছিল। এই কারণে তাহাকে পোষা মেষশাবকের ন্যায় লাবণ্যের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। নববিবাহিতা স্ত্রীকে তুষ্ট করিতে পারিলেই তাহার জীবন সার্থক হইবে—এই ভাবটি দেখানো তাহার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল, কারণ লাবণ্য তো শুধু স্ত্রী নয়, প্রভুস্থানীয়াও বটে।

বিবাহের পর দুই-তিন মাস এই ভাবে কাটিয়াছিল। রঞ্জন ইতিমধ্যে বুঝিয়া ফেলিয়াছিল, ঋণ করিতে 'কিন্তু' বোধ করিবার কিছু নাই।

লাবণ্যের রূপের জলুস থাকিলে কি হইবে, সত্যই তাহার বয়স হইয়াছিল। প্রসাধনের ঠেকনা দিয়া আর যৌবনকে ধরিয়া রাখা যায় না। কালের ক্রিয়া যে লাবণ্যকে শৈথিল্যের দিকে টানিতেছিল, তাহা স্বামী-স্ত্রীর নিকট নানা ঘটনায় ধরা পড়িয়া যাইতেছিল।

ইতিমধ্যে রঞ্জন দেশী ও বিলাতী দোআঁশলা শৌখিনতাগুলি পুরাপুরি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় সুরা ও তদুপযুক্ত যাবতীয় আনুষঙ্গিক প্রকরণের যোগাযোগ না ঘটিলে তাহার দিন কাটে না—ভাগ্যচক্র লাবণ্যকে দুঃখের ঘোরালো বেড়ে ঘিরিতেছিল। সে ধারণা করিতে পারে নাই, কেমন করিয়া একটি ভদ্রসন্তান স্ত্রীর অর্থ লইয়া এই ভাবে উচ্ছৃঙ্খলতায় নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারে। সে নিজেকেই এ বিষয়ে কতকটা দোষী সাব্যস্ত করিল, কারণ আর্থিক সচ্ছলতার সুবিধা না থাকিলে রঞ্জন এতটা অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে পারিত না। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সব রকম শৌখিনতা পূর্ণ করিলে স্বামী ঘরে আটক পড়িতে পারে, কিন্তু ঘটিল ঠিক বিপরীত। এক দিকে লাবণ্য যতই যৌবনোন্মত্ত স্বামীকে বশে আনিবার জন্য খরচ সম্বন্ধে উদার হইতে থাকে, ততই স্বামী গতযৌবনা স্ত্রীর সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিবার জন্য নানা অজুহাত খুঁজিয়া বাহির করে। ক্রমে অজুহাতের প্রয়োজনীয়তা উঠিয়া গেল, প্রকাশ্যেই ব্যভিচারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। বাহিরে যে সব ঘটনা ঘটিত, তাহা প্রকাশ্যে লাবণ্যের নিকট কেহ না বলিলেও

তীক্ষ্ন বুদ্ধির দ্বারা সে সবই বুঝিত। এই ভাবে ভোগের মাত্রা যখন চরমে গিয়া উঠিল, তখন দুর্বলদেহ রঞ্জন তাহা সহ্য করিতে পারিল না, যকৃতের রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল।

চিকিৎসা ও সেবার দ্বারা রোগের সঙ্কট অবস্থা কাটিয়া গেলে চিকিৎসক হাওয়া বদলের পরামর্শ দিলেন।

লাবণ্য দেশ ঘুরিতে ভালবাসিত, সেই কারণে নানা স্থান ঘুরিয়া বারাণসীর নিকটেই খোলা জায়গায় একটি বাড়ি লইয়া কিছু দিন হইতে বসবাস করিতেছে। এখান হইতে প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান ও বিশ্বেশ্বর দর্শনের সুবিধা ছিল, মোটরে মিনিট পনেরোর রাস্তা।

যে ঘাটে লাবণ্য স্নান করিত, সেখানে স্নানার্থীদের ভিড় কম থাকিলেও উহা শ্মাশানের পাশেই। দৃশ্যটি তাহার মন দমাইয়া দিত, সেই কারণে একদিন ঘাট পরিবর্তন করিয়া ফেলিল।

মণিকর্ণিকার ঘাট। লাবণ্য স্নানান্তে লালপেড়ে পট্টবস্ত্র পরিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ শুনিল যোঁধপুরী সুরে অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর ; উপর দিকে তাকাইয়া দেখিল, ঘাটের চাতালে নরনারীর ভিড় জমিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির ধাপগুলি উঠিয়া আসিবার সময় পুরাতন দরোয়ান লাবণ্যের আগে আগে ভিখারীর ভিড় সরাইয়া দিতেছিল। উপরে গায়কের কণ্ঠ হইতে যে সুর ধ্বনিত হইতেছিল, তাহা দরোয়ানেরও পরিচিত ঘুম-ভাঙানী গান। দরোয়ান কি ভাবিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর হুকুম চাহিল গায়ককে দেখিয়া আসিবার জন্য। লাবণ্যের তখন চক্ষু দুইটি ছলছল করিতেছে। বলিল, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। জনতার নিকট আসিয়া দরোয়ান লাবণ্যের জন্য রাস্তা করিয়া দিল। লাবণ্য দেখিল, ভোগের রাজা ত্যাগীর জ্যোতির্ময় রূপে চক্ষুমুদ্রিত অবস্থায় সুর-পরমব্রহ্মের সাধনায় আত্মহারা হইয়া আছেন। সামনে গেরুয়া চাদর পাতা, সুর-শ্রোতার দল ক্ষমতানুসারে যে যাহা পারিতেছে সে তাহাই বিস্তৃত চাদরের উপর ফেলিয়া দিতেছে। সিকি দোয়ানি আধুলি পয়সায় চাদর ভরিয়া গিয়াছে।

কেহ বলিতেছে, আঃ, বাবার আজ দর্শন পেলাম। কেহ বলিতেছে, দয়াল বাবার কৃপায় আজ আমাদের আহারের সংস্থান হইবে। কেহ বলিতেছে, আহা,

বাবা সিদ্ধপুরুষ, শুধু গান গাহিয়া ভক্তদের টানিয়া আনেন।

লাবণ্য দেখিল, জ্যোতির্ময় সিদ্ধপুরুষ তাহার জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী। সংযমের সব শক্তি সে হারাইয়া ফেলিতেছিল, শরীর তাহার টলিতেছিল। কোন প্রকারে গলবস্ত্র হইয়া স্বামীর পদতলে নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য সাষ্টাঙ্গে মাটির উপর উবুড় হইয়া পড়িল; তখন তাহার চেতনা লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, তথাপি সর্বশক্তি দ্বারা দেহটাকে টানিয়া স্বামীর শ্রীচরণ স্পর্শ করিল।

সুরে সমাধিস্থ স্বামী চক্ষু উন্মীলিত করিলেন—দেখিলেন, যাহাকে তিনি সহধর্মিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার নিকট আজ তিনি পরিত্যক্ত নহেন। সিদ্ধপুরুষের চিত্তচঞ্চলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল, ডাগর চক্ষু দুইটি অশ্রুবিন্দুতে ভরিয়া উঠিল। ত্যাগী নিজের দুর্বলতা অনুভব করিতেই লাবণ্যের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন, তাহার পর একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলেন, পরক্ষণেই জনতার ভিতর মিশিয়া গেলেন। স্বামীর দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তপ্ত হাওয়ার অনুভূতি লাবণ্য পায় নাই—তখন তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে। এই ঘটনার পর সাধু-বাবাকে আর বারাণসীতে দেখা যায় নাই।

প্রতীক্ষা

দীর্ঘকাল পরে রমেশের ঘরে ক্রেতার পদধূলি পড়িবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। এলোমেলো জিনিসগুলি সরাইয়া স্থানটি সুদৃশ্য করিতে সে ঘর্মাক্ত-কলেবর হইয়া উঠিয়াছে।

বাতিলের মধ্যে ফেলিবার জিনিস তো একটিও নয়। চিঠির ছিন্নাংশ, অব্যবহার্য তুলির গোছা, পরিত্যক্ত ছবির খসড়া, ভাঙা ফ্রেমের টুকরা, নিঃশেষিত রঙের চ্যাপটা টিউব; আরও কত কি! চিঠির ছিন্নাংশগুলি জোড়া লাগাইতে পারিলে দেখা যাইত, অধিকাংশই মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকের নিকট হইতে পাওয়া। ছবি ছাপানোর অক্ষমতা জানাইয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।

সম্পাদকেরা এইরূপ দুঃখপ্রকাশের জন্য চিঠি ছাপাইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকেন, কারণ প্রতিদিনই তাঁহাদের ফরমায় ফেলা দুঃখপ্রকাশ না করিয়া উপায় নাই।

সারাটা সকাল কাটিয়া গেল, ঘর গুছানো আর শেষ হয় না। ইহার ভিতর এক মিনিটও বিশ্রাম করিবার অবকাশ পায় নাই। বেলা বাড়িয়া আসিতেছে, জঠরাগ্নিও ধূম করিয়া জ্বলিতে শুরু করিয়াছে। শূন্য পাকস্থলীর সশব্দে আত্মনিবেদন চামড়ার আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। রমেশ এতটা অসুবিধায় পড়িত না, যদি না বাতিলের মধ্যে যাহা ফেলিতেছিল তাহা পুনরায় পরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করিত। যেমন, তুলিগুলি সব ভোঁতা হইয়া গেলেও একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়ার প্রয়োজন ছিল, কি জানি, দুই-একটি কাজ চালানোর মত থাকিয়াও যাইতে পারে। রঙের টিউব বাহিরে চ্যাপটা দেখাইলে কি হইবে, হয়তো কোনটার ভিতর রং এখনও রহিয়া গিয়াছে, সুতরাং টিপিয়া দেখিতে হইতেছিল। ছেঁড়া চিঠির ভিতর হয়তো অন্যমনস্কতায় আশ্বাস-বাণীযুক্ত চিঠিটাই ফেলিয়া দিয়া থাকিবে। এই সেদিনই তো অন্যমনস্কতায় পুরা একটি পাঁচ টাকার নোট ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। যে দুই-একটি চিঠি জোড়া লাগানো সম্ভব হইয়াছিল, তাহা

পড়িয়া পুলকিত হইয়া উঠিবার মত কিছু পায় নাই।

যে ঘরটিতে রমেশ বাস করে, তাহার দৈর্ঘ মাত্র দশ ফুট ছয় ইঞ্চি, ইহারই ভিতর ছয় ফিট লম্বা তক্তাপোশকে স্থান দিতে হইয়াছে। উহা বাহির করিবারও উপায় নাই, কারণ ঘরের বাহিরে যেটুকু স্থান সে আইনত ব্যবহার করিতে পারে, তাহা একটি আড়াই হাত চওড়া ও চার হাত লম্বা বারান্দা—যাহা উপস্থিত ভাঁড়ারঘর এবং হেঁসেল হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। সকাল হইতে যাহা কিছু বাতিল সবই এই স্বল্প পরিধির ভিতর জড় হইতেছে। একে স্থানাভাব, তাহার উপর ঘোর অন্ধকার; কারণ পিছন দিক হইতে চোর আসিবার ভয়ে প্যাকিং বাক্সের কাঠ সংগ্রহ করিয়া চোরের দুষ্ট অভিপ্রায়-সিদ্ধির বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে আলো আসার পথটিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উপরের ছোট্ট ঘুলঘুলি দিয়া যেটুকু রৌদ্ররশ্মি দেওয়ালে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, তাহা চোরের দৃষ্টির মতই ত্রস্ত উঁকি।

স্থানটি ব্যবহার করিতে হইলে দৃষ্টি অপেক্ষা অনুভূতির উপর বেশি নির্ভর করিতে হয়। ওখানে তক্তাপোশের বিরাটাকৃতির স্থান নাই। অথচ যেখানে তাহার চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইতেছে, সেখানে নীরস দারুময় শয্যাটি অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। একটু নড়িয়া-চড়িয়া ছবি না দেখিলে রঙের খেলা দর্শক বুঝিবে কেমন করিয়া? ঘরের ভিতর তক্তাপোশের অস্তিত্ব রমেশকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল। ইহাকে লইয়া এখন করে কি? ঘুণ-ধরা বলিয়াই নিলামে সস্তায় ক্রয় করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সস্তার জিনিস বলিয়া তো পরিত্যাগ করা চলে না। উহা রমেশের অবশ্য-প্রয়োজনীয় বস্তু,—দোতলার কাজ করিয়া থাকে। তক্তাপোশের তলায় সে রাখে না কোন্ জিনিস? তাহা ছাড়া, ইহা প্যালেট-হিসাবেও (তৈলচিত্রের রং মিশাইবার পাতলা কাঠ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেহগিনি কাঠের প্যালেট কিনিবার মত আর্থিক সচ্ছলতা রমেশের নাই, সেই কারণে আঁকিবার সুযোগ পাইলে বিছানা সরাইয়া রমেশ এই তক্তাপোশের উপরই রং গুলিয়া থাকে। বিছানা বলিতে একটি মাদুর ও একটি ক্ষুদ্রাকার বালিশ। মাদুরের এক দিকে সামান্য রং লাগিলে আতঙ্কিত হইয়া উঠিবার কিছু নাই। তবে কাঠের উপর যেখানে সে রং মিশাইয়াছিল, তাহা যতই শিল্পীর আবেগের প্রামাণ্য হউক না কেন—

বাহিরের দর্শকের নিকট কুদৃশ্য হইবে। এই কুৎসিত ছাপ গোপন করা যায় কেমন করিয়া? বিপদে বুদ্ধি মস্ত বড় সহায়—তক্তাপোশটা খাড়া করিয়া দাঁড় করাইল। তাহার পর তোবড়ান তালাহীন সুট্‌কেসটি খুলিয়া ফেলিল। দুই-একটি ধোপ-দুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি ও একটি খদ্দরের মোটা চাদর, ইহা ছাড়া গোটাকয়েক বিলাতী টিকিট মারা চিঠি ও প্রাপ্তিসংবাদের রসিদ।

খদ্দরের চাদরখানি খুলিয়া তক্তাপোশের নিকটে গেল, দৈর্ঘ্য প্রস্থে মাপ লইয়া দেখিল, কাষ্ঠশয্যার জীর্ণতা ঢাকা চলে যদি চারিটি ছোট পেরেক সংগ্রহ করা যায়।

প্রথমেই দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি পড়িল—পেরেক আছে বটে, তবে উহা অতি বৃহৎ এবং জামা-কাপড় টাঙাইবার একমাত্র অবলম্বন, তাহা ছাড়া অত বড় পেরেক তুলিতে হইলে কাঁটা-তোলা উপযুক্ত হাতুড়ির দরকার। এখন হাতুড়ি পাইবে কোথা হইতে? ইটের সাহায্যে এপাশে ওপাশে ঘা মারিয়া দেয়াল নরম করিয়া তুলিবার উপায় নাই। ঠিক উপরের ঘরে বাড়িওয়ালা বাস করে। পেরেক পুঁতিবার সময় যে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহারই পুনরাবৃত্তি হইবে তুলিবার সময়। দেওয়ালে সামান্য শব্দ হইলেই বুড়ার খাড়া কান ঠিক শুনিয়া ফেলিবে, তাহার পর—যাক, সব খুঁটিনাটি লিখিয়া লাভ নাই।

দেখিতে দেখিতে দ্বিপ্রহর কাটিয়া গিয়াছে। রমেশ এখন আর ক্ষুধার তীব্র তাড়না অনুভব করিতেছে না, কিন্তু তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে তৃষ্ণা নিবারণ করিবারও সময় নাই; জলের জন্য প্রতিবারই তাহাকে হেঁসেলে ঢুকিতে হইবে—ওখানে ঢোকা এবং বাহির হওয়া শুধু কষ্টসাধ্য নয়, সময়-সাপেক্ষও বটে। এদিকে সময় দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে,—মহাশয় ব্যক্তি আসিবার পূর্বে নিজেরও পরিষ্কার হওয়া দরকার। কলতলায় গেলে কতক্ষণ তাহার পালার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। রমেশ যে দরের ভাড়াটিয়া, তাহাতে নিজের জন্য আলাদা কল দাবি করিবার অধিকার নাই। ঠিক এই সময়টিতেই আবার অন্য ভাড়াটেদের ঝি-বউরা ঘোমটা দিয়া কলসী কাঁখে জল লইতে আসে, তাহাদের অনুরোধ করিয়া নিজের তাড়া সম্বন্ধে

বলিলেই ঘোমটার আড়ালে নিজেদের ভিতর ফিসফাস আরম্ভ হইয়া যাইবে এবং অল্প সময়ের ভিতর তুমুল কাণ্ড বাধিয়া উঠিবে। যাহা হউক, এখন সর্বাগ্রে চারিটি পেরেক খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। রমেশ হেঁসেলে ঢুকিয়া যথাসম্ভব দ্রুত একটি আকণ্ঠ-জঞ্জালপূর্ণ ঝুড়ি বাহির করিয়া প্রদর্শনী-গৃহের মাঝখানে তাহা উল্টাইয়া দিল, পেরেকের সন্ধান শুরু হইল। রমেশ মেঝের উপর উবুড় হইয়া খুঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। যতই বাতিলকে বাধার বাহিরে ঠেলিয়া দেয়, ততই বাতিল হইতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু বাহির হইয়া আসিতে থাকে। প্রথমেই হাতে ঠেকিল একটি পাতলা খাতা। তুলির টানে মোটা কালো কালিতে লেখা আছে—“সমালোচকের শাসন”, তাহারই লেখা একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ, কোন একটি সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য লিখিতেছিল—ঘর পরিষ্কারের ব্যস্ততায় কখন জঞ্জালের ভিতর নিজেই ফেলিয়া দিয়াছে। লেখাটি যত্নের সহিত আলাদা করিয়া রাখিল। ইহার পরেই মোচড়ানো অবস্থায় একটি ছবি আঁকিবার কাগজ দেখিল। ছবি আঁকার দামী কাগজের এই অবস্থা? খুলিয়া দেখে—‘দ্বন্দ্ব’ ছবির খসড়া। আট বৎসর ধরিয়া এই ছবির পরিকল্পনা নানা রূপ লইয়া রমেশের পিছনে ঘুরিতেছে, কত খসড়াই না সে আঁকিয়াছে, কোনটি পছন্দসই হয় নাই, ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। এই খসড়াটাই তাহার কতকটা মনঃপূত হইয়াছিল, তাহাই কিনা দুমড়াইয়া জঞ্জালের ভিতর ফেলিয়াছে! সাধ্যমত খসড়াটি পাতিয়া সোজা করিল। হোয়াটম্যান কাগজ, হাতে তৈয়ারি—অপমান সহ্য করা তাহার কাজ নয়, যে ভাবে দুমড়াইয়া ছিল সেই ভাবে পাটের খাঁজগুলি গেল। রমেশ বারম্বার ছবির খসড়াটি দেখিতে লাগিল—দাঁড়াইয়া, বসিয়া, দূরে রাখিয়া, কাছে আনিয়া ; হিজিবিজি খসড়াতেই দেখিতেছিল ছবির পূর্ণ রূপ—রঙে ও রেখায়। রমেশ এখন ছবি আঁকিয়া জীবিকা উপার্জন করে না, সে গামছা বেচে পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করিয়া। গামছা বেচা উপজীবিকা হইলে কি হইবে, অন্তরের সুপ্ত শিল্পী খসড়ার প্রেরণায় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

সে ঠিক করিয়া ফেলিল, কালই একেবারে রং দিয়া ছবি আরম্ভ করিয়া দিবে। কলতলায় যাইতে তাহার ভয় আসিলেও চিত্রাঙ্কনে ভয় জিনিষটা সে ভুলিয়াছে। রঙের সামঞ্জস্য ও তুলির টান তাহার ইচ্ছামত হইয়া থাকে।

অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে গঠন খুঁজিয়া বাহির করে না। দৃষ্টি তাহার ওস্তাদ তীরন্দাজের মত প্রখর। যাহা সে দেখে এবং অনুভব করে, তাহা নির্ভুল তুলির টানে বাহির করিয়া আনে। ছবি আঁকিবার পদ্ধতিতে তাহার কোন ফাঁকি নাই। শিক্ষাটা তাহার কড়া শাসনের ভিতর গড়িয়া উঠিয়াছিল, ভাবের দোহাই দিয়া দুর্বলতাকে সে কখনও বড় করিয়া দেখে নাই; সেই কারণেই বোধ হয় আজ তাহার এই অধোগতি। আত্মশক্তির উপর পরম বিশ্বাসই দৈন্যকে টানিয়া আনিয়াছে। ছবির রাজ্যে সে মাথা উঁচু করিয়া চলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই বলিয়া নিজেকে কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছে। প্রতিষ্ঠার ধাপগুলি যখন সে একের পর এক অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল, সেই সময়েই বাধিল গোল—ভিন্নমতাবলম্বী রসিকচূড়ামণিরা জানাইয়া দিলেন, এদেশে অয়েলপেণ্টিং চলিবে না, দেশী অঙ্কন-পদ্ধতির উপর উহা কলঙ্কের ছাপ ফেলিতেছে। রমেশ বিরুদ্ধ মতের ব্যাপক প্রচারকে ইচ্ছা করিলেই শাসন করিতে পারিত। তাহার পাণ্ডিত্যের অস্ত্র যথেষ্ট ধারালো না হইলেও অস্ত্রের ব্যবহার তাহার জানা ছিল, কিন্তু সে প্রতিবাদ করে নাই। রসের রাজ্যে লড়াই তাহার নিকট বীভৎস। ক্রমে সমালোচকের সংখ্যা ও বিরুদ্ধ মত এমন ভাবে বাড়িয়া উঠিল যে, শেষ পর্যন্ত রমেশ ছবি আঁকা ছাড়িয়া গামছা বেচা ধরিল—এই ব্যবসাই এখন তাহার জীবিকা উপার্জনের প্রধান অবলম্বন।

রমেশ খসড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল—রঙিন ছবির আয়তন বিরাট পরিধি লইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, রঙে লাগিয়াছে আগুন যাহার স্ফুলিঙ্গ ক্যান্‌ভাসের বাহিরে ছিটকাইয়া পড়িতেছে, সমালোচকেরা দগ্ধ হইবার ভয়ে ছুটিয়া পুঁথির আড়ালে পলাইতেছে আত্মরক্ষার জন্য। কিন্তু রমেশ কখনও পলাতকের পিছনে যায় নাই, তবে তাহারই সৃষ্টির আগুন এ রকমটা করিতেছে কেন? অন্তর্লোক হইতে অজ্ঞাত জ্ঞানময় বলিয়া দিল—আগুনের ধর্মই পোড়াইয়া দেওয়া, তুমিও একদিন তোমার আগুনেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এখন যে আগুন দিয়া সমালোচককে পোড়াইতেছ, বায়ুর পরিবর্তনে সেই আগুন তোমার দিকে ফিরিবে, তোমাকে পোড়াইয়া দিবে নবযুগের নূতন

সৃষ্টির জন্য। কল্পনা সম্বন্ধে ভাবিও না, শিল্পীর কল্পনা ও তাহার প্রকাশ —মাতার গর্ভধারণের মত। যে অন্তরে জন্ম লইয়াছে, তাহাকে যথাসময়ে বাহিরে আসিতেই হইবে। প্রকৃতির এই চিরন্তন নিয়মকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না। রমেশ নিজের দৈন্যের কথা ভুলিয়াছে, যেখানে ছবি আঁকিবে সেই ঘরের আয়তনের কথা ভুলিয়াছে, সে দেখিতেছে একটি অতি বৃহৎ ছবি যাহার আয়তনকে ছোট করিবার শক্তি তাহার নাই। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই কল্পনা যে আগুন অন্তরে জ্বালাইয়াছিল, তাহাকে বাস্তবের বিকট সত্য এক মুহূর্তে নিষ্প্রভ করিয়া দিল। কল্পনা, ছবি, রং সবই সত্য, কিন্তু ছবি আঁকিবে কিসের উপর? কল্পনাকে বাস্তবে চাক্ষুষ করিতে হইলে ক্যান্‌ভাসের প্রয়োজন সর্বপ্রথম। কিসের বিনিময়ে ক্যান্‌ভাস কিনিবে? হাজার জোড়া গামছার ন্যায্য লাভ পাইলেও ক্যান্‌ভাসের দাম উঠিবে কিনা সন্দেহ।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস রমেশের হৃদয়কে নিষ্পেষিত করিয়া দিল, ভিতরের আগুন নিভিয়া গেল।

রমেশ ভাবিতে বসিল, এমনটি হইল কেন? কেন সে সাধারণকে তুষ্ট করিতে পারে না? ক্রেতার আদেশ সে শিরোধার্য করিয়া লয় না কেন? কেন সমালোচককে শিল্পীর ভাগ্যনিয়ন্তা ভাবিতে পারে না? নিজের মতকে ঐরূপ দৃঢ় না করিলে হয়তো দৈন্যের পীড়নে আজ তাহাকে ছবি আঁকা ছাড়িতে হইত না। অর্থের অনটন তাহার নিকট সহনীয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কল্পনাকে সমাধিস্থ করে কেমন করিয়া? পরক্ষণেই যুক্তি আসিয়া সান্ত্বনা দেয়, মাতারও গর্ভস্রাব হইয়া থাকে।

পুনরায় চিন্তা ঘোরালো হইয়া উঠে—দেশের জন্য সংস্কৃতির দৈন্যের বীভৎস রূপ অনুভব করিয়া ভাবিতে থাকে, ভাগ্যহীন সে একা নয়, মনকে যাহারা রসগ্রাহী করিতে পারে নাই, তাহারা রমেশ অপেক্ষা অধিকতর হতভাগা, তাহারা কৃপার পাত্র। রমেশ বেরসিকদের কৃপার পাত্র মনে করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে ওসব কথা ভাবিতেছে কেন? সময়ের তীব্র স্রোত তাহাকেও যে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে ইহা এতক্ষণ তাহার মনে আসে নাই, পাশের ঘরের ভাড়াটিয়ার ঘড়িতে টং করিয়া আধ ঘণ্টার সঙ্কেত করিল।

শব্দটা রমেশের টনক নড়াইয়া দিল। কি আশ্চর্য! সে চারিটি পেরেকের কথাই ভুলিয়াছে! দেশ জাহান্নমে যাক, এখন নিজের দৈন্যে কিছুটা আবরু আনিতে পারিলেই বাঁচে। চারিটি পেরেক এখন তার ত্রাণকর্তা, পেরেক কোন প্রকারে রমেশ সংগ্রহ করিয়াছে। তক্তাপোশ ঢাকা হইয়া গিয়াছে। তাহার পুরাতন তিনটি ছবিও উপযুক্ত জায়গায় স্থান পাইয়াছে। অনেক দিন বাদে ছবিগুলি দেখিতেছিল, বেশ ভাল লাগিল। তাড়াতাড়ি মেঝেটা আবার ঝাঁট দিয়া নিজের বেশ পরিবর্তন করিয়া ফেলিল। কামিজ পরিয়া দেখে, তাহার লোমশ বক্ষ অনাবৃত অবস্থায় রহিয়াছে। আরে ছ্যাঃ, এইরূপ অবস্থায় মহৎ ব্যক্তির সামনে কি দাঁড়ানো যায়, বিশেষ করিয়া যে ব্যক্তি সাহেবী ধরনে জীবন যাপন করিয়া থাকেন? বোতাম সুদূর অতীতে ব্যবহার করিয়া থাকিলেও এখন সে করে না। যে গায়ের চাদর দিয়া সে সব রকম আবরুর ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে, তাহা আজ ছবির পূজায় আটক পড়িয়াছে; সুতরাং তাহাকে কাপড়ের খুঁট হইতে সুতা বাহির করিয়া বোতাম লাগাইবার ছিদ্র স্থানগুলি বাঁধিয়া ফেলিতে হইল। বক্ষের অনাবৃত কুদৃশ্য স্থানটি ঢাকিল বটে, কিন্তু লাল ফিতা কেমন চক্ষুশূল হইয়া উঠিল—রমেশ উহা অগ্রাহ্য করিল এই ভাবিয়া, হাজার হোক, আমি শিল্পী তো বটে, কত আর সব দিক সামলানো যায়?

এখন সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাহাকে শিক্ষিত ভদ্রসন্তান ভাবিতে কাহারও আর বাধা হইবে না। রাস্তার ধারে তাহার দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে তাহার মনে হইল, ক্রেতা আসিবার সময় পার হইয়া গিয়াছে। ভাবিল, সাহেবী চালের মানুষ শিল্পীকে গুছাইয়া লইবার সময় দিতেছেন। যে কোন মুহূর্তে বিরাট গাড়িটা তাহার দরজার সামনে নিঃশব্দে আসিয়া পড়িতে পারে। চকিতে সামনের দোতলার বারান্দাটা দেখিয়া লইল, সব ঠিক আছে। কলেজে-পড়া হোস্টেলের মেয়েরা প্রশস্ত বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছে। রোল্‌স্‌রয়েসের মালিক সার্‌—, বিশ্ববিখ্যাত কয়লার প্রিন্স, গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার গৃহে ঢুকিতেছেন—যদি কলেজের ফুটফুটে মেয়েদেরই না দেখাইতে পারিল তো শুধু ছবি বেচিয়া লাভ? টাকা তো অল্পবিস্তর সকলেই উপায় করিয়া থাকে, আজ আমি কি ভাবে উপায় করিতেছি মেয়েরা দেখুক।

পাশের বাড়িটা কোন এক বুড়া জমিদার চিকিৎসার দ্বারা বয়স কমাইবার জন্য ভাড়া লইয়াছেন। ভদ্রলোকও এই সময়টিতে তাঁহার বারান্দায় বসিয়া রূপার ফরসি হইতে তামাক খান এবং সুবিধা পাইলেই মেয়েদের একটু আড়চোখে দেখিয়া লইয়া থাকেন। উদ্দেশ্য তেমন জটিল কিছু না—বয়সটা বাস্তবিক কমিতেছে কিনা পরীক্ষা করিয়া লওয়া। কড়া ঔষধের কোন ক্রিয়া যে হয় নাই তাহা নয়, কোন কোন সময় অর্থপূর্ণ নকল কাসির শব্দ শোনা গিয়াছে; ঐ পর্যন্ত। তথাপি ঔষধের ক্রিয়া আশাপ্রদ বলিতে হইবে।

রমেশ ভাবিল, বাপু, তুমি জমিদার মানুষ হইলে কি হইবে, মান্যের দিক দিয়া আমি কাহারও অপেক্ষা কম নই। এখনই দেখিতে পাইবে, আমার বাড়ির সামনে কি একটি ঘটনা ঘটিতে চলিয়াছে। রোল্‌স্‌রয়েস গাড়ি আর সাহেবী ধরনের সার্——কে আমার এ সিঁড়ির ধাপ কয়টি পার হইতে দেখিলে পরশ্রীকাতরতাবশত তখন অন্য দিকে মুখ ঘুরাইও না। কৌতূহলের সঙ্গে একবার অন্তত সন্দেহ করিও, আমি সাধারণ কেহ নই।

সময় যে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেদিকে রমেশের লক্ষ্য ছিল না, কল্পনার স্রোত তাহাকে আত্মতুষ্টিতে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। ওদিকের ত্রিতল বাড়ির কার্নিস হইতে দিনের শেষ আলো ছিটকাইয়া এই সময়টিতে রমেশের ঘরটা একবার মাত্র দিনের আলোয় আলোকিত করিয়া তোলে এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই আলো সরিয়া যায়, প্রত্যহ এই সময়টির জন্য সে অপেক্ষা করে প্রাণ ভরিয়া ঘরের ভিতর দিনের আলোক দেখিবার জন্য। আজ তো সে আলো রমেশ দেখে নাই, তবে কি পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে? রমেশ অস্থির হইয়া উঠিল। রমেশ ভাবিতেছিল, সাহেবী চালে যে মানুষ সর্বক্ষণ বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে, সে কি কখনও সময় ভুল করিতে পারে, সময় যে উহাদের কাছে ধর্ম অর্থ সব। ভাবিল, পাশের ঘরের ভাড়াটিয়াকে জিজ্ঞাসা করে কয়টা বাজিয়াছে, কিন্তু লোকটা মদ্যপ। ভাড়াটিয়ার অনুপস্থিতিতে যে স্ত্রীলোকটি পাশের ঘরে বাস করেন, তিনি পূর্ণ যুবতী—সর্বদেহে যৌবনের আভরণে ভূষিতা হইয়াছেন, তাঁহার সহিত কথা বলা তো দূরের কথা, সব রকম চারিত্রিক আদর্শের আড়াল হইতে একটু দেখিয়া লইবারও উপায় নাই। কেহ বলে, তৃতীয় পক্ষ; কেহ বলে, ও কেমনতর। সেই কারণে তৃতীয় পক্ষ অথবা কেমনতরের চরিত্র ঠিক

রাখিবার জন্য মদ্যপ মালিককে কিঞ্চিৎ সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হয়। এরূপ অবস্থায় কয়টা বাজিয়াছে জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই।

রমেশ মেয়েদের হোস্টেলের বারান্দার দিকে তাকাইল, বাসন্তী রঙের শাড়িটা এখন দেখা যাইতেছে না, অর্থাৎ যিনি বাসন্তী রঙের শাড়ি পরিয়া বারান্দায় হাওয়া খাইতে আসেন তাঁহার বারান্দায় আসিবার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে—যাহা ঘড়ির কাঁটার সহিত প্রায় মিল রাখিয়া চলে। তবে কি বাসন্তী শাড়ি বারান্দার বাহিরে হাওয়া খাইতে গিয়াছে? রমেশের ঘড়ি নাই, সে রৌদ্রের আলো-ছায়া, হোস্টেলের বিভিন্ন রঙের চলন্ত শাড়ি এবং কলের জল আসা দেখিয়া সময় ঠিক করিয়া থাকে—আজ যেন সব কিছুই গোলমাল লাগিতেছে।

ক্রমে বৈকালের আলো নিঃশেষিত হইয়া আসিল, সন্ধ্যার আবহাওয়ায় শহর মজিয়া উঠিতেছিল।

এমনই একটি সময় গলির মোড়ে গম্ভীর বোয়া হর্নের শব্দ শোনা গেল। রোল্‌স্‌ নিঃশব্দে মোড় ফিরিল এবং অতি অল্প সময়ের ভিতর রমেশের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রমেশের হৃৎকম্পন শুরু হইয়াছে। লক্ষ-পতিকে সে কি ভাবে অভ্যর্থনা করিবে? নমস্কার করিলে সাহেবী চালের মানুষ চটিয়া যাইতে পারে। ঠিক করিল, খাঁটি টেঁসি কায়দায় করমর্দন করিবে। নাঃ! তাও কি সম্ভব? অতবড় মানুষের সহিত হাত মিলানো যায়? আর ভাবিবার সময় নাই। ত্রস্তে সিঁড়ির ধাপ কয়টি পার হইয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল। বলিতে চাহিয়াছিল, সার্‌, নামুন। কিন্তু দেখিল লক্ষপতি একলা আসেন নাই। সঙ্গে আসিয়াছেন চলন্ত-ছবির বিখ্যাত অভিনেত্রী।

রমেশ একটু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। ইতিমধ্যে নিজের অজ্ঞাতে সে কখন গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়াছে। লক্ষপতি সেদিকে দৃকপাত না করিয়া বলিলেন, একটু দেরি হয়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না। আজ আর নামতে পারছি না। তবে আমায় দোষ দিতে পারবেন না, আমি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ঠিক রেখেছি। আমাদের ক্লাবে এঁর সম্মানার্থে একটি পার্টি দেওয়া হচ্ছে। এখুনি যেতে হয়। আচ্ছা, আজ তা হ'লে আসি। তারপর কি ভাবিয়া তিনি

বলিলেন, ও! একটা দরকারী কথা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম। বিলেতে আপনার ছবির খুব ভাল সমালোচনা বেরিয়েছে। সেই কারণেই ক্লাবের কমিটি-মিটিং-এ আপনাকে ফোর আর্টস ক্লাবের মেম্বার করা হবে ঠিক করা হয়েছে। এটা একটা মস্ত বড় সম্মান। আজ তা হ'লে আসি, বড্ড তাড়া—

বক্তব্য শেষ করিয়া নিজেই জোরে নিঃশব্দ রোল্‌স্‌-এর দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিলেন। দরজা বন্ধের শব্দের যে প্রতিধ্বনি রমেশের হৃদয়কে নাড়া দিয়াছিল, তাহা কোন্ সুরের তরঙ্গ তুলিয়াছিল লিখিব না।

রোল্‌স্‌ যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, সেইরূপ নিঃশব্দে চলিয়া গেল। রমেশ যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িল না। ঘরের দিকে তাকাইয়া দেখিল, ভিতরে তখন অন্ধকার গাঢ়ভাবে জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। সাদা চাদরে মোড়া তক্তাপোশ ও তাহারই উপর তিনটি ছবির অস্পষ্ট আকার দেখা যায়। আর দেখা যায়, মেঝের উপর রাশিকৃত ছবির বাণ্ডিল—রমেশের সারাটা জীবনের কর্মফল।

ঘৃতভোম্

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। আমরা জানালা খুলিয়া বসিয়া আছি রাস্তার ধারের ঘরে।

আড্ডা জমিয়া উঠিতেছিল; উঠিবারই কথা। কারণ ছিল যথেষ্ট। একে বাদলা, তাহার উপর রংদার তরলের সহিত নিকট সম্বন্ধ। সকলেই রঙিন হইয়া উঠিয়াছিল। পাকাইবার জন্য অনুষ্ঠানগুলি ভালই ছিল—ন্যান্‌কিং-এর চিংড়ির কাট্‌লেট ও ফার্‌পোর মাটন চপ, ফরাশের মধ্যস্থলে ট্রের উপর সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল।

স্ব স্ব রুচি হিসাবে অভ্যাগতদের আঙুলগুলি ডক-ইয়ার্ডের ক্রেনের মত উপযুক্ত ভক্ষ্য তুলিয়া লইতেছিল। ট্রে এখনও খালি হয় নাই।

অকস্মাৎ দরজার পাশে শোনা গেল "ঘৃতভোম্"—ছট্টুদা আসিয়াছেন, এহেন মানুষটির জন্যই যেন আমরা সকলে অপেক্ষা করিতেছিলাম। সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। ইতিপূর্বে ললিতকলায় আধ্যাত্মিক ও তামসিক রসের তুলনা-মূলক দারুণ আলোচনা চলিতেছিল।

কবিতার ছন্দ, চিত্রাঙ্কনে নব বিধান, সঙ্গীতে ছ্যাঁচড় জাতীয় গজলী কীর্তন ও ভাস্কর্যে মোমবাতির পালিশের পরিকল্পনার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে নানা মতভেদ আসিয়া পড়িয়াছিল। ফিলিস্টাইনদের রসবোধ কখনও আসিবে না, তথাপি আমরা তাহাদের বীভৎসতা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য মস্তিষ্ককে মন্থন করিয়া নাজেহাল হইয়া যাইতেছিলাম। ঠিক এই সময় ছট্টুদা ঘরে ঢুকিলেন। বয়স তাঁহার চিরকালই তেত্রিশ, কখনও বাড়ে নাই, কখনও কমিবে না। চেহারাটা আয়েশ-বিলাসীদের মত। তিন-চারিটি তাকিয়া সরাইবার পর তাঁহার বসিবার স্থান হইল। তর্ক চলিতেছিল—কবি অথবা সাহিত্যিকদের কল্পনার দৌড় বাস্তব হইতে কতটা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। একজন বলিলেন, দেখ না, আজকাল একটা ফ্যাশান উঠেছে—যক্ষ্মা-রোগীদের নায়ক-নায়িকা করা। ট্র্যাজেডি লিখতে হ'লে হাসপাতাল ভিন্ন প্লট পাওয়া যায় না। শনির বার্তা-বাহকের তাড়া খেয়ে যদি বা তারা হাসপাতাল ছাড়ল তো এল বালিগঞ্জের

রোড, লেক, ক্যাসানোভা ইত্যাদি ইত্যাদি। নায়িকাদের নামও গেল বদলে। লিলি, ফিপি, সিসি, ডলি, বেবি হ'ল সব গল্পের মডেল।...আরে বাপু, থাকিস তো তুই কাঁকুড়গাছির শেষ সীমানায়, কর্পোরেশনের ময়লা-ফেলা গাড়ির পাশে। গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলায় ভিজে ছেঁড়া গামছা গায়ে চাপিয়ে গোবর-নিকুনো ছোট্ট রোয়াকটাতে পুরনো মাদুরটায় শোওয়া তোর অভ্যেস। তুই জানলি কেমন ক'রে ফিপি, সিসি, ডলির ঘরের কথা?...রোল্স্রয়েস কিংবা মিনার্ভা গাড়িতে যখন জোড়ে ওঠে, তখন তো তুই গামছা প'রে রাস্তার ধারের কলতলায় স্নানের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকিস। মানলুম না হয়, খানিকটা ধেনো পেটে পড়লে সাহিত্য-চর্চার খোঁচাটা খেতে হয়। ধেনোর এমন কি গুণ যে ওদের সঙ্গে না মিশেই সব খবর তুই রাখবি? আর একজন উত্তর করিল, তোমার কথাটা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। হাতে কলমে অভিজ্ঞতা না থাকলে কল্পনাকে যতই চাবুক মার না কেন, তার দৌড় একটি বিশিষ্ট স্থানের বাইরে যেতে পারে না। তা যাই হোক, বাস্তবকে যদি মানতে চাও এবং জমাট রসের খবর যদি পেতে চাও, ধর ছট্টুদাকে। উনি হচ্ছেন রসের রাজা। শুনলেই তো, ঘরে ঢোকবার আগেই বললেন ঘৃতভোম্। কথাটার কোন অর্থ নেই। কিন্তু ঐ সঙ্কেত যদি বিশ্লেষণ করতে যাও, তা হ'লে রোমান্সের একটি বৃহৎ এন্সাইক্লোপীডিয়া বার হয়ে পড়বে।

সেই কবে তেত্রিশ বছর বয়েস হয়েছিল, আজও তাকে আঁকড়ে ধ'রে আছেন—ছট্টুদা তা হ'লে একটা শুরু করুন।

ছট্টুদা পাশের তাকিয়া কোলের উপর টানিয়া একটু আরামী কায়দায় বসিলেন। তাহার পর হুইস্কিপূর্ণ পাত্রটিতে সরবতী চুমুক মারিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন আমার বয়েস তেত্রিশ। চেহারাটি রইসের মত। আরে বাপু চোখ মার কেন? গল্পের নায়ক যখন আমি নিজে, তখন আত্মপ্রশংসায় দোষ কি আছে শুনি? তোমরা গল্প লেখার আগেই নায়ক সম্বন্ধে চার পাতা লিখতে না পারলে অসুবিধায় পড়ে যাও। এখন একটা খাঁটি রোমান্সের কথা বলি শোন।—

বড়বাজারের পুরোনো বাড়িটায় তখন আমরা থাকি। শরীর ও মনে বয়সদোষ লেগেছিল। বাবা ছিলেন এদিক দিয়ে পাকা ওঝা। সেই কারণে,

দোষ লাগলেও ঠিক যাকে বলে বিগড়ে যাওয়া, সেটা সম্ভব হয়নি। তেত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত আমাদের জাতে বড় একটা কেউ বিয়ে না ক'রে থাকে না। আমি কিন্তু করিনি। খোট্টাই বল আর পাঞ্জাবীই বল, কলকাতায় মেয়েদের সঙ্গে কলেজে পড়লে মেজাজটা একটু কেমন কেমন হয়ে যায়। আমি তখন পাশে বিবিকে বসিয়ে হাওয়া খাওয়ার স্বপ্ন দেখতুম, আমার স্বপ্ন দেখার কায়দাটা একটু ভিন্ন রকমের। চোখ খুলেই দেখতাম, সুবিধা পেতাম অনেক বেশি। কত সময় "একটুখানি ছোঁয়াও" লেগে গেছে। আর বেশি এগুতে পারিনি বাবার খড়মের ভয়ে। প্রকৃতিটা তাঁর ওঝার মত ছিল কিনা। ছেলেই না হয় কলেজে পড়েছে, আধুনিক হয়েছে, বাবা তো বদলান নি। প্রাচীন কালের লোক—ছেলে একটু বিগড়োলেই প্রহার দ্বারা তাকে ঠিক করাটা তাঁদের অবশ্য-কর্তব্য ছিল। সে যে বয়েসেরই হোক না কেন।...আর বল কেন, এই কিছু দিন আগের কথা—সারস্বত রাঁধুনী-বামুনটা দেশ থেকে বিবাহ ক'রে ফিরল—একেবারে তাগড়া বউ। কলতলায় গা ধুচ্ছিল। সবে তখন আমার গোঁফ উঠছে। অমন একটা কারণ চোখের সামনে উপস্থিত থাকলে গোঁফে চাড়া না মেরে থাকা যায়? তোমরাই বল? হ্যাঁঃ, তোমরা আর বলবে কি? যত সব গোঁফ-কামানোর দল। যাক, শোন, গোঁফে চাড়া মারতে গিয়ে কি হয়েছিল। সবে একটা পাক ঘুরিয়েছি, এমন সময় পেছনে শুনলাম বাবা বলছেন, কেঁওরে, তেরি মোছ বহৎ কড়ি হোগয়ি হ্যায় ক্যা? শরম নহিঁ আতি? তু ক্যা কর রহা হ্যায়? চুপ ক'রে রইলাম। একটু ভীত হয়ে পড়েছিলাম। তিনি পাশে এসে গোঁফটা প্রায় ছেঁড়বার মত ক'রে জোরে পাক দিয়ে বললেন, কেঁও, অব ক্যায়সা মালুম হোতা হ্যায়? তু বিলকুল নালায়ক —বেওকুফ—বেশরম হ্যায়! বুঢ়া হোচলা, শাদিকা নাম নহিঁ। বাবু পঢ়হি রহে হ্যাঁয়; আউর দুসরেকী আউরৎপর—ছিঃ, তুঝনে মুঝে বেইজ্জৎ করডালা নৌকরকে সামনে। আরও কি মনে মনে বলছিলেন, কে জানে! খানিকটা গিয়ে আবার দুসরেকী আউরৎ একবার দেখে নিলেন। এইখানে কি শেষ? লক্ষ্মীছাড়ি, বাবা চ'লে যেতে আমাকে দেখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে নিলে। জবরদস্ত চেহারা, তার ওপর ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে ধরেছে। আমি কান্নার ভঙ্গীতে মুখ ঢেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে যতটা সম্ভব দেখে

নিচ্ছিলাম। বাবা ঘর থেকে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কম্‌বখ্‌ৎ! তুঝে শরম নহি, খাড়া কিস লিয়ে?

আমি কান্নার সুরে বললাম, জা রহা হুঁ তো।—আরে পিতাজী তো হুকুম করলেন। আমি কি ইচ্ছে করলে নড়তে পারি? জবরদস্ত চেহারাটা চোখের সামনে যেন চরকিবাজির মত ঘুরতে লাগল।

নবাগত সঙ্গীতজ্ঞের চেহারাটা একটু পিলে মার্কা ধরনের। রোমান্স সম্বন্ধে ঔৎসুক্য সর্বাপেক্ষা তাঁহারই বেশী। উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বামুন-ঠাকরুণের সঙ্গেই কি তা হ'লে—

ছট্টুদা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, আরে মেরী ইজ্জত নাশ কর্‌ রহা হ্যায়। আপনি কি বলছেন মশাই? জবরদস্ত হ'লেই বুঝি রোমান্স হয়? আরে, ওগুলো ফাউ—ফাউ। ও রকম হাজারো আছে। আসুন, রোমান্সের কথা বলছি শুনুন।

বাবা তো ঐ রকম খড়ম পিটিয়ে ছেলে দোরস্ত করেন। অন্য দিকে আত্মীয়স্বজন বলত, ক্যা বেওকুফ্‌ হয়রে তু! রইসকা লড়কা, আউর পড়তে পড়তে জান হয়রান কর্‌ রহা হ্যায়। হিতৈষী আত্মীয়দের সদুপদেশ ঠেলতে পারিনি। বি. এ. পাস করার পর প্রায়ই ক্লাস পালাতে আরম্ভ করলাম। এম. এ. পরীক্ষার মাত্র এক মাস বাকি। রুদ্দুর তখন টা-টা করছে। একদিন একেবারে দুপুরবেলা কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে উঠলাম। কেন বলছি।— কলেজ থেকে বেরিয়েই ট্রামের কাছে এসেছিলাম, মার্কেটটা একটু ঘুরে আসব ব'লে। ওটা আমার নেশা। জানই তো, ট্রামে ওঠা সম্বন্ধে আমার শুচিবাই আছে। মাথা খোলা শাড়ি না থাকলে আমি সে ট্রামে কদাচ পদার্পণ করি না। একটা দুটো তিনটে গাড়ি চ'লে গেল, কিন্তু শাড়ির দর্শন পেলাম না। দ'মে যাচ্ছিলাম; চতুর্থ ট্রামের প্রথম সিটের জানলার পাশ দিকে দেখলাম একটি বাহারী ঘোমটা। যা থাকে কপালে, ঘোমটা—ঘোমটাই সই, ভেবে উঠে পড়লাম। টাকার থলি বার ক'রে ইচ্ছে করে টিকিট কেনার সময় দুই তিন টাকা ফেলে দিলাম। কুড়িয়ে নিলাম না, ভাবটা—তিন টাকার জন্যে মাথা নীচু করা পোষায় না। যাঁর পায়ের তলায় টাকা টং ক'রে বেজে উঠল, তিনি ভাবলেন টাকা তাঁর পকেট থেকেই খসেছে বুঝি। পায়ের তলায় দৃষ্টি পড়তেই দেখলেন

চকচকে রৌপ্যমুদ্রা। বিনা দ্বিরুক্তিতে আমার সামনেই তুলে নিয়ে পকেটে পুরে ফেললেন। কণ্ডাক্টার বাধা দিতে যাচ্ছিল, আমি বললাম, আরে ভাই, বাবুজী মেরে দোস্ত হ্যাঁয়। কণ্ডাক্টার একবার আমার এবং একবার বাবুজীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিরস্ত হ'ল। কিন্তু অপর দুটো টাকা ভাগ্যগুণে সোজা চ'লে গেল ঘোমটার দিকে। মহিলা পাশ ফিরে নীচু হতে পাতলা ওড়নার ফাঁক দিয়ে কাঁচুলির অস্পষ্ট সঙ্কেত দেখে নিলাম। হাতটা ধপধপে সাদা, সামান্য হলুদের ছিটে আছে। সাহেবদের মত ফ্যাকাশে নয়। আরে ভাই, নিটোল গোল হাত, চাঁপার কলির মত আঙুল। আঙুলে পান্নার একটা আংটি। বাজুবন্ধের ঝুমকো ঘুরে ফিরে কাঁচুলির গায়ে ধাক্কা মারছিল। মহিলা টাকা তুলে নিয়ে পেছনের সিটের একজন ছোকরার হাতে দিলেন। হয়তো ছোকরা তাঁরই আত্মীয় হবে। এই সময় দেখলাম, আবরুর কারাগারে সারা ব্রহ্মাণ্ডের রূপরাশি ঐটুকু স্থানের ভেতর কি ভাবে জড় হয়েছে। নাকে হীরার নথনি, কপালে পোখরাজের টিকলি। মনে হ'ল, খাস ক্ষত্রিয়ানী। আমি নিজে ক্ষত্রিয় কিনা। প্রথম দর্শনেই মজলাম, কারণ মাথায় সিঁদুরের রেখা ছিল না। সুন্দরী এখনও বেওয়ারিশ।

নিলাম পিছু। চৌরঙ্গী পার হয়ে যাদুঘরের সামনে তিনি উঠলেন। দেখলাম সর্বদেহের গঠন যেন খুবসুরতিকা আকর। উঠে যখন ওড়না সামলালেন, তখনই বুঝলাম—মানুষ নয়, দেবী। বয়েস তেইশ কি চব্বিশ। এখনও বিবাহ হয়নি। তাজ্জব কি বাৎ! ভাবলাম, জান যায় তোভি উনসে মিলনা হ্যায়। আমার সামনে দিয়ে পাঁয়জোর বেজে গেল। ঝঙ্কার তার রুদ্র-বীণের জুড়ীর তারের মত। সুর ও নৃত্যের সম যেন দুলে চলেছে। তাঁর দলটি বেশ ভারী। জন-পাঁচেক পুরুষ ও তিনজন মহিলা। নানা বয়সের—একেবারে আকর্ষণহীন। সঙ্গে সঙ্গে সেকেণ্ড ক্লাস থেকে একটি লগুড়ধারী দরোয়ানও নামল। বয়স হ'লে কি হয়, সে লাঠি ধরতে জানে। ইতিমধ্যে টাকাটা হাত বদলি হয়ে শেষ পর্যন্ত আমার কাছেই এসে পৌঁছল।

দরোয়ান দেখে দ'মে গেলাম। এটা আবার কেন? মনে টান পড়েছে, করি আর কি, আমিও যাদুঘরে ঢুকলাম। তখন তাঁরা archaeology-র ঘরে ঘুরছেন। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মেয়েটি পাথরের মূর্তি দেখে একজনকে বললেন, আরে

এহি তো গান্ধার স্কুল। মেরা আর্টিকেল ইস্ মাহিনেমে নিকলেগা। ...হায় হায় হায়, ক্যা মিঠি জবান! আমি তো একেবারে ছুছুন্দর ব'নে গেলাম। আর থাকতে পারলাম না। একটা গোপন ঘরে ঢুকে চাদরটা পাগড়ির মত ক'রে বাঁধলাম। বাইরে বেরিয়ে এসে চার-পাঁচ দোনা পান কিনলাম। চৌরঙ্গীর রাস্তা কি চওড়া হে! কোন প্রকারে গাড়ি চাপা পড়া থেকে আত্মরক্ষা ক'রে আবার যাদুঘরে ঢুকে পড়লাম। দরোয়ানজী পিছুয়ে ছিলেন। তাঁর সামনে গিয়ে কুস্তির কায়দায় ঊর্ধ্ববাহুতে তাল ঠুকে সেলাম করলাম। প্রথমটা দরোয়ান অবাক হয়ে গিয়েছিল। যে ভাবে সেলাম করেছিলাম, তা আখড়ার নিয়মে সাগরেদি মানা।

দরোয়ানের চৌপাট্টা দাড়ি। তার মাঝে মস্ত বড় মর্দানা গোঁফ। প্রথম কথাতেই শুরু করলাম, উস্তাদ! আপকি শোহরৎ এক জমানেসে শুন রহা হুঁ। মগর অব তক মিলনেকি খুশ্‌নসীবি না হুই। হমারী আরজু হ্যায় কি ম্যঁয় আপকী শাগির্দি করুঁ। খিদমৎ মেঁ ম্যয় খুদ কো পেশ করতা হুঁ। মুঝে একিন্ হ্যায় হমারা তোফা নামঞ্জুর না হোগা।

কলকাতার মত শহরে একটি অপরিচিত দঙ্গলী পাঠ্‌ঠা, দরোয়ানের ঘুণ-ধরা বয়েসে অতবড় সম্মান দেবে ভাবতে পারেনি। খুশি হয়ে বললে, বৈঠো বচ্চা।—এতটা বলিয়া ছট্টুদা বলিলেন, গেলাস খালি হয়ে গিয়েছে বাওয়া—

খানসামা ডিকেণ্টার লইয়া আসিল। ছট্টুদা খুশি হইয়া বলিলেন, এ না হ'লে গল্প জমে? তাহার পর বলিলেন, আচ্ছা নরনারায়ণ, তোমাকে এ গল্পটা আগে অনেকবার বলেছি। তুমিই বল না। ততক্ষণ আমি একটু মৌজ ক'রে নিই। এতদিনে তোমার মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত। ছট্টুদার এখনও তেত্রিশ বৎসর হইলে কি হইবে, তিনি আধ ঘণ্টার বেশি বসিয়া থাকিতে পারেন না। মাঝে মাঝে একটু ঘুমাইয়া লইতে হয়। পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

নরনারায়ণ গল্প শুরু করিল।—ছট্টুদাকে তোমরা এখন ঐ রকম দেখছ। দশ বছর আগেও যে চেহারা দেখেছি, সেই চেহারার সঙ্গে এখনকার চেহারা তুলনা করলে চোখে জল আসে। ভদ্রলোক এককালে সত্যিই পালোয়ান ছিলেন, বাইরের কত নাম-করা কুস্তিগিরের সঙ্গে দঙ্গল লড়েছেন, যাক সে সব কথা, উনি থামলেন কোন্‌খানে?...পিলে-মার্কা বললে, বৈঠো বাচ্চা। বাচ্চা চারটে

পানের দোনাই নতুন গুরুর করকমলে অর্পণ ক'রে করজোড়ে মাটির ওপর ব'সে পড়ল। পাতলা শান্তিপুরী কাপড়ের পেছনটা ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গেছে। ছট্টুদার ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি মনোরথে চ'ড়ে রোমান্সে বার হয়েছেন। রথচক্র ঠিক রাখাই এখন তাঁর ধর্ম। বাঁধা রাস্তায় চাকা চলে ভাল। কিন্তু ছট্টুদা এবার একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছিলেন। সরল ছেড়ে বক্র ধরেছিলেন। লোকগুলোর আদব-কায়দা দেখলেই মনে হয়, ওরা ঠিক কলকাতার বাসিন্দা নয়। বেহার কি যুক্তপ্রদেশ থেকে এসেছে, তারও নিশ্চয়তা নেই। তথাপি পিছু যখন নিয়েছেন, আস্তানা না দেখে তিনি ছাড়বেন না। পালোয়ানিতে প্রায় বুড়ো বয়েসে বিনা চেষ্টায় ওস্তাদ খ্যাতি লাভ করা বড় সোজা কথা নয়। দরোয়ান মুরুব্বিয়ানার চালে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা বেটা, তুমনে পহ্চানা ক্যায়সে মুঝে?

ছট্টুদা বললেন, মাফ ফরমায়েঁ উস্তাদ। আপকো কৌন নহিঁ পহ্চানতা হ্যায়। বচ্পন্‌সে আপ্‌কা নাম শুন্‌তা আরহা হুঁ। ছট্টুদা বহুদিন কাশী-ধামে ছিলেন, সুতরাং দরোয়ানের কথার চাল শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন—লোকটি যুক্তপ্রদেশের। লেখাপড়া যৎসামান্য করিয়াছে। কাশীধামমেঁ আপকে কিতনে চেলে হ্যাঁয়—কথাটা ব'লেই প্রস্তুত হয়েই রইলেন, বেফাঁস হ'লে চোঁচা দৌড় দেবেন। আর বেরালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লে তো মার দিয়া কেল্লা।—

কেল্লা ফতে হ'ল না বটে, কিন্তু তাগটা গা ঘেঁষেই গিয়েছিল। দরোয়ান দেহাতী হ'লেও আসলে শহুরী। খাস কাশীধামে বাস। দামোদরপ্রসাদ বর্মার ওখানে দরোয়ানি ক'রে প্রায় বুড়ো হতে চলেছে। দামোদরবাবু বনিয়াদী জমিদার,—কিন্তু আধুনিক মতাবলম্বী। নিজে ইংরিজী খুব বেশি না জানলেও ফারসী ও সংস্কৃতে পণ্ডিত। মেয়েকে কলেজে পড়ান, এইবার বি-এ পরীক্ষা দেবে। বড় ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি পরীক্ষার ছাপ নিয়ে তাস খেলবার সময় পেয়েছেন এবং পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন। এতগুলো খবর ছট্টুদা একবার ব'সেই বার ক'রে ফেললেন।

ছট্টুদার ভোল বদলেছে, নামটাও বদলানো দরকার। বাচ্চা নিজের নামকরণ করলেন যদুনন্দন সিং। নামকরণ ভালই হ'ল, কিন্তু কলকাতার ঠিকানা, বার করা সম্ভব হ'ল না। পাঁড়েজী রাস্তার নাম অথবা বাড়ির নম্বরের খবর

রাখেন না। দামোদরবাবুর কন্যা কোন টাকাওয়ালা আত্মীয়ের বাড়ি দুই-এক দিনের জন্যে উঠেছেন। আত্মীয়ের দেউড়িতে সঙিন সান্ত্রী হরবখৎ মজুত। ঠিকানার চেয়ে এই খবরই সে বিশেষ ক'রে দিলে। অর্থাৎ আমার হুজুর বড় একটা যে-সে লোক নয়। যেখানে-সেখানে তাঁর কন্যার ওঠবার উপায় নেই। বাচ্চা মনে মনে ভাবলে, টাকাওয়ালার বাড়িতেই যদি উঠল তো তার গাড়ি ব্যবহার করতে অসুবিধেটা কি ছিল? পরক্ষণেই মনে পড়ল—কলকাতার ফার্স্ট ক্লাস ট্রামের কথা। সারা পৃথিবীতে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। কৌতূহলী হয়েও তো ট্রামে চড়া সম্ভব। ভাবলে ইতিমধ্যে একবার বোঁ ক'রে সেই ঘোমটার ভেতরকার মুখখানা দেখে এলে কেমন হয়? বাচ্চার স্বভাবই ঐ রকম ছুঁকছুঁকে, সব বিষয়ে তড়িঘড়ি। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ওস্তাদ! আপ পাথরকে দেওতা দেখেঙ্গে নহি?

পাঁড়ে বললে, আরে জানে দে বেটা। উয়ো টুটা ফুটা কেয়া না কেয়া হ্যায়। উয়ো কভি দেওতা হো সকতা? হনুমানজীকে এক ভি তো মূর্তি দেখতা নহিঁ হুঁ। আরে জানে ভি দে—তু বৈঠ্—রাজাবাবুজীকে ফুফা আভি ইসতরফ্ আ জায়েঙ্গে। টুটা দেওতা নহিঁ দেখনা চাহিয়ে। মহাপাপ হোতা হ্যায়।

বাচ্চা ফাঁপরে প'ড়ে গেল। একি দুর্বিপাক! লোকটা সত্যিই উঠবে না নাকি? কলকাতার ঠিকানাও বলতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত সারাটা শহর ঘুরতে হবে নাকি? কপালে হয়তো তাই আছে। রুদ্দুর টা-টা করছে, এই গরমে যদি চিড়িয়াখানায় ঢুকে পড়ে! নাঃ, উপস্থিত চিড়িয়াখানায় যাবে না। পাঁড়েঠাকুর আশ্বাসবাণী শোনালে—এখান থেকে তারা কালীঘাটে দেবী দর্শনে যাচ্ছে। কি আর করে, বাচ্চা বসল—তবে একটু পাশ ফিরে, যদি ওড়নার আঁচলটা দৃষ্টির মধ্যে এসে পড়ে তো মুখটি দেখে নিতে পারবে। গঠনের মাধুর্য উপভোগ করাটা সামনা-সামনি মুখ দেখা অপেক্ষা অনেক সোজা।

অনেক ওড়নাই চলে গেল, আসলটির কিন্তু আসবার নাম নেই। মনে মনে ভাবলে, শেষে থিসিস লেখবার মালমসলা সংগ্রহ করছে নাকি? আচ্ছা বাপু, মেয়েদের লেখাপড়া শেখাও ভাল কথা, তাই বলে তারা থিসিস লিখবে, ডাক্তারি করবে, ওকালতি করবে? এ সব বাড়াবাড়ি। বাচ্চা ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। আর কতক্ষণ এইভাবে ব'সে থাকা যায়? বিরক্তি এসে গেছে।

দুত্তোর ব'লে ফিরবে ঠিক করছে, এমন সময় বাঞ্ছিত দেহটিকে তার দিকে অগ্রসর হতে দেখল। সর্বপ্রথম সেই সুন্দরী। ফিকে সবুজ রং চুমকিদার শাড়ি। তার ওপর হালকা বাসন্তী রঙের ওড়না। কাঁচুলি সাদা; মাঝে মাঝে সোনালী বুট্টু। বুকের নীচে তলপেটের মাংস দেখা যাচ্ছে। দুই একটি প্রাণ-মাতানো খাঁজ, নরম চামড়ার আকর্ষণকে গাঢ় ক'রে তুলছে। তার ওপর ঠমকি চলার দোলা। ক্ষত্রিয়ানী একটা চলন্ত ছবি হয়ে উঠেছে। বাচ্চা প্রাণ ভ'রে দেখল, হয়তো একবার দৃষ্টির মিলনও ঘটে গেল। বাচ্চা এইবার খাবি খেতে লাগল। দরোয়ানজীও উঠলেন, রাজকুমারীর সামনে ব'সে থাকার হুকুম নেই, যদিও পাঁড়েজীর কোলেই রাজকুমারী শিশু-অবস্থায় কত খেলা করেছে। রাজকুমারী ক্ষত্রিয়ানীর নাম নয়। পিতা রাজাবাবু ব'লে পরিচিত, সেই কারণে সকলে তাঁকে রাজকুমারী বলে ডাকত।

বাচ্চাও উঠল এবং পাঁড়েজীর পেছন পেছন চলতে লাগল। তার একটা ভয় ছিল, যদি কোন বন্ধু তাকে এই অদ্ভুত বেশে দেখে ফেলে! কপালগুণে সে রকমটা কিছু ঘটল না। পুরো দু ঘণ্টা ঘুরে সকলে যাদুঘর থেকে বার হ'ল।

ট্রামে উঠলে সব দিক দিয়েই সুবিধে হ'ত। কিন্তু এবারকার ব্যবস্থাটা জটিল হয়ে উঠল। ট্যাক্সি ডাকবার হুকুম হ'ল। পাঁড়েজী কলকাতায় প্রথম না এলেও ট্যাক্সি ডাকাটা সুবিধাজনক মনে করছিল না। ব্যাপারটা লক্ষ্য ক'রে বাচ্চা যেন চাঁদ হাতে পেল। করজোড়ে পাঁড়েজীকে বললে, উস্তাদ, ম্যঁয় তো আপকা হুকুম তামিল করনেকা লিয়ে তৈয়ার হুঁ। ট্যাক্সি বোলাউঁ ক্যা?

পাঁড়ে বললে, জা বেটা, লে আ দো গাড়ি। তুঝসে মিল্‌কর ম্যঁয় বহুৎ খুশ হুঁ। হমারে মুলুকমে আনে পর মুঝসে জরুর মিল্‌না।

বাচ্চা বললে, নহিঁ উস্তাদ। ম্যঁয়ভি তো আপকে সাথহি চল্ রহা হুঁ। উস্তাদকী শোহরৎমেঁ মাতাজীকে দর্শনকো জানেকো কব সৌভাগ্য প্রাপ্ত হোগা? আউর এহিঁ হমারে দোস্ত ট্যাক্সি চালাতে হ্যাঁয়। ম্যাঁয় তিন ট্যাক্সি লিয়ে আতা হুঁ। পিছেকী গাড়ি মেঁ হম্‌লোগ আরামসে বৈঠেংগে। ভাড়াভি দেনা নহিঁ পড়েগা।

মোটরের পেছনের সীটে পাঁড়েজী কখনও বসেনি। প্রলোভনটা বেশ পাকা হয়ে তার মনকে আঁকড়ে ধরল। তবু সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল ভেবে বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ! ভাড়া নহি' লাগেগা?

বাচ্চা বললে, উস্তাদ, আপ মেরে গুরু, আপসে ক্যা মঁ্যয় ঝুট বোলুঙ্গা? এতটা ব'লে বাচ্চা ট্যাক্‌সি-স্ট্যান্ডের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তিনজন ড্রাইভারকেই মিটারের আনুমানিক ভাড়া দিয়ে সকলকে শিখিয়ে দিল, সামনের দুজন ড্রাইভার যেন এক টাকার বেশি ভাড়া না নেয় এবং পেছনের গাড়ির ড্রাইভার বিনামূল্যে চালাচ্ছে এই রকম ভান করে। পেছনের ড্রাইভারকে বকশিশটা ভাল রকম দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠিক দরোয়ানের মতই সামনের সীটে ব'সে সে তিনটে গাড়ি নিয়ে এল এবং তার পূর্ব-নির্দেশমত গাড়িগুলো পর পর দাঁড়াল। আমরা সেখানে উপস্থিত থাকলে হতভম্ব হয়ে যেতাম। ছট্টুদা অর্থাৎ বাচ্চা তাগ বুঝে এমন জায়গায় দাঁড়াল যে, যে গাড়িতেই ঘোমটার স্বত্বাধিকারিণী উঠুন না কেন, দরজা খুলে ধরার সুবিধে ছট্টুদারই আগে।

পাঁয়জোর বাজছিল ক্ষত্রিয়ানীর পায়ে, তার প্রতিধ্বনি উঠছিল ছট্টুদার হৃদয়ে—দৃশ্যটা সহানুভূতির যোগ্য। বিরাট বক্ষখানা আরও চিতিয়ে ছট্টুদা দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষত্রিয়ানীর কিন্তু সে দিকে লক্ষ্যই নেই। পাশের বৃদ্ধা আত্মীয়ার সঙ্গে কথা বলতেই ব্যস্ত। কাছে আসতেই সামরিক কায়দায় সেলাম ক'রে ছট্টুদা দরজা খুলে দাঁড়ালেন। সায়েন্‌টিফিক সেলাম মাঠে মারা গেল না। ক্ষত্রিয়ানী মুখ উঁচু ক'রে দেখলেন। ভাবটা, এ দরোয়ান আবার কবে বাহাল হ'ল! হয়তো আরও কিছু ভেবেছিলেন, না ভাবলেও মনস্তত্ত্বের খাতিরে ভাবা উচিত ছিল; কারণ আমাদের ছট্টুদা দেখতে সুদর্শন —ঝাড়া ছ ফুট লম্বা। পালোয়ানী গড়ন; তা ছাড়া রংটাও তাল ঠুকে যে কোন গৌরকান্তিকে তুলনার জন্যে আহ্বান করতে পারে। ক্ষত্রিয়ানীর উজ্জ্বল বর্ণে যদি পিঙ্গলের ছিটে লেগে থাকে তো ছোট্টুদার রঙে গোলাপী আভাসের অভাব নেই। সংক্ষেপে তাঁকে দেখলে দরোয়ান ভাবতে মন চায় না। ডাগর চোখের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির অর্থ ছট্টুদা নিজের ইচ্ছেমত ক'রে নিলেন। গাড়িতে ওঠবার আগে এমন ভাবে দরজাটি ধরলেন, যাতে ভেতরে ঢোকবার সময় একটুখানি ছোঁয়া লাগতে পারে। নিজের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে কি

লোকে রোমান্সের রাজা হতে পারে? গাড়িতে বসতেই দ্বারপথ আড়াল ক'রে বললেন, হুজুর, ম'য় পাঁড়েজীকা চেলা হুঁ।

ক্ষত্রিয়ানী আবার ফিরে তাকালেন ; ওষ্ঠ দুইটি ঈষৎ ন'ড়ে উঠল। নতুন প্রশ্নের জন্যে নয়, পেছনের মানুষদের রাস্তা ছেড়ে দিতে বললেন।

পাঁড়ে ওদিকে চেলার কান্ড দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। রাজকুমারীর ফুফাজী দরোয়ানকে গাড়ির সামনের সীটে বসতে বললেন। তবে কি সব চালই বিফল হ'ল নাকি? বিফলই যদি হয় তো গল্প চলে কেমন ক'রে? অন্য ট্যাক্‌সিগুলো গা-ঝাড়া দিতেই আবার ছোট্টুদা সামরিক কায়দায় রাজকুমারীকে সেলাম করলেন ও অপরদের দেশী প্রথায় নমস্কার ক'রে পেছনের গাড়িতে একলাই উঠলেন।

কালীমন্দিরে ছট্টুদা কতবার এসেছেন তার গোনাগুন্তি নেই। পান্ডারা সকলেই তাঁকে চেনে এবং তাঁকে দেখলে যাদের সেদিন পালা নেই তারাও পান্ডা সেজে বসে। ছট্টুদা সৎকার্যে অর্থব্যয় সম্বন্ধে চিরকাল উদার। কোন পান্ডাই আনায় দক্ষিণা পায় না, সফলতা হিসাবে রৌপ্যমুদ্রার সংখ্যাও বেড়ে চলে। মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই ছট্টুদার গাড়ির বেগ হঠাৎ বেড়ে গেল এবং দেখতে দেখতে সামনের দুটো গাড়িকে পেছনে ফেলে তিনি মন্দিরদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন।

মন্দিরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে অতটা নীচু হয়ে নমস্কার করতে কেউ দেখেনি। যারা দেখেছে তারা জানত—যথেষ্ট মূল্যের বিনিময়ে ঐ জাতীয় নমস্কার ছট্টুদা কিনেছেন। পান্ডা বললে, আপনি নিজেই এনেছেন, না আমরা এনে দোব?

ছট্টুদা বললেন, না, আমার সঙ্গেই আছে।

পুরোহিত বললে, তা হুজুর, কি হুকুম হয়, সস্তায় সব ব্যবস্থা করব, না এমনই ছেড়ে দোব?

ছট্টুদা বললেন, সামান্য নিলেই হবে, যত কমে পার। আর ব'লো, আমার খাতিরেই সব কিছু কমে হয়ে যাচ্ছে।

পুরোহিত বললে, আজ্ঞে, তা তো আমরা বরাবরই ক'রে থাকি। আপনার কৃপায়—

ছট্টুদা কথাটা শেষ করতে দিলেন না, কেন না রাজকুমারী তখন মন্দির-দ্বারের সামনে এসে পড়েছেন। এবার তিনি মাঝখানে। আত্মীয়গুলির ওপর ছট্টুদা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন—ওঁকে ঘেরবার প্রয়োজনটা হ'ল কি কারণে? মন্দিরে ঢোকবার আগে আবার সেই সেলাম। পুরোহিতকে হুকুম ক'রে বললেন, হামারে মাল্‌কিন আতি হ্যায়—হুঁশিয়ার।

প্রত্যেকটি কথাই রাজকুমারীর কানে গেল। এবার তিনি বাস্তবিকই কৌতূহলী হয়ে উঠছিলেন—যেখানেই লোকটা যাচ্ছে, সেখানেই তার প্রতিপত্তি। একবার ফিরে তাকালেনও। চেহারাটা ভালই লাগল। হয়তো একবার চিন্তাও করলেন, এমন চেহারা যার, সে কিনা সামান্য একটা দরোয়ান! আরও বেশি কিছু ভেবে থাকলে জানি না। আর না জানাই ভাল; কারণ হৃদয়ের সব কথা সকলে জানতে পারলে পৃথিবীতে বাস করা দুঃসহ হয়ে উঠত। বীভৎসতা থেকে রক্ষা পাবার জন্যেই তো প্রেমে মোহান্ধ হবার ব্যবস্থা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নিজে ক'রে দিয়েছেন। মানুষ কামোচ্ছ্বাসকে নীতি ও ধর্মের খোলস পরিয়ে সন্তোষলাভ করেছে। রাজকুমারী পুনঃ পুনঃ সেলাম পেয়েও রুষ্টা হন নি। ছট্টুদার সাহসের অভাব নেই। সকলের সঙ্গে তিনিও ভেতরে ঢুকে পড়লেন। পুরোহিতের সাহায্যে রাজকুমারীর গা ঘেঁষে দাঁড়ানোটাও অত্যন্ত সহজ হয়ে গেল। এত ভিড় যে গায়ে গা না লাগিয়ে দাঁড়াতে হ'লে অশরীরী হতে হয়। কারও সে ক্ষমতা নেই। কারণ সকলে স্থূল দেহ নিয়েই অর্ঘ দিতে এসেছে। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে ভক্তকে ভবিষ্যতে কোন্‌ ক্লাসের সূক্ষ্ম দেহ দেবেন সে তো পরের কথা। বর্তমানে সব কিছুই স্থূল। ছট্টুদা করজোড়ে রাজকুমারীর পাশে দাঁড়িয়ে ভক্তি-অর্ঘ অর্পণ করছিলেন। একবার, দুবার—ক্রমান্বয়ে বহুবার কনুইয়ের ঘর্ষণ চলতে লাগল। রাজকুমারী ধর্মোপকরণ অনুভব করেন নি, এমন নয়। কে বলতে পারে, অমন গৌর-কান্তি সুদর্শন ও বলিষ্ঠ পুরুষের স্পর্শে তিনি আনন্দ পান নি? বিনা বিঘ্নেই মাংসে মাংসে ঠেকাঠেকিতে ছট্টুদা মনে যথেষ্ট বল পেলেন। পুজো ও দানের পালা শেষ করতেই বেলাও প'ড়ে এল। ছট্টুদা আশ্বস্ত হলেন, যাক, চিড়িয়াখানা দেখাটা বাদ পড়বে। হ'লও তাই। ট্যাক্‌সি সোজা বড়বাজারের দিকে চলল। এবারও ছট্টুদা একা পেছনের গাড়িতে উঠলেন।

যথাসময়ে সকলে ত্রিতল অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছট্টুদা হুঁশিয়ার লোক, কালবিলম্ব না ক'রে সেলাম ঠোকবার জন্যে গাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। রাজকুমারী আবার তাঁকে দেখলেন। এবারকার দেখার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। দাদার এমন একখানি বদন দেখার মত ক'রে না দেখলে আমরাই বলতাম, রাজকুমারী ফিলিস্টাইনদের দলভুক্তা।

গৃহপ্রবেশ হয়ে গেল। বুড়ো পাঁড়ে ছট্টুদার কাছে এসে বললে, তোরা ইরাদা ক্যা হ্যায় রে? হমারি নৌক্‌রি লেনা চাহতা হ্যায় ক্যা? এরূপ সন্দেহ আসা স্বাভাবিক। তিনি যে ভাবে জোঁকের মত লেগেছিলেন, শুধু নোক্‌রি কেন, আরও অনেক কিছু সন্দেহ এলেও আশ্চর্যের কারণ কিছু থাকত না।

ছট্টুদা একেবারে নতজানু হয়ে ভক্তিভরে এবং করজোড়ে বললেন, উস্তাদ, ইয়ে বাৎ আপনে ক্যায়সে কহী? ম্যঁয় তো আপকা চেলা হুঁ না! গুরুকা আসন কভি চেলা লে সকতা হ্যায়? বলবার ভঙ্গীতে গুরু কিছু গললেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়েছেন ভাবতে পারলেন না। সেদিনের মত বিদায় নিয়ে ছট্টুদা বাড়ি ফিরলেন।

পরের দিনের কথা। ভোর না হতেই দেখা গেল, ছট্টুদা কাঁধের ওপর একটা সবজির ঝুড়ি নিয়ে দরোয়ানজীর সামনে উপস্থিত হয়েছেন। কপালে পরের পর তিনটে সিঁদুরের সরল রেখা। চোখে সুর্মা। মাথায় ফিকে হলদে রঙের যোধপুরী পাগড়ি। গলায় সোনার কণ্ঠি, দঙ্গলের জয়টীকার মতই তৈরি গর্দানকে আঁকড়ে ধরেছে। গায়ে অত্যন্ত ঢিলে পাঞ্জাবি। কাপড় হিন্দুস্থানীদের মত ক'রে পরা। পায়ে জরিদার নাগরা। হাতে লোহার সঙ্গে রুপো-বাঁধানো সাড়ে ছ ফুট বাঁশের লাঠি।

ছট্টুদা ঝুড়ি নামিয়ে গুরুজীর পদতলে রাখলেন। এক ঝুড়িতেই প্রায় চল্লিশ টাকার বাজার। আখরোট, খোবানি, বাদাম, পেস্তা থেকে আরম্ভ ক'রে বাজারের নাম-না জানা শ্রেষ্ঠ মেওয়া। তারও ওপর দুখানা মিহি ধুতি, পাঞ্জাবির জন্যে একথান আদ্দি। সর্বোপরি গোলাপী ভাং আর গোলমরিচের ঠোঙা।

পদতলে গুরুদক্ষিণা রেখে নতুন জুতোজোড়া খুলে ফেললেন। গোড়ালির কাছে পয়সার আকারের দুটো ফোস্কা উঠেছে। বাড়ি থেকে

ট্যাক্সিতে এসেছিলেন। রাস্তার মোড় থেকে এইটুকু হাঁটতেই টাইট-ফিটিং জুতো তাঁর এই দুর্দশাটি ঘটিয়েছে। জুতো ইচ্ছে করলেই ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু টাটকা ফোস্কা থেকে অত সহজে রক্ষা পাওয়া যায় কেমন ক'রে?

ছটুদা বললেন, উস্তাদ, আপকে লিয়ে লায়া হুঁ। আউর গুরুদক্ষিণা ভি হাজির হ্যায়।—ব'লে একটা আকবরী মোহর ঠিক হিন্দুস্থানীদের মত ট্যাঁক থেকে বার করলেন।

পাঁড়েজী এবার প্রায় কেঁদে ফেললে, আরে, তু তো মেরা বেটা হ্যায়। সত্যিই পাঁড়েজীর স্ত্রী-পুত্র বলতে সংসারে কেউ নেই। স্নেহের বন্ধন যদি কিছু থাকে তো রাজাবাবুর এখানে চাকরি এবং রাজকুমারীকে দূর থেকে কন্যার মত স্নেহ করা। কৈশোরের প্রারম্ভ পর্যন্ত রাজকুমারীর আব্দার রাখবার জন্যে পাঁড়েজীকে কিল-চড় খেতে হয়েছে। দক্ষিণার বহর দেখে পাঁড়ে সত্যিই ছটুদাকে বিশ্বাস ক'রে ফেললে। ছটুদারও রোমান্স ছাড়া অন্য কোন মতলব ছিল না। তবে এবার বাছাধন সব দিক দিয়েই প্যাঁচে পড়েছেন। প্রথম নম্বর—প্রেমটাই পাকা ধরনের হয়ে উঠছে। দ্বিতীয়—নাগরা পরা, মোট বওয়া আর সর্বক্ষণ পাগড়ি এঁটে থাকা অসহ্য হয়ে উঠেছে। তৃতীয়—বাবার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে বচসা ও গৃহত্যাগ; ছটুদা তো প্রয়োজন হ'লে ক্ষত্রিয়ানীর সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী ঘুরবেন ব'লে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

মোগলসরাই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা গেল, ছটুদা স্তূপীকৃত পোঁটলা-পুঁটলি লোটা-কম্বল ও তৎসহ বিদেশী ধরনের দামী ট্রাঙ্ক ও সুটকেসের পাশে একলা ঝিমোচ্ছেন। পাঁড়েজী তাঁকে মালের জিম্মায় রেখে আহার্যের সন্ধানে গেছেন। বেচারা থার্ডক্লাস ট্রেনে কখনও রাত্রিযাপন করেন নি। ছারপোকার কামড়ে জর্জরিত হয়ে সারাটা রাত জেগে কাটিয়েছেন। তার উপর সকালে কুক্কুটডিম্বসহ চা পান নি। খাওয়া সম্বন্ধে তাঁর ম্লেচ্ছাচার চিরকালই ছিল। পিতাজীর কোন প্রকার উপদেশ কাজে আসেনি। পাঁড়েজী নিজের রুচিমত চর্ব্যচোষ্য শেষ ক'রে নিজের পয়সায় ছটুদার জন্যে ছোলা-সিদ্ধ ও লোটায় ক'রে গরম দুধ নিয়ে এল। নোংরা গামছায় ছোলাসিদ্ধ পুঁটলির আকারে এসেছিল; তাই আবার প্ল্যাটফর্মের অসংখ্য মানুষের পদ·

ধূলির উপর বিছিয়ে পাঁড়েজী বললে, খা বেটা। বহুৎ লজ্জতদার হ্যায়।

খাদ্য দেখে ছট্টুদার প্রায় চোখে জল এসেছিল। অন্তর্যামীকে নিবেদন করলেন, প্রভু, এবার তো বিয়ে করব ব'লেই বের হয়েছি। তবে কেন দারুণ যন্ত্রণায় ফেলছ? অন্তর্যামী অত সহজে ভোলবার পাত্র নন। সিদ্ধ ছোলা-গুলি পাঁড়েজীর অনুরোধে সব খেতে হ'ল। পালোয়ানের উপযুক্ত পরিমাণে মিরচাই সহ সিদ্ধ ছোলা খাওয়া কুস্তী করবার সময়েও ছট্টুদা অভ্যাস করেন নি। সুতরাং তাঁকে ফলভোগ করতে হয়েছিল। কি ভাবে করেছিলেন তা লিখব না। প্রথম, ভদ্র আইনে মানা আছে, দ্বিতীয়, বলতে গিয়ে আমাদেরই চোখে জল এসে পড়ে...

ইতিমধ্যে একটি মজাদার কাণ্ড ঘটে গিয়েছে! ব্যাপারটি ফাউয়ের। রাজকুমারীর প্রৌঢ়া দাসী এসে ডাকল, যদুনন্দন সিং! ছট্টুদা নিজের নাম নিজেই ভুলে গিয়েছেন—নামকরণ তো তাঁর নতুন অভ্যাস নয়। যখন যে অবস্থায় পড়েছেন তখনই সব কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নিজের নামটি বদলিয়ে ফেলেছেন। যদুনন্দন নামটি পাঁচশো ছাপ্পান্ন বারের পর। সুতরাং প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। তার পর যখন উপলব্ধি করলেন, যদুনন্দন তিনি নিজে, তখন সরস ভাবে পুষ্ট মেয়েটির দিকে তাকালেন এবং এটাও বুঝলেন, দাসীরাও রোমান্স চর্চা ক'রে থাকে। একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কহো না ভাই হমারে, রাজকুমারী কি জুতিয়াঁ কহ্যাঁ হ্যাঁয়।

জুতার খবর দিতে না পারলেও ছট্টুদা অভ্যাস মত মুচকি হাসির পরিবর্তে যা দিতে হয় তা দিয়ে ফেললেন। গৌরকান্তি তাগড়া পাঠ্‌ঠা যে প্রতিদান দিল, তা দাসীর অন্তরে গেঁথে গেল। পুঁটলি হতে আধুনিক ধরনের সেফটি চটি বার করতে করতে দাসী হাসির ওপর চোখের ইশারাও পাঠিয়ে দিল। ছট্টুদা রোমান্সকে ধর্মের মতই জানতেন। গোড়াপত্তন অপর পক্ষ করলে তিনি কাকেও প্রত্যাখ্যান করেন নি। চক্ষের ভাষায় আদান প্রদান চলতে লাগল। ছট্টুদা যেন গলে গিয়েছেন এইভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, উয়ে জুতিয়াঁ কৌন্ পেহরেঙ্গী? দাসী বললে, আউর কৌন্! রাজকুমারী।

ছট্টুদা বললেন, ম্যঁয়নে তো দেখা রাজকুমারী সরপর ওড়নী ওড়ে নঙ্গে পাওঁ জা রঁহিথি।

দাসী বললে, আরে, ফুফাকী কোঠীমেঁ বিবিকি তরহ রহেঙ্গী ক্যা? দেবী দর্শন করনে গঈ থী। উঁহা জুতে কৌন্ পহিরনা হ্যায়।

এর মধ্যে পাঁড়েজী ছোলা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। ছটুদা বুঝলেন, রাজকুমারীর কলকাতাবাসী পিসেমশাই গোঁড়া প্রাচীনপন্থী। সেই কারণেই ক্ষত্রিয়ানী ভোল বদ্‌লিয়েছেন। আসলে তিনি আধুনিকা। ভাল লাগল। কিন্তু কাঁচুলীটা যে মনোহরণ করেছে! ওটা কি প্রসাধন থেকে খসে যাবে? ছোলার আবির্ভাব চিন্তায় বাধা দিল। দাসীও উঠে গেল জুতা জোড়া হাতে করে।

পাঁড়েজী বললে, আরে বেটা তু উস্‌সে বাতেঁ মৎ কিয়া কর্ না। উস্‌কি চালচলন্ একদম বিগাড় হুই হ্যায়। জব্ তু কলকত্তেমেঁ থা তব্ ইস্‌নে মুঝে পরেশান্ কর রাখ্যা থা। পুছাতিহি রহি—উয়ো কৌন্ হ্যায়—উস্‌কা নাম ক্যা—কিস্‌লিয়ে আয়া?—আওরভি কিত্‌নী বাতেঁ। উস্‌কী চাল ইৎনী গড়বড় হ্যায় কি উস্‌কা মরদ্‌ভি উসে ছোড় গয়া।

ছটুদা দুধ খেলেন না। একটা কিসের অজুহাত দিয়ে উঠে পড়লেন। ইচ্ছা, ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ গাড়িটার গা ঘেঁসে যাওয়া। গত সন্ধ্যায় আঁখোমে সুরমা লাগিয়েছিলেন। দাসী ডাকবার সময় যেভাবে চোখ রগড়িয়েছিলেন, তাতে শিশুর 'হাতে কালি মুখে কালি' অবস্থা হয়েছে। প্রসাধনের উৎপীড়ন একেই বলে। মুখটি হয়েছে প্রায় সং সাজার মত। ফার্স্ট ক্লাস গাড়ির সামনে এসে রাজকুমারীকে সেলাম ঠুকতে তিনি সেলাম গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু অবাক হয়ে প্রথমটা ছটুদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার পর হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মুখে হাত দিলেন।...দুই একটি কথা শোনবার জন্য ছটুদা ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন, বললেন, হুজুর, কোই ফর্‌মাইস্ হ্যায়?

রাজকুমারী এবার মুখ ফেরালেন, তার পর একটি কথায় আমাদের দাদাকে দমিয়ে দিলেন—নহি।

দাদা ছাড়বার পাত্র নহেন। একটি কথা যখন বের হয়েছে, তখন দুটিও হবে। বুক চিতিয়ে দাঁড়ালেন, তার পর বললেন, খানা কামরেসে বয়কো বোলাউঁ ক্যা?

রাজকুমারী বললেন, নহি।

দাদা বেগতিক দেখে নিজের জন্য retiring room-এর দিকে চলতে লাগলেন। তিন চার পা চলার পর ফোস্কার যন্ত্রণা দারুণ হয়ে উঠল। রাগে আগুন হয়ে দামী নাগরা জোড়া পা থেকে খুলে টান মেরে লাইনের ওপর ফেলে দিলেন। তার পর সোজা বিশ্রাম-ঘরে গিয়ে প্রথমেই সেখানকার খানসামাকে অত্যধিক বখশিশ দিয়ে স্নানের ব্যবস্থা ক'রে নিলেন। জুতা জোড়া যে দামী, তা রাজকুমারী প্রথমেই লক্ষ্য করেছিলেন এবং ফেলে দেওয়ার ঘটনাটিও তাঁর অলক্ষ্যে হয়নি। ব্যাপারটি কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠল।

ছট্টুদার ফেরবার পথে দৃষ্টি রেখে রাজকুমারী দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ও লোকটাকে কলকাতা থেকে দেখছি, ও কে? দাসী বিনম্রভাবে উত্তর করলে, দরোয়ানজীর চেলা। অনেকদিন বাদে মুলাকাৎ হয়েছে, তাই সঙ্গে আসছে। বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে ফিরে যাবে। বিশ্বনাথ দর্শন করতে বহুদূর থেকে বহু লোকেই আসে ; সুতরাং অবিশ্বাস্য কিছু নেই। কিন্তু লোকটা যে সাধারণ দরোয়ানজাতীয় মানুষ নয়, সে বিষয়ে রাজকুমারীর কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না। গলার কণ্ঠি যদি নিরেট সোনার হয়, তা হ'লে শুধু একটি অঙ্গেই তিন চার হাজার টাকার গহনা প'রে আছে। হাতে হীরের আংটিও ছিল বোধ হয়। দামী জুতাটা টান মেরে ফেলে দিলে, কাকেও দেখাবার জন্যে নয়, কেবল নিজের ভাল লাগেনি বলে। রাজকুমারী কৌতূহলী হয়ে উঠছেন। যা হোক, যথাসময়ে ট্রেন ছাড়ল এবং উপযুক্ত সময়ে সকলকে কাশীধামে পোঁছিয়ে দিলে।

বারাণসীতে নেমে ছট্টুদা সকলকে বাড়ি পর্যন্ত পোঁছিয়ে জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবার অছিলায় সোজা ঝটকায় ক'রে একেবারে ক্যাণ্টনমেণ্টের সাহেবী হোটেলে গিয়ে উঠলেন।

তাঁর বেশ দেখে সাহেব বলল, ঘর তো ভাড়া হ'ল। তোমার মুনিব আসছেন কখন?

ছট্টুদা কোথায় কি ভাবে চলতে হয় জানেন। বিদেশী প্রথায় মাথা নত ক'রে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে বললেন, আমিই আমার মুনিব। উপস্থিত আমার ফরমাশগুলো যত শীঘ্র পার সেরে ফেল ; একটা আলাদা খনাসামা চাই।

মাইনে ঠিক ক'রে আমাকে জানাও। সবই এখুনি চাই। এই ব'লে প্রায় একশো টাকার নোট ম্যানেজারের হাতে গুঁজে দিলেন।

ম্যানেজার ভাবলে, লোকটা হয়তো ক্রাইম ডিপার্টমেণ্টের কোন জাঁদ্রেল কর্মচারী হবে। সরকারী কাজে তদন্ত করতে এসেছে। ব্যবসাদার সাহেবের টাকাওয়ালা মানুষ চিনতে সময় লাগেনি। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলে প্রতি কথায় গোড়ায় এবং ডগায় মহাশয় ব'লে সম্বোধন করাটা নিয়মে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। জানিয়ে দিলে, যে আজ্ঞা, হুকুম তামিল হবে। ম্যানেজার নিজে সঙ্গে ক'রে ছট্টুদাকে ওপরের ঘর দেখিয়ে দিলেন। বেশ প্রশস্ত ঘর। আসবাব সরঞ্জামও আধুনিক ধরনের। বসবার ঘরে এক কোণে টেলিফোনের ব্যবস্থাও আছে।

সাত আট দিন ছট্টুদা ঘরছাড়া। পিতাজীর কথা মনে আসছিল। বুড়ো নিশ্চয় চারধারে তাকে খুঁজে বার করবার জন্যে কাগজে ছবি ছাপিয়ে দিয়েছেন। তা একটু বুঝুন, ধাড়ী বয়সে এম-এ পড়া ছেলেকে চড় মারতে এলে ছেলে কি করবে? একটি কুকীর্তি ক'রে ফেলেছে, তাই মনকে খোঁচা মারছিল। বুড়ো ম্যানেজারকে ছুরি দেখিয়ে দশ হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তাকে বাঁচাবার জন্য স্বাক্ষরযুক্ত স্বীকারোক্তি পাঠিয়ে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু তা হ'লেও বুড়ো কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করলে, তার প্রতিই ছোট্টুদা অমন ব্যবহার করলেন! চুলোয় যাক—যা ঘটবার তা ঘ'টে গিয়েছে। এদিকে যার জন্যে পায়ের ফোস্কা ঘায়ে পরিণত হ'ল, কাঁধে মোট বইতে হ'ল, অনিদ্রায় ছারপোকার সঙ্গে রাত্রিবাস ঘটল, তিনি তো কোটপ্যাণ্টধারী ছোকরা-গুলোকে নিয়েই অস্থির।

ছোট্টুদা বাস্তবিকই ধৈর্য হারাচ্ছিলেন—কিন্তু দাদার কপাল ভাল। এই কদিনের ভেতর কয়েকটি ঘটনা উপরি উপরি এমনভাবেই ঘ'টে গেল, যার জন্যে তিনি রাজাবাবুর এখানে চাকরি পেয়ে গেলেন। মাইনে আঠারো টাকা—আপখোরাক।

দরোয়ানকে আমরা দরোয়ান ব'লে জানতাম। আসলে তিনি জমাদার। তাঁর অধীনে সাত-আট জন বরকন্দাজ কাজ ক'রে থাকে—ছট্টুদা একজন উপরি

বহাল হলেন।

ছট্টুদার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখে অন্য দরোয়ানরা চটেছিল। তা চটুক। জমাদার ইচ্ছা করলে যাকে খুশি তাকে তাড়িয়ে দিতে পারে। মুনিব এই দিক দিয়ে সাহেবী কায়দা মেনে চলেন। যে ঘটনাগুলির ওপর নির্ভর ক'রে তিনি রোমান্সযুদ্ধে নেমেছিলেন এবং যে যুদ্ধের পরিণতি আজ তাঁকে নিরন্তর নাক কান মলাচ্ছে, এবার সেই ঘটনাগুলি বলি—

কাশীধামে আসার তিন দিন পরেই বাইরের একজন পালোয়ান এসে রাজাবাবুর কাছে আর্‌জি করল, "হুজুর! ম্যাঁয় বহুৎ দূরসে অপকা নাম শুন্‌কর্‌ আয়া হুঁ। হম্‌কো লড়া দিজিয়ে।"

পালোয়ান রাখা রাজাবাবুর বংশের পুরাতন চাল। কিন্তু টেনিস, ফুটবল, ক্রিকেটের আমদানি হওয়ার পর থেকে কুস্তির ব্যাপারটা ঢিলা প'ড়ে গিয়েছিল। রাজাবাবু নিজেও এককালে কুস্তি লড়তেন। ছেলের ওদিকে তেমন স্পৃহা না থাকায়, মাইনে-করা পালোয়ানকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

রাজাবাবু টেনিস-কোর্টের সামনে ব'সে ব্র্যাণ্ডি পান করছিলেন। ছেলে-মেয়েরা খেলছিল। বাইরের অতি আধুনিক ধরনের পাৎলুন পরা দু-একজন যুবকও ছিলেন। যদুনন্দন সিং এসে বললে, এক পহলওয়ান আপকে সাথ মুলাকাৎ করনা চাহতা হ্যায়। তখন রাজাবাবু বাস্তবিকই তাকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। আদেশমত পালোয়ান সামনে এসে আখড়ার কায়দায় সেলাম করল। আর্‌জির কথা আগেই বলেছি। আর্‌জির কথা শুনে রাজাবাবু মনমরা হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে টেনিসের পুরা সেট শেষ হয়ে গিয়েছে। কোর্ট বদলের পালা। রাজকুমারী এবং তাঁর পার্টনার এসে রাজাবাবুর সামনে উপস্থিত হয়েছেন, যাবার পথে দু-একটি অবান্তর কথা ব'লে যাবেন ব'লে। রাজাবাবু কন্যাকে বললেন, লজ্জার কথা আমার বাড়িতে বাইরের পালোয়ান এসে লড়তে চায়, আর লড়বার লোক নেই। কথাটা শেষ হতেই ছট্টুদা সামনে এসে সেলাম করলেন। তার পর করজোড়ে বললেন, হুজুর ম্যঁয় মুস্তায়াদ হুঁ। হুকুম হো তো উস্তাদকা নাম লেকর অভি আখাড়েমেঁ উতর আউঁ।

পিতাকে অপমান থেকে যে বাঁচাতে চলেছে তাকে রাজকুমারী নিমেষে

দেখে নিলেন। কেন জানি না, তাঁর মায়া হ'ল। অতবড় মোষের মত চেহারার সঙ্গে যদুনন্দন কুস্তি লড়বে! তিনি বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। পিতা ছট্টুদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাজী মার সকোগে? ছট্টুদা বললে, হুজুর, আপকে ঘরমেঁ গোদা মজুদ হ্যায়। কিসি লড়নেওয়ালেকো লৌটানা অপমান হোগা। ম্যঁয় হুজুরকা গুলাম হুঁ। এক দঙ্গল হো জানে দিজিয়ে।

টেনিস খেলা বন্ধ হয়ে গেল। পাৎলুনধারী মহাপুরুষ প্রিমিটিভ গেমের কথা শুনে নাক সেঁটকালেন। রাজকুমারী ছেলেবেলা থেকে কুস্তি ইত্যাদি দেখে এসেছেন—তাঁর ভালই লাগে। এখনও তিনি তথাকথিত মার্জিতরুচি সমর্থন করতে শেখেন নি। একদিকে তিনি যেমন আনন্দিত হয়ে উঠছিলেন, অন্য দিকে তেমনই আশঙ্কা আসছিল। কুস্তিতে হাত পা ভেঙে যাওয়া অতি সাধারণ জিনিস। আকচে ঘ'টে থাকে। চেহারার দিক দিয়ে তুলনায় যদুনন্দন বাইরের লোকটির কাছে অতি ক্ষুদ্র। রাজকুমারী আবার ভাবলেন, তিনি বাধা দিলে এ কুস্তি কখনই হতে পারবে না। পরক্ষণেই তাঁর মনে হ'ল, নিশ্চয় নিজের শক্তির ওপর যদুনন্দনের বিশ্বাস আছে। তা না হ'লে ঐরকম আস্ফালন করতে পারে? যতই সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন, ততই তাঁর ভীতি বেড়ে উঠছিল। ছট্টুদা এই চাঞ্চল্য দেখে বুকটা ফাঁপিয়ে তুললেন। কুস্তিটা মন দিয়ে শিখেছিলেন। রাজাবাবুর মুখের দিকে এমন ভাবেই তাকিয়ে রইলেন যে, তিনি সম্মতি না দিয়ে পারলেন না, দেখবার লোভ তাঁর নিজের বড় কম ছিল না। কন্যার মতামতের জন্যে অপেক্ষা করা সম্ভব হ'ল না। আখড়ার দিকে এগুতে লাগলেন। তাঁর সাধের কশরতের স্থানটি কি রকম অবহেলায় পড়ে আছে! চারাগাছও জন্মেছিল। যদুনন্দন আসার পর চেহারা ফিরেছে। যাক্, তবু ভাল; একজন দরোয়ান অন্তত কশরৎ করে। মালীকে ডাকা হ'ল আখড়া কোপাবার জন্যে। ইতিমধ্যে কখন রাজকুমারী ও যদুনন্দন ভিড়ের পিছনে গিয়ে উভয়ে উভয়কে দেখে নিলেন। যদুনন্দন লেঙোটের ওপর জাঙিয়া চড়িয়ে প্রায় দিগম্বর হয়ে বৈঠক মারছে। বিদেশী কায়দা। সচরাচর দেশী কুস্তিগীররা ঐভাবে বৈঠক দেয় না। অত্যুজ্জ্বল গৌরবর্ণ ঘর্মাক্ত হওয়ায়, এক অঙ্গের জ্যোতি আর একটিতে ঠিকরে পড়ছিল। তার ওপর গঠনের অপূর্ব সামঞ্জস্য যেন দর্শককে আদেশ করছিল—দৃষ্টি

তোমার স্থির হয়ে যাক, নীতিবান হও—আচার্য হও, যে আসনেই তোমার বসবার স্থান থাকুক না কেন, আমাকে দেখে নয়ন সার্থক কর।

রাজকুমারী আধুনিকা হ'লেও কুস্তি দেখার অভ্যাস ছিল। তিনি যদুনন্দনকে শুধু দেখলেন না, দৃষ্টির দ্বারা মিনতি করলেন—এখন ক্ষান্ত হও। নারীহৃদয় একটি দুর্ঘটনার আশঙ্কায় আশঙ্কায়িত হয়ে উঠেছে, না, এরই ভিতর ছট্টুদা তাঁর ভেলকীবাজির খেলা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। যে কারণেই হোক উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় অর্থপূর্ণ ছিল। ছট্টুদা তাল ঠুকে আখড়ায় নেমে পড়লেন। খানিকটা মাটি হনুমানজীর পাথরের মূর্তির পদতলে ফেলে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। তার পর "রাজাবাবুকি জয় হো" ব'লে বিকট হুঙ্কারে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বান করলেন। আখড়ায় নামতেই তিনি যেন ক্ষণে ক্ষণে অধিকতর বলবান হয়ে উঠছিলেন। বক্ষ স্ফীত হয়ে বিরাটাকার ধারণ করেছে। কোমরটা ছোট হয়ে গিয়েছে; পেটের মাংসপেশীগুলি গোল গোল মাঝারি সাইজের পাথরের নুড়ির মত নিশ্বাসের সঙ্গে একবার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, আবার দৃশ্য হয়ে উঠছে। গলাটা যেন অশ্বত্থের গোড়া। কুড়ুল ব্যবহার করলেও অস্ত্র তাকে ক্ষত করতে পারে না। রাজকুমারী আড়াল থেকে ছট্টুদাকে দেখলেন। চোখে তাঁর জল। আনন্দাশ্রু হতে পারে কি?

প্রতিদ্বন্দ্বী বিপুল দেহ নিয়ে আখড়ায় নেমে এল। যেন একটি বিরাট হিপোপটেমাস দু পায়ে হাঁটছে। দুটি বাহু প্রসারিত ক'রে যখন সে যদুনন্দনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন মনে হয়েছিল, সে যদুনন্দনকে খেতে চলেছে মুখব্যাদান ক'রে। পান খাওয়া দাঁতগুলি ঘোরতর লাল, যেন রক্তশোষণই তার পেশা। ছট্টুদা সব সময়ই আততায়ীর দিকে তাকিয়ে ছিল। বুঝলে, লোকটি দেহের সমতা বাঁচাবার কোনরকম চেষ্টা করছে না। নিরবচ্ছিন্ন শরীরের ওজনের ওপর নির্ভর ক'রে পাশবিক শক্তি ব্যবহার করবে। তথাপি আর কিছু সময় পাঁয়তাড়া ক'রে দেখে নেওয়া ভাল, কোন্ চালে লড়বে। হঠাৎ হৈ হৈ ক'রে হিপো ছট্টুদার কাছে এসেই ভয়ঙ্কর শক্তিতে রন্দা কশিয়ে দিলে। ছট্টুদার কান ফেটে গিয়েছে। ঝরঝর ক'রে রক্ত ঝরছে। সেলামী নেবার পূর্বেই এই ঘটনা ঘটল। আখড়ায় এটা ঘোরতর বে-আইনী। রাজাবাবুও হিপোর ব্যবহারে রেগে উঠেছিলেন। কিন্তু নিজের বাড়ি এবং

অপরিচিত। ভদ্রতার আইন তিনি ভাঙতে পারলেন না। জমাদার চীৎকার ক'রে বলল, ওর নহি' বেটা। বাঁয়া পায়ার আপনে সামনে খ্যাঁচ লে—ঝট লে লে। জমাদারও অন্যায় করল। আখড়ার বার থেকে এরকম উপদেশ দেওয়া অন্যায়, জামাদার তা জানত। একজন যখন আইন ভাঙল, তখন আর একজন যদি সেই পথ অনুসরণ করে তো দোষ কেন হবে? উত্তেজনায় জমাদার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, রাজাবাবু কঠোর ভাবে আদেশ করলেন, চুপ রহো।

ছট্টুদা তখন মাটি নিয়েছেন। কাঁধের ওপর সাংঘাতিকভাবে হিপোর হাঁটু ঘর্ষিত হচ্ছে। দর্শকের ভেতর একজন ছিপছিপে টেনিস-খেলোয়াড় অকারণ এই দৃশ্যে পুলকিত হয়ে উঠছিলেন। অকারণ বলি কেমন ক'রে, তিনি রাজকুমারীর একজন পাণিপ্রার্থী। কিছুক্ষণ আগে যদুনন্দন ও রাজকুমারীর যে দৃষ্টি-বিনিময় হয়েছিল, তা উভয়ের অজ্ঞাতে র‍্যাকেটধারী ভাল ক'রেই দেখেছিলেন। ব্যাপারটা তাঁর ভাল লাগেনি।

একটি গোল লোহার বীমের মত হাত ছট্টুদার গলার নিচে যাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক এই সময় অকস্মাৎ হিপো শূন্যে উড়ে বাইরে ছিটকিয়ে পড়ল। পূর্ববর্ণিত র‍্যাকেটধারী হিপোর ওড়বার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। বেগবান বিপুল মাংসরাশির সামান্য ছোঁয়ায় টাল সামলাতে না পেরে তিনিও চিৎ হয়ে প'ড়ে গেলেন। সাদা প্যাণ্টলুন হিপোর দুর্গন্ধযুক্ত ও ঘর্মাক্ত কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। হিপো উঠল, চোখ তার শার্দুলের মত জ্বলছে। আবার দু বাহু রাক্ষসের মত প্রসারিত ক'রে ছট্টুদার দিকে এগুতে লাগল। ছট্টুদা তখন মৃদু হাসছেন। আত্মশক্তির প্রতি বিশ্বাস দেখে রাজাবাবু মুগ্ধ হয়েছিলেন। হিপোর হাত নাগালের মধ্যে পেতেই চকিতে তা ছট্টুদা বাম কাঁধের দিকে টানলেন—হিপোর সমস্ত দেহটা তাঁর পিঠের ওপর এসে পড়ল। তার পর চক্ষের পলক পড়বার পূর্বে বৃহৎ লাশটি মাটিতে ধরাশায়ী হ'ল। পরক্ষণেই দেখা গেল, আমাদের ছট্টুদা তার ওপর চ'ড়ে বসেছেন এবং দুটি হাতই উল্টিয়ে তারই পিঠের তলায় ঢোকাবার চেষ্টা করছেন। মনে হ'ল, কুস্তীর হারজিতের সিদ্ধান্ত এখুনি ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু হিপোর আসুরিক শক্তির কাছে দাদার প্যাঁচ টিকল না। এক ঝাঁকুনিতে দাদা ছিটকিয়ে পড়লেন।

এবার অসুর দাদাকে জুৎ-মত ধরেছে। দাদার মাথাটা মাটির ওপর দারুণভাবে ঘষছে। দাদা উপযুক্ত নিঃশ্বাসের অভাবে হাঁপাচ্ছেন। হয়তো এক্ষুনি দম বন্ধ হয়ে যাবে। শক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের সঙ্গে ভৌতিক ক্রিয়ার যেন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। দাদার দু হাতই বুকের তলায় চাপা পড়ছে—মুখ শুকনো ধুলোর ওপর ঘর্ষিত হচ্ছে—দম নেবার উপায় প্রতি মুহূর্তে ক'মে আসছে। এমনই সময় হিপো 'বাপরে' ব'লে তাঁর পাশে এসে পড়ল। পর মুহূর্তে দেখা গেল দাদা তার বুকের ওপর চেপে বসেছেন। হিপোর নড়বার চড়বার শক্তি নেই। প্যাঁচের সাহায্যে হাত পা দুই বেঁধে ফেলেছেন এবং ভেড়া যেভাবে গুঁতোয় সেইভাবে হিপোর চিবুকের তলা থেকে মাথার ব্রহ্মতালু দিয়ে সাংঘাতিকভাবে শক্তির দ্বারা ঢুঁ মারছেন। হিপোর ঠোঁট কেটে সামনের দাঁতের খানিকটা অংশ বার হয়ে পড়েছে। হিপো জড়িত গলায় বললে, ছোড় দে, বস কর, ছোড় দে।

রক্তস্রোত দেখে মানুষের অন্তরের পশু ক্ষেপে উঠেছে। সে সহজে ছাড়তে চায় না। ছট্টুদা চিবুকের তলা ছেড়ে কানের পাশে যে ঢুঁটি মারলেন, তাতে চোয়ালের নিচের অংশ খুলে গেল। হিপো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। দাদা হিপোকে ছেড়ে আখড়া থেকে উঠে আসতে পারলেন না। করুণ ও অস্পষ্ট উচ্চারণে রাজাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, ব্রাণ্ডি। রাজাবাবু আনন্দে অধীর হয়ে গিয়েছিলেন। নিজে উঠে ডিকেণ্টার ও গেলাস নিয়ে এলেন। নিজের গেলাসেই ব্র্যাণ্ডি ঢাললেন। কিন্তু আখড়ার ভেতর তো তাঁর যাবার উপায় নেই, পায়ে বিদেশী চামড়ার জুতো। ফিতে খোলবার সময় নেই। সামান্য বিলম্বে লোকটা অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, কন্যার দিকে তাকালেন। তিনি শুধু পায়ে খেলছিলেন। রাজকুমারী এগিয়ে এলেন—মদ্যপূর্ণ পাত্রটি নিয়ে আখড়ায় নামলেন। ছট্টুদা হাত বাড়ালেন, ক্লান্তিতে হাত কাঁপছিল। গেলাস ধরতে পারলেন না। রাজকুমারীর হাত ধ'রে তাঁর হাত থেকে সঞ্জীবনী সুধা পান করলেন। একবার, দুবার বহুবার চুমুক দিলেন। দুটি হাত যে ভাবে বদ্ধ হয়েছিল, তা কারও দৃষ্টি এড়াল না। কর্দমাক্ত র্যাকেটধারী ছটফট করতে লাগল। কারও সেদিকে লক্ষ্য নেই। দাদা উঠে বসবার চেষ্টা করলেন—পারলেন না, আখড়াতেই শুয়ে পড়লেন। চার-পাঁচজন দরোয়ান

শুধু পায়ে আখড়ায় ঢুকে উভয়কে বার ক'রে এনে শুশ্রূষার দ্বারা উভয়ের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। ছট্টুদার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাবাবুর খরচায় হাসপাতালবাসী হ'ল।

পরের ঘটনা তেমন উত্তেজক না হলেও জটিল বটে। সেই র‍্যাকেটধারী ছোকরা —যুবক বলে যৌবনকে খাটো করতে চাই না—যদুনন্দনকে তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ভদ্রসন্তানের এরকম গাত্রজ্বালা আসবার কারণ সেই হাত ধরা। জ্ঞান হারাবার সময় দাদা গেলাস ধরতে না পেরে রাজকুমারীর হাত ধ'রে ফেলেছিলেন। ছোকরার বিদ্বেষ ভাব ছট্টুদার কাছে শাপে বর হয়ে উঠল। বিকেলের অধিবেশনে যতই সে দাদাকে ফরমাশের সঙ্গে অযথা রূঢ় কথা বলতে থাকল, ততই তিনি রাজকুমারীর নিকট কৃপাপ্রার্থী হবার সুযোগ বেশী করে পে'তে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে এমন একটি সময় এল, যখন রাজকুমারী দাদার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলা সহনীয় ক'রে ফেললেন। ধীরে ধীরে অন্দরের পথটিও অবারিত হয়ে আসছিল। অবশেষে দরোয়ানির সঙ্গে ফায়ফরমাশ খাটাও নূতন কর্তব্য হিসেবে একই মাইনের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেল। ফরমাশ রাজকুমারী নিজে করতেন, সুতরাং বাজার-সরকারের উপরি-পাওনা মাঠে মারা যাচ্ছিল। তথাপি তিনি হৃষ্ট মনে ছট্টুদার সব কাজে তারিফ করতে লাগলেন। আমরা দাদাকে চিনি। অনুমান ক'রে নিলাম বাজার-সরকারের মতামত ছট্টুদা পুরা দাম দিয়ে কিনে ফেলছেন। সাবান, চুল আঁচড়ানো-চিরুনি কিংবা অন্য প্রসাধনের বস্তু আনতে বললে দাদা অতি কম দামে এত ভাল জিনিস এনে দিতেন যে, সারা ব্রহ্মাণ্ডের দোকান ঘুরলেও অত সস্তায় ওরকম ভাল জিনিস আর কারও পক্ষে আনা সম্ভব হ'ত না। মল্লযুদ্ধের পর তিনি রাজাবাবুর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সেই কারণে রাজকুমারী একলা হাওয়া খেতে বের হ'লে যদুনন্দনই গলায় কণ্ঠি প'রে সামনের সীটে ব'সে যেত। এ ছাড়া তার আদবকায়দা ভদ্রলোকের মত। সেই জন্যে রাজকুমারী নিজেই সঙ্গে নিতে ভালবাসতেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রাজকুমারী টেনিস না খেলে হাওয়া খাবেন ঠিক করলেন। ছোকরা নিয়মিত ভাবে যথাসময়ে হাজিরা দিয়েছে, তবু হাওয়া খাবার সংকল্প ফেরাতে পারেনি। রাগে গস্ গস্ করছিল। যতটা সম্ভব

নিজেকে সংযত ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, আমাকে রাস্তায় নামিয়ে দেবেন? অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজকুমারী রাজি হলেন। দাদা দরজা খুলে নিয়মিত সালাম দিলেন। ইংরাজীতে ছোকরা কি বলেছিল, দাদার তা বোঝবার কথা নয়, সুতরাং মহিলা উঠতেই দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। ছোকরা ধমক দিয়ে বললে, দরওয়াজা খোলো। নিরুপায় হয়ে দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে হ'ল। কিন্তু এমন ভাবেই খুললেন যে, হ্যাণ্ডেলটা ছোকরার ঠিক বক্ষস্থলের নিচে জোরে গিয়ে আঘাত করল। বক্সিং-এ মুষ্ট্যাঘাৎপ্রাপ্ত হ'লে যেরূপ দুর্বল পক্ষ কুঁকড়িয়ে যায়, সেই ভাবে ছোকরা কুঁকড়িয়ে গেল। দাদা আমাদের ঘুঘু ছেলে। ঘটনাটি সহজ করবার জন্যে অত্যন্ত নম্রস্বরে ছোকরার দিকে ফিরে বললে, মাফ কিজিয়ে।

বেদনা কিঞ্চিৎ কমতেই ছোকরা বিশুদ্ধ ইংরাজীতে এমন একটি গাল দিলেন, যার অভিধানসম্মত অর্থ, তুমি শূকরবংশোদ্ভূত। ছট্টুদার চক্ষু ক্ষণিকে রক্তিমাভ হয়ে উঠল। ঠোঁট চেপে ধরলেন—দন্তের সঙ্গে ঘর্ষণে কেটে গেল, কিন্তু একটিও বাক্য উচ্চারণ করলেন না। সহ্যশক্তি দেখে রাজকুমারী মুগ্ধ হলেন।

কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে নামবে ব'লেই ছোকরা গাড়িতে উঠেছিল। কিন্তু একতরফা প্রেম এমন গাঢ় হয়ে উঠেছিল যে, তার পক্ষে গাড়ি থেকে নামা সম্ভব হ'ল না। অধিকন্তু, রসরাজ রাজশেখরবাবুর ভাষায়, শীতকাল না হ'লেও ঘনীভূত হয়ে বসবার চেষ্টা যথাসাধ্য চলছিল। অপর পক্ষের উক্ত চেষ্টার কোনরূপ সমর্থনের লক্ষণ প্রকাশ পায়নি। দাদা আমাদের তা লক্ষ্য করেন নি, এমন নয়। মনে মনে হাসছিলেন, কেন তিনিই জানেন। মোটর বাঙালীটোলার মোড়ের কাছে আসতে কিঞ্চিৎ বেগ কমাতে হল। গাড়ির বেগ যেমনই কমা, অমনই দু পাশ থেকে দুটো ছোরাধারী যুবক উভয় পার্শ্বে ফুটবোর্ডের উপর দাঁড়িয়ে উঠল।—সঙ্গে যা কিছু আছে সব দাও।

কেউ কিছু বলবার আগেই ছোকরা চকচকে সোনার রিস্ট ওয়াচ খুলতে আরম্ভ করল। রাজকুমারী জোর গলায় ডাকলেন, যদুনন্দন! যদুনন্দন উত্তর দেবার আগেই পিস্তলের বজ্র নিনাদ সমস্ত আবেষ্টনীকে বিকট শব্দে আলোড়িত ক'রে তুলল। ফাঁকা আওয়াজ। গুণ্ডা দুটোর মধ্যে একজন রিস্ট

ওয়াচ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়েছে। অপরটি তখন ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে। যদুনন্দন তার বুকে পিস্তলের নল লাগিয়ে বললে, ঠহর যাও বচ্চা। তুমহারা জরা আদর সৎকার তো করলুঁ? এই ব'লে তিনি যে সময়টুকুর ভেতর দরজা খুলে রাস্তায় নামবার চেষ্টা করছিলেন, তার মধ্যে বুদ্ধিমান গুণ্ডা অন্তর্ধান হয়ে গেল।

লোক জ'মে গিয়েছে। কনস্টেব্‌ল রাজাবাবুর গাড়ি দেখেই চিনেছিল। গাড়ির ভেতর কে আছে জানবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। কায়দাদুরস্ত সেলাম ক'রে বললে, হুজুর ক্যা হুয়া? রাজকুমারী কিছু বলবার আগেই দাদা বললেন, কুছ নহিঁ। গুণ্ডে আয়ে থে। পিস্তোলকি আওয়াজ শুন্‌তেহি সব রফু চক্কর হো গয়ে।

যদুনন্দনের হাতে পিস্তল দেখে ছোকরা এইবার ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে লাগল। প্রথমটা মনে করেছিল কেউ নিকটে বাজি ফুটিয়েছে। যখন প্রমাণ হ'ল ওটা বাজির আওয়াজ নয়, পিস্তলের শব্দ এবং পিস্তল দরোয়ানই চালিয়েছে, তখন ভাবলে এবার বোধ হয় ঘুরে তাকেই তাগ করবে।

দরোয়ান রাজকুমারীর অনুমতি নিয়ে গাড়ি চালাতে বললে। রাজাবাবুর চাকর খানসামাগুলোকে যেন ছট্টুদা মন্ত্র দ্বারা বশ ক'রে ফেলেছেন। তাঁর যে কোন অনুরোধ আদেশের মতই পালিত হতে আরম্ভ হয়েছে। রাজকুমারী কিছুদিন ধ'রে এটা লক্ষ্য করছিলেন। মানুষটিকে জানবার জন্যে তাঁর কৌতূহল দারুণভাবে বেড়ে উঠছিল। কুস্তিতে পিতাকে অপমান থেকে রক্ষা, পরে পিস্তল চালিয়ে গুণ্ডার হাত থেকে রাজকুমারীকে বাঁচানো। লোকটা সামান্য দরোয়ান হ'লে পিস্তল পেল কোথা থেকে? নানা চিন্তায় রাজকুমারী অভিভূতা হয়ে পড়ছিলেন। এক মুহূর্ত আগে গুণ্ডার আক্রমণের ঘটনাটিও তাঁর চিন্তাস্রোতে ভেসে গিয়েছে।

ওদিকে ছোকরা রাজকুমারীর হাত চেপে ধরেছে। ভাবটা—আমাকে বাঁচাও। আমি ঐ লোকটাকে আর কখনও হুকুম করব না, কখনও গাল, বকব না ইত্যাদি। রাজকুমারী হাত সরিয়ে নিলেন। ছট্টুদা ঘাড় বাঁকিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। ভেতরের আলো নিভিয়ে দেবার অনুমতি চাইতে রাজকুমারী আদেশ করলেন, না। দাদা পুলকিত হয়ে উঠলেন, গাড়ি বাড়ি মুখে ফিরল।

গাড়ি থেকে নেমেই রাজকুমারী দাদাকে তাঁর সংগে নিজ কামরায় দেখা করতে বললেন। ছোকরা বেচারা হে'টে বাড়ি ফিরল।

ছট্টুদা ঘরে ঢুকতেই রাজকুমারী কপট কোপ প্রকাশ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সামান্য মাইনের চাকরি কর, পিস্তল পেলে কোথা থেকে? এই রকম একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, তা আমাদের দাদা পূর্বেই জানতেন, সুতরাং তিনি প্রস্তুত ছিলেন। পিস্তলটি রাজকুমারীর নিকট রেখে দিলেন। তারপর জোড়হস্তে বললেন, হুজুর! ইয়ে খেল্‌নে কি চিজ হ্যায়। ইস্‌কে লিয়ে লাইসেন্স জরুরি নহিঁ, ম'্যয়তো মুসাফিরকি তরহ্‌ ঘুমতা রহতা হুঁ। উস্‌লিয়ে দুশমনোকো ডরানেকে লিয়ে ইয়ে খরিদ রখ্যা হ্যায়। দশ রূপেয়া ইসকা দাম, জ্যাদ্যা নাহিঁ হুজুর।

রাজকুমারী নকল পিস্তলটি নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। বহিঃদৃশ্য বড় পিস্তলেরই মত। কিন্তু টোটা ভরবার চেম্বার কেবল সাজানো ব্যাপার। রাজকুমারী পরীক্ষা শেষ ক'রে মৃদু হাসলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আসলে কে?

ছট্টুদা বলল, হুজুর, আমি আপনার দাস।

রাজকুমারী বললেন, সে তো মাইনের সংগে যতদিন সম্বন্ধ। আসলে আপনি কে? রাজকুমারী অকারণ ভাঙা বাংলায় শেষের প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলেন। দাদা পূর্ববৎ আবার বললেন, হুজুর, আমি আপনার গোলাম। রাজকুমারী এমন একটি কাতর দৃষ্টিতে দাদার দিকে চাইলেন, যার অর্থ সোজা—'কেন ভাঁড়াচ্ছ। বল, তুমি দরোয়ান নও।' দাদার এইবার পালোয়ানী চাল ঝিমিয়ে আসছে। তিনি বাংলাতেই উত্তর করলেন, আমি গরিব। আমাকে 'আপনি' ব'লে সম্বোধন করছেন কেন? আমি অতি সাধারণ লোক।

রাজকুমারী বললেন, কিছু যদি মনে না করেন, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি জাত? আপনার বাড়ি কি কলকাতাতেই?

ক্ষত্রিয়ানীর মুখে ভাঙা বাংলায় যেন অমৃত বর্ষণ হচ্ছিল। ছট্টুদা ঝিমোন অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে ভেড়া বনতে আরম্ভ করলেন। (ফোটো থাকলে তুলনার জন্য পাঠককে দেখানো যেত, ছট্টুদার এখনকার মুখশ্রী ও যখন তিনি হিপোর সংগে কুস্তিতে জয়ী হয়েছিলেন, তখনকার মুখের অবস্থা।) দাদা এখন

ছুছুন্দরও নয়, একেবারে কেঁচো হয়ে যাচ্ছেন। ঐ রকম একটি বিরাট শক্তিমান ও সুদর্শন পুরুষ—অসমসাহসী, প্রার্থিত পাত্রীর সামনে কি অবস্থা হয়ে গিয়েছে! প্রেমের মায়াজালের পরিণাম ভাবতে গেলে পুরুষের জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়তে হয়।

দাদা বললেন, হুজুর, জাতিতে আমি আড়াই ঘরের ক্ষত্রিয়, পেশা চাষের জমিবিলি। চাষাও বলতে পারেন।

রাজকুমারী বললেন, আপনি যে চাষা নন, তা আমি জানি। এখানে চাকরি নেওয়ার উদ্দেশ্য আমাকে জানাবেন?

দাদা বললেন, হুজুর, আমাকে যাই ভাবুন, দোহাই সি-আই-ডি ভাববেন না। আমার কোন পুরুষ কোতোয়ালীতে চাকরি করেনি। দোহাই হুজুর, আমাকে সামান্য একটা দারোগা বানাবেন না।

রাজকুমারী হাসলেন। হাসির সঙ্গে দু ফোঁটা চোখের জল গণ্ড ব'য়ে পড়ল। ছট্টুদা তা দেখলেন। তারপর মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

রাজকুমারী বললেন, আপনি যা মাইনে পান, তাতে আপনার কুলোয়?

দাদা বললেন, চ'লে যায়।

রাজকুমারী বললেন, মাইনে বাড়াবার কথা আপনি আমাকে তো কখনও বলেন নি।

দাদা বললেন, চ'লে যাচ্ছিল। তা ছাড়া সবে বাহাল হয়েছি। এরই মধ্যে মাইনে বাড়ানোর কথা বললে হয়তো তাড়িয়ে দেবেন। আমি মাইনের জন্যে তো এখানে কাজ নিই নি। রাজাবাবুর এখানে কাজ করি, এইটেই তো আমার পক্ষে মস্তবড় সম্মান।

রাজকুমারী বললেন, আপনার ধারণা এত সুন্দর যে, মনে হয় আসলে আপনি বাঙালী।

দাদা বললেন, বাঙালী ব'লে যদি কেউ মানে, তা হ'লে গৌরব বোধ করি। সমগ্র ভারতে এত বড় জাত আর আছে? সাহিত্য শিল্প রাজনীতি যাই বলুন, বাঙালীই অন্য দেশবাসীদের এগিয়ে চলার পথ দেখিয়েছে। যদি এত বড় সত্য তারা না মানতে পারে, তা হ'লে বলব মানুষগুলো অকৃতজ্ঞ। আমি বাংলায় জন্মেছি, বাংলার বুকে মানুষ হয়েছি, জমিজমা যা আছে তাও বাংলায়।

সুতরাং নিজেকে বাঙালী ভাবতে পারলে খুশি হই।

ইতিমধ্যে ঝম ঝম ক'রে বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টিপতনের শব্দে দাদা পুনর্জীবন লাভ করলেন। 'যাক প্রাণ থাক মান' পণ ক'রে ব'লে ফেললেন, আপনার কাছে আমার একটি আর্‌জি ছিল।

রাজকুমারী বললেন, কি?

দাদা বললেন, আমি উপরি দরোয়ান, আমার চাকরি বেশি দিন থাকবে কি?

প্রশ্নের ভিতর জটিলতা হয়তো ছিল। কিন্তু সোজা অর্থ করলেও রাজকুমারীর পক্ষে সঠিক উত্তর দেওয়া তখন সম্ভব হয়নি, কারণ দরোয়ান বাহাল করা না-করা ম্যানেজারের উপর নির্ভর করে। তিনি কথাটা ঘুরিয়ে বললেন, আপনি যদি আমার নিজের দরোয়ান হন, তা হ'লে ভরসা দিতে পারি।

দাদা বললেন, যদি, হুজুর, তাই আমি বেছে নি?

রাজকুমারী বললেন, তবে চিরকাল আমার কাছে থাকবেন।

দাদা মাথা চুলকিয়ে বললেন, অনেক জয়গায় ঘুরেছি। এখন একজনকেই মালিক করতে চাই। আমার বেয়াদপি মাফ করবেন। ঐ ভদ্দর আদমিকে সাথ আপনার শাদি যখন হয়ে যাবে, তখন আমি কোথায় যাব, আমার অবস্থা কি হবে?

রাজকুমারী বললেন, ওঁর সঙ্গে আমার শাদি হবে, আপনাকে কে বললে?

প্রভু ও ভৃত্যে এই রকম কথোপকথন অশোভনীয় ভেবে রাজকুমারী অবান্তর প্রসঙ্গ আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু দাদা তখন মজেছেন। মজেছেন কেন বলি, একেবারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছেন। যে ভাবে 'ঘোমটা ঘোমটাই সই' ব'লে ট্রামে উঠেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে 'যা থাকে কপালে' ব'লে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অন্তরে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে গেল—আজ এবং এখুনি, নয় কখনও নয়। দাদা চুপ ক'রে আছেন দেখে রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করলেন, আমার বিশ্বাস, আপনি লেখাপড়া করেছেন।

দাদা বললেন, আপনার কাছে লুকোব না। যৎসামান্য করেছি।

রাজকুমারী বললেন, আচ্ছা, বলতে পারেন, আপনাকে কেন সামান্য

দরোয়ান ভাবতে পারছি না?

দাদা বললেন, পারেন যদি আমাকেও ভদ্রলোক ব'লে বিশ্বাস করবেন এবং আশা করি, যা বলব তা আপনার কাছেই গোপন থাকবে।

রাজকুমারীর যে কোন উচ্ছ্বাস তীব্র হয়ে উঠলে তাঁর চোখে জল এসে পড়ে। দাদার বাক্যে কিছুই ছিল না। কিন্তু রাজকুমারীর চোখ জলভারাক্রান্ত হয়ে এল। যদুনন্দনের মুখ থেকে এর পর কি বের হবে জানবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। যদুনন্দন তখন মাথা নিচু ক'রে আছে। রাজকুমারী অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আবার প্রশ্ন করলেন, আপনাকে দরোয়ান ভাবতে ইচ্ছে করে না কেন বলুন। আমি শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছি। আপনাকে ভদ্রলোক না জানলে এই ভাবে কথা বলতাম?

দাদারও চোখে তখন জল। ব্যাপারটার ভেতর রসিকতা অথবা অবজ্ঞার কোন কিছু নেই। রাজকুমারীর সামনেই তিনি ভেতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। কোন আপত্তি এল না। তারপর যে সব ঘটনা ঘটেছিল, তা আমরা প্রকাশ্যে দেখতে অথবা শুনতে চাই না, কারণ, রাজকুমারীকে নিজেকে বাগ্‌দত্তার প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ ক'রে ফেলেছেন।

...গল্পটি এইখানেই শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু রোমান্স করলেই তো হয় না। তাহার তাল সামলানো একটি সঙ্কট ব্যাপার। দাদা এদিক দিয়া রেহাই পান নাই। পরের দিন সকালবেলা দাসী কতকগুলি টাটকা হিঙের কচুরি একটা ভাঙা কানা-উঁচু থালায় লইয়া আসিয়াছে এবং সাবধানতা অবলম্বন করিয়া দাদাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। স্থানটি নিরাপদ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। উপরতলার বারান্দায় যে রাজকুমারী পায়চারি করিতেছিলেন, তাহা আর আমাদের দাদা কেমন করিয়া জানিবেন। কচুরির প্রতি আজ বিশেষ স্পৃহা না থাকিলেও যাহার কৃপায় এ কয়দিন ভেলিগুড় ও পোড়া রুটি খাওয়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তাহার প্রতি হঠাৎ রূঢ় হওয়া যায় কেমন করিয়া? গতকাল সকালেই তো উহারই উপর একরাশ চাটুবাক্য উজাড় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। একটু মুচকি হাসিয়া অগ্রসর হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় একটি ছায়া দেওয়ালে দেখিলেন। দাদা আমাদের

পাকা শিকারী। বিপদের আশঙ্কা তিনি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করিয়া থাকেন। ছায়া দেখিয়াই তিনি দাসীকে ধমক দিয়া উঠিলেন, কেঁও রে নমকহারাম। কচৌড়িয়াঁ চোরি করকে তু কহাঁ ভাগ রহি হ্যায়? চল্‌ অভি তুঝে রাজকুমারীকে পাশ লে জাউংগা। তনখাতো দশ রুপয়া আউর বিবি খায়েঙ্গী ফুলী ফুলী কচৌড়িয়াঁ। চল্‌ তুঝে নহিঁ ছোড়তা। ছায়াটি যে রাজকুমারীর তাহা দাদা বোধ হয় ঘ্রাণ দ্বারা অনুমান করিয়াছিলেন। দাসী কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া গিয়াছে। এ কোন্‌ দেশী অকৃতজ্ঞতা! পুরা এক পক্ষ ধরিয়া মানুষটাকে টাটকা ভাজা কচৌড়ি, হালুয়া ইত্যাদি খাওয়াইয়াছে—রাজকুমারীর বোতল হইতে সুগন্ধি তেল সরাইয়া যদুনন্দনকে মাখিতে দিয়াছে। রাত্রির ভোজনে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া কুক্কুটের কোর্মা আনিয়া দিয়াছে, আর সেই কিনা—দাসী ক্ষোভে কাঁদিয়া ফেলিল। ভক্ষণীয়-গুলি সেইখানেই মাটিতে ফেলিয়া অন্দরমহলের দিকে ফিরিয়া গেল। ছায়ার মালিক কে, তাহা জানিবার জন্য যে দাদার কৌতূহল আসে নাই তাহা নহে, তবে উপরের দিকে তাকাইবারই সাহস তখন তাঁহার ছিল না। কি জানি ছায়া যদি তাঁহার আরব্ধ দেহটির হয়। একটি ফাঁড়া কাটিল।

ঝিয়ের পালা কাটিয়া যাওয়ার পর দাদা ভাবিলেন—যাক ফাঁড়া কাটিল। যে বারদোষ লইয়া জন্মিয়াছে, তাহার ফাঁড়া কাটা কি যে-সে কথা?

পরের ঘটনা। সেদিন ভাবী বউদিকে পাশে বসাইয়া যৌবনের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করিতেছিলেন কোন একটা সিনেমায়। ছবি আরম্ভ হইতে সামান্য দেরি আছে, এমন সময় খটমট করিতে করিতে একটি আধা-বিলাতী মেম নিকটে আসিয়া বলিলেন, সেদিন হোটেলে বিলের টাকা দিয়ে আমার কি উপকারই না করেছিলেন, তারপর বাড়ি পর্যন্ত লিফ্‌ট্‌—আপনাকে শত ধন্যবাদ। ছট্টুদা তখন মরিয়া শুনিতেছিলেন, কি বাঁচিয়া মরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, অন্তর্যামীই জানেন। আমরা দেখিলাম, ছট্টুদা মহিলাকে অভ্যর্থনা অথবা সম্মান দেখাইবার জন্য উঠিলেন না তো বটেই, অধিকন্তু অবলীলাক্রমে মুখটি অন্যদিকে ফিরাইয়া রাখিলেন। ধন্যবাদ দিতে আসিয়া কালা আদমির নিকট এইরূপ ব্যবহার পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাইবার কথা নয়। হঠাৎ তিনি রাইট্‌ অ্যাবাউট টার্‌ন্‌ করিয়া সশব্দে খটখটে হাই-হিল জুতা

মেঝেতে ঠুকিয়া বলিলেন—'What a cad!' তাহার পর চলিয়া গেলেন। ঘটনাটির গোড়ার কথা পরে বলিতেছি। উপস্থিত দাদাকে সামলানো দরকার। প্রায় পঞ্চাশ ইঞ্চি ছাতি চুপসিয়া ছোট্ট পারাবতবক্ষ হইয়া গিয়াছে। ভাবী বউদি কিছুই বলেন নাই—কিছুই জিজ্ঞাসা করেন নাই। তথাপি দাদা আমাদের কি ভাবে মুষড়াইয়া গিয়াছেন, তাহার বর্ণনা দিয়া ভদ্রলোককে লজ্জিত করিতে চাই না। আধা-মেম কেন আসিয়াছিলেন বলি।

দ্বিপ্রহরে ছট্টুদা সাহেবী কায়দায় হোটেলে লাঞ্চ খাইতেন। বখশিশের তাড়নায় স্বয়ং ম্যানেজার তাঁহার টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া পুরুষ পিসীমার মত এটা খান ওটা খান বলিতেন। কচুরির ঘটনার দিনই সেই ছোকরা একটি হাল ফ্যাশানের মাংসল স্ত্রীলোককে লইয়া হোটেলে খানা খাইতে আসিয়াছিলেন। ছোকরা বিলাতফেরতা। সুতরাং দেশী ভাষায় কথা বলা তাঁহার পক্ষে মান-হানিকর আচরণ। বাটলারকে খানার হুকুম করিয়া ছট্টুদার পাশের টেবিলেই বসিলেন। কথাতেই আছে 'স্বভাব যায় না মোলে—ইল্লৎ যায় না ধুলে'। রাজকুমারী আমাদের ভাবী বউদি হইলে কি হয়। মাংসল গঠন দেখিয়া দাদা উসখুস করিতে লাগিলেন। ভিন্ন টেবিল হইলেও উভয়ে মুখোমুখি বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে চোখাচোখির গোড়াপত্তনে সেয়ানায় সেয়ানায় বোঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে। Safety first অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেই বাসনা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। ঘন ঘন দৃষ্টি বিনিময় হইতেই ছোক্‌রা আকর্ষণের কারণ জানিবার জন্য পিছন ফিরিল। ফিরিয়া দেখিল, এ তো সেই দরোয়ান। র‍্যানকিনের বাড়ির মোটা রেশমের শার্ট সর্বদেহে লেপটিয়া ধরিয়াছে। মুখের তলায় ও গঠন তো লুকাইবার উপায় নাই। অল্প সময়ের ভিতর ছোক্‌রার কাঁপুনি দেখা দিল। গত রাত্রির ঘটনার কথা ভাবিয়া ত্রাসে গলা শুকাইয়া গিয়াছিল। খাদ্যের পরিবর্তে পরের পর দুই প্লাস জল খাইয়া ফেলিল। মেয়েটিকে, 'এখুনি আসছি' বলিয়া উঠিয়া পড়িল। সেই যে গেল, আর দেখা নাই। শিকার ধরিবার সময় যেমন তিনি ধূর্ত ও ভয়ঙ্কর ঘড়িয়াল কুমীরের মত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, সেইরূপ শিকার ধরিতে পারিলে তাহাকে কাবু করাটাও তাঁহার নির্বিবাদে চলিতেছিল। ইতিমধ্যে মেমের টেবিলে বিল আসিয়া উপস্থিত,

অথচ মহিলাকে যিনি নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, তিনি সশরীরে সরিয়া পড়িয়াছেন। বিলের টাকা দেয় কে? সাহেবী কায়দায় দোরস্ত দাদা উঠিয়া মহিলাকে বলিলেন, আপনার সঙ্গীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,—আপনার এখানে অ্যাকাউন্ট না থাকলে ভদ্রলোকের হয়ে আপনার বিলটা আমি চুকিয়ে দিতে পারি? মহিলার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দাদা বিলের উপর নিজের নাম সই করিলেন। তাহার পর মহিলার সামনে বসিয়া পড়িলেন, নিজের অদ্ভুত পরিচয় দিলেন এবং অল্পক্ষণের ভিতর আলাপ জমাইয়া ফেলিলেন। ফল পাইলেন প্রচুর। গা ঘেঁষিয়া বসিয়া তাঁহার বাড়ি পর্যন্ত পোঁছাইয়া দিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বিজয়ীর ভাব আসিতেছিল। কিন্তু সকালের কচুরির কথা মনে পড়িতেই দমিয়া গেলেন। তখনকার মত কোন প্রকারে সামলাইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ঝি যদি ব্যাপারটা ফেনাইয়া তুলিয়া থাকে, তাহা হইলেই তো চমৎকার! রেজেস্ট্রী করিয়া বিবাহ হইবে। তাহারও তো দশ-বারো দিন বাকি। সবে নোটিশ ঝুলানো হইয়াছে। ইহারই মধ্যে একটা সাধারণ ঝি তাঁহার এতবড় সাধনা পণ্ড করিয়া দিবে? অসম্ভব। দাদা দরোয়ান সাজিয়া মাহিনা হিসাবে ভাড়া করা মোটরে উঠিয়া পড়িলেন।

রাজাবাবুর বাড়িতে আসিতেই উপরে ডাক পড়িল (চোরের মন পুঁই আদাড়ে)। মাথায় হাত দিয়া বহুকষ্টে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন।

ঘরে ঢুকিতেই ভাবী বউদি সেই মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া চমৎকার উচ্চারণে ইংরেজীতে বলিলেন, যথেষ্ট ধন্যবাদ, আমাকে সিনেমা দেখিয়েছেন ব'লে। পরক্ষণেই আপনি তুমিতে নামিয়া আসিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐরূপ কয়টি মহিলার খাওয়া-দাওয়ার ভার গ্রহণ করেছ?

দাদার বলিবার কিছু নাই। কেবল ভয় পাইতেছিলেন হয়তো বা এইবার কচুরির কথা উঠিবে।

ভাবী বউদি কোন উত্তর না পাইয়া বলিলেন, কাল থেকে আর এখানে এস না। দাদা অবাক হইয়া গেলেন—এই সামান্য কারণে এত বড় শাস্তি! করুণ ভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলেন। আদেশটা দৃঢ় বলিয়াই মনে হইল, সুতরাং শাস্তিটা সমস্ত জীবনের জন্য, না একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জানা দরকার।

দাদা বলিলেন, অতদিন তোমাকে না দেখে—কথাটা শেষ হইতে পাইল না। ভাবী বউদি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তোমার চাউনি দেখেই বুঝেছিলাম তুমি গোড়া থেকেই ঐ রকম। কাল তোমার বাবুজী এখানে এসে উঠছেন— আমাদের বিয়ের কথাবার্তা নাকি ছয় মাস আগে থেকেই চলছে। আমার বাপ, মা, দাদা বাড়িশুদ্ধ সকলেই জেনে গেছে, এখন আর দরোয়ান সেজে কি

ঘৃতভোম্‌ মানে কি ছট্টুদা?

হবে? তা ছাড়া বিয়েটাও হবে হিন্দুমতে। মা তাই বললেন। এ কটা দিন আর এস না। বাইরে থেকে আত্মীয়স্বজন আসতে আরম্ভ করবেন, তা ছাড়া তোমার বাবুজী অন্য বাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত তুমি এখানে আসবে কেমন ক'রে? বিয়ের আগে তুমি এখানে ঘোরাঘুরি করছ জানতে পারলে তোমার

বাবা চ'টে যাবেন না? হাজার হোক তুমি বর তো? নিমন্ত্রণ না করলে শ্বশুরবাড়ি আসতে আছে?

দাদা বলিলেন, আমার বাবুজী জানলেন কেমন ক'রে যে, আমি এখানে আছি।

ভাবী বউদি বলিলেন, এখানে না। তোমার হোটেলের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি। মাথা টিপছ কেন—কি হ'ল আবার?

দাদা ভাবিলেন, এ সুযোগ ছাড়া নয়। বলিলেন, ভয়ানক মাথা ধরেছে। ভাবী বউদি তখনকার মত ঘরে থাকিতে দিয়াছিলেন এবং যদি শুশ্রূষা করিয়া থাকেন তো কিভাবে করিয়াছিলেন আমরা জানিতে পারি নাই। এইটুকু জানি, ছটুদার এখনও তেত্রিশ বৎসর বয়স। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া তিনি পৌত্র পৌত্রী লইয়া সংসার করিতেছেন। এই সংসারের গোড়াপত্তনে যে রোমান্স ঘটিয়াছিল, তাহারই পরিণাম এখন দাঁড়াইয়াছে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।'

নরনারায়ণ এতটা বলিয়াছেন, এমন সময় ছটুদা 'ঘৃতভোম্' বলিয়া আবার ঘরে ঢুকিলেন। ইতিমধ্যে তিনি একটি গাঢ় নিদ্রা শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

সকলেই বলিলেন, স্বাগতম্ দাদা।

সবই শোনা গেল, কিন্তু ঘৃতভোম্ শব্দের মানেটা কি? দাদা উত্তর করিলেন, সব কুত্তা কাশী যায় হাঁড়ি চাটে কোন্? ওটা রোমান্স জয়ঢাকের বোল। যেমন তবলায় থাকে—তেরে কেটে ধিন-না। তোমরা সকলে যদি ঘৃতভোমের মানেটা জেনে ফেল, তা হ'লে রোমান্স মাঠে মারা পড়বে। দুর্গা শ্রীহরি ঘৃতভোম্! আর এক পেগ দাও হে।

পালিশ ও ভোঁতা

(নক্ত-বৈঠকের একটি অধিবেশন)

সেদিন চায়ের আসরে ললিতাকে লইয়া দারুণ আলোচনা চলিয়াছিল। চোয়ালের অন্তিম প্রান্তে স্যাণ্ডউইচের অবশিষ্ট অংশটা বলপূর্বক প্রবেশ করাইয়া মিস ডাট বলিলেন, তোমরা ওকে 'জেম' 'ডার্‌লিং' যাই বল না কেন, আমার মতে শি ইজ রিজিড্‌লি অব্‌স্টিনেট।

মিস বোনার্জি রসাল তর্কে যোগ দিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন ; কিন্তু আন্তরিক টানটা তখন ঝুঁকিয়াছিল তেপায়ায় রক্ষিত রোল্‌ড-পাফের দিকে। খাদ্য ও তর্কের টানা-পোড়েনে দেখা গেল, মাংসবহুল হাতটা প্লেটের চারিধারে দম-দেওয়া যন্ত্রের মত চরিয়া বেড়াইতেছে। ইতিমধ্যে পক্ষপাতিত্বের আতিশয্যে প্লেট যে খালি হইয়া গিয়াছিল, সেদিকে লক্ষ্য করিবার সময় ছিল না! শিকারী হাতটা প্লেটের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শূন্য প্লেটে মোটা মোটা আঙুলগুলি কাঁকড়ার দাড়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া গৃহকর্ত্রী অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। বিলাতী পিষ্টক সামনে না পাইয়া কতকগুলি স্বদেশী রসাল মালপোয়া তাহাতে রাখিয়া দিলেন। প্লেট ভরাট হইয়া উঠিল ইস্ট ও ওয়েস্টের অপূর্ব মিলনে।

এই চিত্তাকর্ষক 'মিস' শব্দটির সহায়তায় বোনার্জি দীর্ঘকাল বয়সকে আড়াল দিয়া আসিতেছেন। কানাঘুষায় শোনা যায়, ভ্রূ-উৎপাটন হইতে আরম্ভ করিয়া কানের পাশে চুলের বিঁড়ার সাহায্যে বাহ্যিক আকৃতি এমন ভাবেই খাড়া করিয়া তুলিতেন যে, ফ্যাশানের উৎকট ঝাঁঝে বহুবার নাকি তরুণের দল ফাঁকিতে পড়িয়াছিল।

তর্ক এখন ঠিক জমাট বাঁধিতে পারে নাই দুইটি প্রাণীর অভাবে। তাঁহারা সদ্য-বিলাতপ্রত্যাগত মিস ডস ও তাঁহার নবনির্বাচিত সর্বকনিষ্ঠ ফিয়াঁসে।

'ডস' শব্দটির উৎপত্তি দাস হইতে। বিলাত গমনের পূর্বে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত পদবীর সংস্কৃতির প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পরেও

তিনি ডস থাকিয়া গিয়াছেন।

ফিয়াঁসে বিলাতে আইন পরীক্ষা দিতে গিয়া নৃত্যকলাবিদ হইয়া ফিরিয়াছিলেন। জনরব ফক্সট্রট, ওয়াল্‌ৎস, ল্যাম্বেথ ওয়াক, এমন কি জ্যাজ পদচালনে খাঁটি ওস্তাদের সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। এখানকার সাহেবরা উক্ত খ্যাতি মানিয়া লইয়াছিলেন কি না জানিবার উপায় ছিল না, কারণ তাঁহাদের কৌলীন্যপ্রথা অত্যন্ত কড়া। নিজেদের সমাজের বাহিরে তাঁহারা পারতপক্ষে মিশিতে চান না। যাহা হউক, ফিয়াঁসের পারদর্শিতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়া লাভ নাই। বল-নৃত্যে প্রতি অঙ্গ তরে প্রতি অঙ্গ কাঁদাইয়া তিনি ফিয়াঁসের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

নৃত্যের অছিলায় জনতার মাঝে পরস্ত্রীকে জাপ্টাইয়া ধরাটা প্রাচীন-পন্থীরা অনেক সময় মনে মনে সমর্থন করিলেও প্রকাশ্যে সন্দেহজনক ব্যাপার মনে করিতেন, ইহা অবশ্য ভিন্নসমাজভুক্তদের মতামত। পাশ্চাত্যপন্থীরা ঠিক এই কারণে গোঁড়াদের জেলাস বলিতে ছাড়েন না।

ফিয়াঁসের পিতা নিতান্তই কালা বাঙালী সাহেব। লোহার কারবারে হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন, ফলে ছাদ ফুটা হইয়া স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছিল—এখন তিনি রাজকোষের গভর্নর। ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স ও বল নৃত্যের সুবর্ণসুযোগে গভর্নর-সুত সামান্য চেষ্টাতেই ফিয়াঁসের পদে অভিষিক্ত হইতে সমর্থ হন। ইহা মিস ডসের তৃতীয় বার পাকাদেখার ইতিহাস।

মিস ডাট ললিতা সম্বন্ধে আর কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া জানাইল, মিস ললিতা একজন ধুতি-পরা বাবুকে লইয়া আসিয়াছেন। খবরটা উৎকট নোংরা গন্ধের ঝাঁঝযুক্ত মনে হইল। মিসেস রায় বিপন্ন হইয়াই বলিলেন, এখন উপায়?

মিস ডাট বলিলেন, উপায় আর কি আছে, এখন চেষ্টা ক'রে ভদ্র হও, আমি তো ব'লেই ছিলাম—শি টেক্‌স দি ল ইন হার ওন হ্যান্ড্‌স। এই লোকটা নিশ্চয় সেই বয়-ফ্রেন্ড। ফ্লার্টিং একটা ফাইন আর্ট, তাই ব'লে ঐ লোকটার সঙ্গে! ধুতি-পরা প্রিমিটিভ বাঙালী জমিদার, হোম এডুকেশন নেই, স্টুপিডি্‌লি ডাল, এটা একেবারে বাড়াবাড়ি ইফ নট অ্যাব্‌সার্ড।

ললিতার বয়-ফ্রেন্ডের কথা শুনিয়া মিস বোনার্জি উসখুস করিতেছিলেন,

এমন সময়ে বেয়ারা আসিয়া জানাইল, মিস ললিতা একজন ধুতি-পরা বাবুকে লইয়া আসিয়াছেন

কারণ তিনি জানিতেন ললিতা কখনও গোলমেলে জিনিষ বাছে না। এই কারণেই মিস বোনার্জি ললিতাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। বয়-ফ্রেণ্ড দেখিবার আগ্রহে তাঁহার মালপোয়া খাওয়া বন্ধ হইল। প্লেটের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই আঁতকাইয়া উঠিলেন। ওমা, এ যে মালপো! ছি, একটা ফিংগার-বোল দিতে বল।

ফিংগার-বোল আবার নিষ্ঠাবান চায়ের আসরে আসা নিষিদ্ধ। এত বড় অনাচারের কথা মিস বোনার্জি উচ্চারণ করিলেন কেমন করিয়া, তাহা ভাবাও মিসেস রায়ের পক্ষে ধর্মবিরুদ্ধ। সব দিক তাড়াতাড়ি সামলাইতে গিয়া মিসেস রায় বলিয়া ফেলিলেন, তা হোক, তবু দাও। মিস বোনার্জি আপত্তি জানাইবার পূর্বেই দেখা গেল, ললিতা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়াই বলিতেছে, হিয়ার আই অ্যাম, বড্ড দেরি হয়ে গেল—আই অ্যাম ফ্রাইটফুলি সরি ; মিট মাই ফ্রেণ্ড—মিস্টার মিস্টার—কার্স মাই মেমারি—ও ইয়েস, পেয়েছি, মিস্টার ডেবেন্দ্র—আই হোপ আই অ্যাম করেক্ট।

মিস ডাট বলিলেন, বন্ধুর নাম ভোলাটা এই কি তোমার প্রথম কাজ?

দেবেন্দ্রকে দেখিয়া মিস বোনার্জি তাঁহার পেটেণ্ট শাড়ির সুতাটি বাম হস্তে টান মারিলেন। সংগে সংগে উড়িয়াদের পানের বটুয়ার মত কাপড়ের ভাঁজগুলি যথাযথভাবে স্তরে স্তরে পড়িয়া গেল। কাপড়টি আসলে ফরাসী ফ্যাশানে তৈয়ারি, খাস ইংরেজ দরজী সেলাই করিয়া দিয়াছে। সাহেবেরা জানে, কোন্‌খানে কি রকম খাঁজ পড়িলে ফিগারের আকর্ষণ-শক্তি প্রখর হইয়া উঠে। গঠনের গোলমেলে রেখা চাপিয়া মারিতে হইলে সাহেবী শাড়ি পরা ছাড়া উপায় নাই। মিস বোনার্জি এ যুক্তি মানিতেন।

প্রস্তুত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে অন্তর দুলিয়া উঠিল। পুলক যেন ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়।

পুরুষের যৌবনে সবে তখন স্বরূপ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নবাগত গুম্ফের রেখা যেন সূক্ষ্ম তুলির সাহায্যে হালকা রঙ দিয়া আঁকা। নিটোল গোলাপখাস আমের মত গণ্ড, কোথাও মন-দমানো খাঁজ পড়ে নাই, গৌরবর্ণের উত্তাপ পাতলা আদ্ধির পাঞ্জাবি ভেদ করিয়া ছাই-চাপা আগুনের মত বাহির হইয়া আসিতেছে, দীর্ঘ ঋজু দেহ। আভিজাত্যের পরশ যেন সর্ব

শরীর ঘিরিয়া আছে। ধূলিলুণ্ঠিত কোঁচানো কাপড়ের শেষাংশ ফুলের পাপড়ির মত মাটিতে বিছানো। বোনার্জি সব কিছুর ভিতরই বৈশিষ্ট্য দেখিলেন।

বিরাট তাকিয়া জোর করিয়া ছোট্ট চেয়ারে ঠেসিয়া দিলে যে অবস্থা হয়, মিস বোনার্জি সেই ভাবে বসিয়া ছিলেন। মাংসের বাহুল্য যেখানে ফাঁক পাইয়াছে, সেইখানেই নির্বিঘ্নে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বিশেষ চেষ্টার পর কোন প্রকারে ডাচ বার্গোমাস্টার চেয়ার হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বাগ্রে দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। গৃহকর্ত্রী যথারীতি শিষ্টাচার আরম্ভ করিবার পূর্বেই 'হাউ ডু ইউ ডু' কথাটা শোনা গেল বোনার্জির মুখ হইতে ; সকল বাধা অতিক্রম করিয়া ফানুসের আকারে প্রায় ফাঁপা হাতটা কথাকলি নাচের অনুকরণে ঝুলাইয়া করমর্দন করিলেন। তাঁহার আগ্রহে শুধু একটু ছোঁওয়া লাগানোর জন্য, রসাল হাতটা তখন যে পূর্বাবস্থায় ছিল, তাহা স্মরণ করিবার সময় ছিল না। দেহ মন তখন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে, সব দিক খেয়াল রাখা তখন সম্ভব নয়। রসের সংস্পর্শে ভদ্রলোকের হাতও রসাল হইয়া উঠিল। বোনার্জির খর্বাকৃতি দেবেন্দ্রের সামনে তখন বামনাকার ধারণ করিয়াছিল, তথাপি ললিতার মত গ্রীবা ঈষৎ পাশ ফিরাইয়া লীলায়িত ভঙ্গি আনিবার চেষ্টা করিলেন। গ্রীবা বঙ্কিম ভাব ধারণ করিল কি না ঠিক নজরে পড়িল না, তবে গলার নীচে একরাশ গলকম্বল স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল। উচ্চরণে দরদ ঢালিয়া বলিলেন, আপনার কথা ললিতার কাছে প্রায় শুনি, আলাপ করবার জন্য উৎসুক হয়েছিলাম, কিন্তু ও এমন জেলাস যে—

ললিতা পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল, ডার্লিং, ইউ ডোণ্ট মীন ইট, ইউ নো আমি অ্যাবাভ ইওর ওরিয়েণ্টাল জেলাসি। তাহার পর তুলি দিয়া আঁকা কৃত্রিম ভ্রূ এমন একটি স্থানে ঠেলিয়া তুলিল, যাহার ইঙ্গিত বোনার্জির নিকট গোপন থাকিল না! কালবিলম্ব না করিয়া তিনি দেবেন্দ্রকে পাশে বসাইলেন।

প্রায় তরল মাংসপিণ্ডের অত্যন্ত ঘনীভূত চাপে দেবেন্দ্র অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। সাক্ষী রাখিয়া স্ত্রী-পুরুষের এই ধরনের বেপরোয়া আলাপ জীবনে কখনও সে অভ্যাস করে নাই। যতই দেবেন্দ্র একটা ব্যবধান সৃষ্টির

আমি অ্যাবাভ ইয়োর ওরিয়েণ্টাল জেলাসি

চেষ্টা করে, ততই বোনার্জি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া আরও নিকটে আসে। দেবেন্দ্র ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এদিকে ডান হাত রসসিক্ত হওয়ায় তাহার ব্যবহার বন্ধ হইয়াছে। ফোড়া ফাটার পর ডাক্তারী প্রথায় হাতটি আলাদা না রাখিয়া উপায় ছিল না।

বোনার্জি এতক্ষণ কেবল সাইকলজির ভাইটাল সঙ্গমের অপেক্ষা করিতে-

ছিলেন, কোন প্রকারে একটা ডিনারের নিমন্ত্রণে রাজি করাইতে পারিলেই রাত্রে পাশাপাশি বসিয়া সিনেমা দেখা রোধ করে কে? এবং সেখানে মাথা ধরাইতে পারিলে দেবেন্দ্রের স্কন্ধ তো আছেই।

দেবেন্দ্রের দুরবস্থা সকলের পক্ষে বেশ কৌতুকের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। বোনার্জি'র অধ্যবসায়কে কেহ দমাইতে পারে নাই। সুতরাং ঘটনা গাঢ় হইবার অপেক্ষায় সকলে উন্মুখ হইয়া রহিলেন।

তিনি অনর্গল একতরফা কথা বলিয়া চলিয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার কথা আধ-আধ হইয়া আসিতে লাগিল। জিহ্বার সাহায্যে প্রতিনিয়ত ওষ্ঠে হাই লাইট ফেলিয়া প্রত্যেকটি শব্দ রসাল করিয়া উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই শুভ মুহূর্তটির জন্য মিস ডাট ওত পাতিয়া ছিলেন। উচ্চ হাসিতে সকলকে সজাগ করিয়া বলিলেন, নাউ লিলি ইজ ইন্‌স্‌পায়ার্ড (লিলি ওরফে বোনার্জি), তাহার পর দেবেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, পুওর মিঃ দেবেন্দ্র ; লিলি ডার্লিং, আর এগিও না—

বাধা পড়িল। বেয়ারা জানাইয়া গেল, মিস ডস ও তাঁহার ফিয়াঁসে আসিতেছেন।

পর্দা সরাইতেই চোখে চোখে ইঙ্গিত হইয়া গেল, লিলি ইজ বিজি। লিলি যখন বিজনেস করে, তখন বাধা দিতে কেহ সাহস পায় না।

লিলি তখন দেবেন্দ্রের হাতটা নিজের জানুর উপর রাখিয়া নানা ভাবে সামুদ্রিক গবেষণায় ব্যস্ত। আঙুলের ডগা ও তালুর মধ্যস্থল টিপিয়া অতীত সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও দুই চারিটি কথা যে বলেন নাই, তাহা নয়; তবে দেবেন্দ্র কিছু উত্তর দেয় নাই। হাতের তালুর সহিত উপর-হস্তের শিরারও নাকি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং পাঞ্জাবির হাতা গুটাইয়া উপর-হস্তের অনুভূতিও প্রয়োজন হইয়াছিল। মালপোয়ার রস তখন শুকাইয়া শিরীষের আঠার মত চটচটে হইয়া গিয়াছে। দুই হস্তের টিপুনি ও তৎসহ রসের আঠা দেবেন্দ্রকে কি ভাবে অভিভূত করিতেছিল, তাহা অনুমান করা শক্ত নয়।

মিস ডসের প্রথমটা কোঁচা দেখিয়া নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ দুলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোঁচার মালিক ফ্যাশানের দুর্দান্ত প্রতাপকেও অবহেলায়

পরাস্ত করিল। তিনি রস-মাখা হাতটার পাশে চেয়ার টানিয়া বসিলেন। তাহার পর হাঁটু দুইটাকে একত্রিত করিয়া সসার্ রাখিলেন। দেবেন্দ্রের ভীত দৃষ্টি হইতে মনে হইল, চায়ের কাপটা পড়ে বুঝিবা। দুই চুমুক খাইয়াই

নাউ লিলি ইজ ইন্‌স্‌পায়ার্ড (লিলি ওরফে বোনার্জি)

ডস চায়ের কাপটা পাশের বাট্‌কুল টেবিলে রাখিয়া দিলেন, তাহার পর চেয়ার টানিয়া রস-মাখা হাতটার পাশে বসিলেন।

তাঁহার প্রসাধনে বিঁড়ার বালাই ছিল না। শহরের বিশেষ অঞ্চলের মাইরি-ছেলেদের অনুকরণে পিছন দিককার চুল একেবারে ক্ষৌরকার্য করা হইয়াছে। এই কায়দায় কেশ-বিন্যাসকে নাকি শিঙগল বলে।

পাশে বসিয়াই বলিলেন, হাউ ইণ্টারেস্টিং! লেট মি একজামিন দি আদার পাম্। হাতটার যেন কোন স্বত্বাধিকারী নাই। তালু পরীক্ষা করিতে গিয়া

রসের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। অনুপযুক্ত পাত্র হইলে হয়তো কোন অছিলায় হাত ধুইবার গোপন ঘরটির সন্ধান লইতেন, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আঠা মনের সহিতও একটি জমাট সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছিল। ত্রুটি নগণ্য— এ দিকটায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হস্তরেখার গভীর অর্থ বাহির করিবার জন্য দৃঢ়পরিকর হইলেন।

ভাগাড়ে গরু পড়িলে শকুনি অথবা শৃগাল যে ভাবে মাংস ছিঁড়িয়া খায়, মানুষ-গৃধিনী সেই ভাবে জীবন্ত নরমাংস লইয়া টানাটানি লাগাইয়াছে। এক দিকে লিলি, অপর দিকে ডস। ক্ষুধার্তের মাঝে খাদ্য পড়িয়াছে। সমভাগের প্রশ্ন উঠিবার ফাঁক নাই; যে যতটা পারে, নিজের অংশে বেশী লইবার চেষ্টা করিতেছে।

দেবেন্দ্র কাতর ও কৃপার্থী হইয়া ললিতার দিকে তাকাইল, যদি সে উদ্ধার করে। ললিতা তখন ডসের ফিয়াঁসে সহ একটি নিরিবিলি কোণ লইয়াছে, উভয়ের মধ্যে কেমন একটা মাখামাখি ভাব।

ললিতা কখনও তো দেবেন্দ্রের সহিত গা ঘেঁষিয়া দাঁড়ায় নাই; দেবেন্দ্র জানিত, তাহার প্রকৃতি শান্ত ও ধীর, এরূপ তো ইতিপূর্বে সে দেখে নাই। দেশী বিশেষ্যের গুণকীর্তন করিতে অযথা বিলাতী বিশেষণের শ্রাদ্ধক্রিয়াও ললিতার মুখে কেমন বেমানান লাগিতেছিল। দেবেন্দ্র ললিতা সম্বন্ধে আর ভাবিতে পারিল না।

ডসের ফিয়াঁসে হস্তস্থ টেনিস-র‍্যাকেটটি ঘরের ভিতর হঠাৎ চরকি-বাজির মত ঘুরাইতেই দেবেন্দ্রের দৃষ্টি তাঁহার পোষাকের দিকে আকৃষ্ট হইল। অদ্ভুত বেশ। কাঠবিড়ালীর চামড়ার মত ডোরা-কাটা বিচিত্র রঙের কোট, নিম্ন অঙ্গে সাদা ফ্ল্যানেলের পাৎলুন, শ্রীচরণের পাদুকার রঙ আরও সাদা—বিধবা যেন বিলাসে বাহির হইয়াছে,—চড়কের সময় উপযুক্ত দলে ঢুকিয়া পড়িলে সঙ বলিয়া ভ্রম হয়।

অকারণে ললিতা হাসিতে হাসিতে ফিয়াঁসের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। হাসির কি উগ্র প্রকাশ! তাহার পর ভদ্রলোকের মাথাটায় এমন ভাবেই ঝাঁকুনি দিল যে, চুলের পারিপাট্য একেবারে তছনছ হইয়া গেল। ললিতার দেহে ভার ছিল—ফিয়াঁসে টাল সামলাইতে না পারিয়া পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

ললিতা থামে নাই, সেও একটি চেয়ার টানিয়া পাশে বসিল, তাহার পর চুলকেলি দ্বিগণ মাত্রায় বাড়াইয়া দিল। ভদ্রলোক যতই চুল যথাস্থানে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে, ততই ললিতা তাহা লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়।

দেবেন্দ্রের অনভ্যস্ত মন ঘৃণায় ভরিয়া উঠিল। সে দেখিতেছিল, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীতে ঘরোয়া ভাব কিছুমাত্র নাই, যেন সকলে ভিড় করিয়া বাগান-বাড়িতে স্ফূর্তি করিতে আসিয়াছে, যেখানে নির্লজ্জ আচরণের জন্য কেহ কাহাকেও দায়ী করে না, ব্যভিচারই সেখানে একমাত্র কৌতুকের বস্তু।

চা শেষ হইতেই বেয়ারা সিগার ও সিগারেট লইয়া আসিল। ভ্যানিটি কেস হইতে একটি কারুকার্যখচিত হস্তীদন্তের লম্বা চোঙা বাহির করিয়া ডস তাহাতে ততোধিক লম্বা সিগারেট সংযোজিত করিলেন। দেবেন্দ্র অবাক হইয়া দেখিতেছিল। বিস্মিত ভাব কাটিবার পূর্বেই ডস পুরুষের উপযুক্ত একটি সিগারেট দেবেন্দ্রের হাতে গুঁজিয়া দিলেন। দেবেন্দ্র জীবনে কখনও ধূমপান করে নাই। প্রথমটা প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পুরাতন চালের দীক্ষা তাহাকে নিরস্ত করিল। মিস ডস চোঙা মুখে লাগাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন দেবেন্দ্র তাঁহার মুখাগ্নি করিয়া দিবে বলিয়া, সামাজিক অনুষ্ঠানে পুরুষের ইহা অবশ্যকর্তব্য কর্ম; কিন্তু দেবেন্দ্র নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল। অগত্যা মহিলা নিজেই নিজের অন্তিমক্রিয়া সমাপন করিলেন। দেবেন্দ্রের বিচিত্র আচরণে ডস কৌতূহলী হইয়া উঠিতেছিলেন, অবশেষে বলিয়া ফেলিলেন, ও, আপনি সিগারেট খান না বুঝি? হাউ স্ট্রেঞ্জ!

ডস যে ভাবে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহাতে লিলির মন দমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন, উনি যখন খান না, তখন প্রেস করা উচিত নয়। লিলির ভাষায় দরদের উচ্ছ্বাস ডসকে আশঙ্কান্বিত করিয়া তুলিল। সামান্য অসতর্কতায় জিতের দিকটা সন্দেহ-জনক হইয়া পড়িতে পারে। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিলেন, তাহার পর কাপড় সংযত করিয়া বসিলেন।

দেবেন্দ্রের মত আনাড়ীকে জখম করিবার মত অস্ত্র তাঁহার ছিল। শাড়ির

নূতন ভাঁজ যেন পুরাতন অস্ত্রকে শাণিত করিয়া দিল। ক্রেপ-ডি-সিনের রেশম তখন দেহের মারাত্মক গঠনগুলিকে নিবিড়ভাবে ঘিরিয়াছে। উত্তেজক রেখাগুলি অস্পষ্টতা এড়াইয়া একেবারে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বক্ষের গুপ্ত বক্রাকার গখুরার মত ফণা বিস্তার করিয়া দংশনোন্মুখ হইয়া আছে।

লিলি বুঝিল, ব্যাপার সুবিধার নয়, ডসের সঙ্কল্প আজ অত্যন্ত দৃঢ়। তাহার পর মনকে স্তোক দিল, দেবেন্দ্র এমনই কি অপরূপ! অত হ্যাংলামি তাহার পোষায় না। 'এক্সকিউজ মি' বলিয়া উঠিয়া পড়িল। গমনকালীন তাহার দীর্ঘনিশ্বাস উভয়েই শুনিয়াছিল, কেহই তাহাতে বিচলিত হয় নাই।

লিলি এমনটি করিবে, কেহ ভাবিতে পারেন নাই। ডালকুত্তা লেলাইয়া দিয়া ধাবমান শিকার দেখিয়া হিংস্রপ্রকৃতি দর্শকের দল যে আনন্দ পায়, নিমন্ত্রিতদের ভিতর অনেকেই ঘটনাগুলি সেই ভাবে উপভোগ করিতেছিলেন। লিলি রণে ভঙ্গ দেওয়ায় অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা আসিয়া শহরকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছে। রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোর তীব্র ঝলক পর্দা অতিক্রম করিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। ড্রইং-রুমের প্রতি কোণে দেওয়াল-ছিটকাইয়া আলো আসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই দুষ্ট আবছায়ার আবশ্যকতা দেবেন্দ্র তেমন সুবিধার বোধ করিতেছিল না। জানালার দিকে সরিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেই অনুভব করিল, তাহার হাত আবদ্ধ। ডস তালুর তলায় অদ্ভুত টিপুনি দিয়া যেন অনুরোধ জানাইতেছেন, অত আলো ভাল নয়। তর্জনীর মৃদু সংঘর্ষণে হয়তো কোন সঙ্কেত ছিল, দেবেন্দ্র তাহা বুঝিল না।

অপর দিকে ললিতার চুলকেলি ডস তেমন সহজভাবে লইতে পারিতেছিলেন না। তথাপি সামাজিক রীতি মানিতে হইলে, উহা অগ্রাহ্য না করিয়াও উপায় নাই, কারণ সভ্যতার যে স্তরটি তাহার অধিকারভুক্ত, সেখানে সন্দেহের স্থান নাই, অন্তরের বেদনাকে অকারণ চাপিয়া নিজের সান্ত্বনা সংগ্রহ করিতে হয়।

প্রিয়ের পরকীয়া প্রেমালাপ প্রত্যক্ষ দর্শনে যে জ্বালার সৃষ্টি হয়, তাহা বৃশ্চিকদংশন অপেক্ষা কম নয়। ডস অন্তর্দাহে ভস্মীভূত হইতেছিলেন, কিন্তু বাহিরে তাহার উত্তাপ ছিল না।

হরিজনদের একান্নবর্তী পরিবারে কলতলায় সন্দেহঘটিত ব্যাপারে যে

কলহের সূচনা হইয়া থাকে, তাহারই মার্জিত ও মেকানাইজ্‌ড যুদ্ধ আরম্ভ হইল ড্রইং-রুমের সজ্জিত কামরায়। এখানে সব কিছুই সায়াণ্টিফিক।

তখন চায়ের পালা শেষ হইয়াছে, সুরার পালা সুরু। বেয়ারা চক্রযুক্ত চলমান পীঠিকায় মদের সরঞ্জাম লইয়া ঘরে ঢুকিল। পানীয় ও পাত্রগুলির আকার বিচিত্র! নির্দিষ্ট পাত্রে উপযুক্ত সুরা ব্যবহার না করিলে নাকি তাহার জাতিগত স্বাদ নষ্ট হয়।

ডস নিজের জন্য শেরি লইয়া দেবেন্দ্রের জন্য বেয়ারাকে হুইস্কি ঢালিতে বলিলেন।

মদ ঢালায় কতকটা সামরিক প্রথা মানা হয়—মার্চের মত, যতক্ষণ পর্যন্ত থামিতে না বলা হয়, ততক্ষণ মদ ঢালিয়া যাওয়া নিয়ম। বেয়ারা ঢালিতে ঢালিতে দুই বার দেবেন্দ্রের দিকে তাকাইল, পাত্র তখন পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল।

ডস আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, সে হোয়েন? দেবেন্দ্র ইহার অর্থ বুঝিল না, ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল। ডস হাসিয়া ফেলিলেন, হাসির পিছনে কৃপা লুক্কায়িত ছিল। তাহার পর প্রশংসার খোলস চাপাইয়া বলিলেন, হাউ ইনোসেণ্ট ইউ আর! প্লীজ অ্যাড মোর সোডা। দেবেন্দ্র অকারণ হাসির অর্থ বুঝিল না এবং কেনই বা সোডা বেশি করিয়া লইতে হইবে, তাহার কারণও খুঁজিয়া পাইল না। ডস ইতিমধ্যে নিজের পাত্র ঊর্ধ্বে উঠাইয়া বলিলেন, টু ইওর হেল্‌থ।

আরতির প্রথায় মদ্যপাত্র ধরায় দেবেন্দ্র অবাক হইয়া গিয়াছিল। তাহাকেও স্বাস্থ্য পান করিবার জন্য গেলাস ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে হইবে, তাহা সে জানিত না।

একটা কিছু ত্রুটি হইয়াছে ভাবিয়া মাথা নীচু করিয়া হস্তস্থ সিগারেটটি ঘুরাইতে লাগিল। যুবতীর জড়িত ভাষায় সুরার প্রভাব না থাকিলেও তাহার অবর্ণনীয় সম্মোহনী শক্তি দেবেন্দ্রকে আকর্ষণ করিতেছিল। ডস হঠাৎ একেবারে গায়ের উপর ঝুঁকিয়া কি ভাবে সিগারেট ধরাইতে হয় দেখাইয়া দিলেন। মাংসচূড়ার স্পর্শে বৈদ্যুতিক ঝাঁকুনি ছিল—দেবেন্দ্র হৃৎকম্পনের সহিত উত্তেজনার নূতন ধর্ম আবিষ্কার করিল। সরিয়া বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু নড়িল না।

সুরার তীব্র গন্ধ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সন্তানকে প্রলুব্ধ করে নাই, তথাপি উহা হাতেই রাখিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ধূম উদ্গীরণ করিতে গিয়া বহুবার কাসিয়া ফেলিয়াছে। সে একটা দৃশ্য হইয়াছিল—দর্শকের দল সার্কাসে ক্লাউনের খেলা দেখিয়া যে আনন্দ পান, সেই আনন্দ পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়াছিলেন অব্যবসায়ীর ধূমপানের চেষ্টায়। ডস বলিলেন, হোয়াট অ্যাবাউট ইওর ড্রিঙ্ক? দেবেন্দ্র লক্ষ্য করিল, গেলাস তাহার হাতেই রহিয়া গিয়াছে।

দেবেন্দ্র বুঝিয়াছিল, এ সমাজে তাহার স্থান নাই, অথচ বাহির হইবার পথও বন্ধ, কারণ সভা ভঙ্গ না হইলে ললিতা উঠিবে না। ললিতা তাহারই গাড়িতে আসিয়াছে এবং বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবার ভার তাহারই উপর। ধূমপানের ঘটনা স্মরণ হওয়ায় দেবেন্দ্রের আত্মাভিমান খর্ব হইতেছিল। সে বুঝিয়াছিল, এখন তাহার অনভিজ্ঞতা আড়াল না দিলে চলে। সুরার কথা উঠিতেই সে এক নিশ্বাসে প্রায় সবটা শেষ করিয়া ফেলিল। শরবতের মত সুরার ব্যবহার সব সমাজে চলন নাই। দেবেন্দ্রের কীর্তি দেখিয়া ডস স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, শূন্য গেলাস দেখিয়া বেয়ারাকে আবার চলমান টেবিলটি লইয়া আসিতে বলিলেন।

দেবেন্দ্র পেগ-স্ট্যাণ্ডে গেলাস রাখিয়া একবার বুকে হাত দিল।

সুরার দাহক্রিয়া সুরু হইয়াছে। অনলের তরলাকৃতি তখন স্বধর্ম রক্ষা করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতেছিল। অল্প সময়ের ভিতরই অগ্নিশিখার তাপ বাহিরে আসিয়া পড়িল। কর্ণ ও গণ্ড তখন তপ্ত লৌহের মত রাঙিন হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু আরক্ত। পাতলা ঠোঁট দুইটির নিরীহ ধনুকাকার রেখা অস্বাভাবিকভাবে দৃঢ় ও সরল রেখায় পরিণত হইতেছিল। সে ঝড় উঠিবার পূর্ব মুহূর্তের স্তব্ধতা, যে কোন সময় প্রবল আলোড়নে নীতিস্তম্ভগুলি ধ্বংস হইয়া যাইবে।

চরিত্রের যে দিকটা সে এযাবৎকাল পূজা করিয়া আসিয়াছে, সুরার কশাঘাতে তাহা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে লজ্জা ও সঙ্কোচের পর্দা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছে। দেবেন্দ্রের মন এখন এমন একটি ধাপে নামিয়া পড়িয়াছে, যাহা সহজ অবস্থায় ভাবা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

গেলাস পুনরায় পূর্ণ হইয়াছিল, দেবেন্দ্র পাত্রটি নিতান্ত অবহেলার

সহিত ধরিল; সুরা তাহাকে গ্রাস করিতে চায়; গন্ধে তাহার আপত্তি নাই। গেলাস ধরিতে গিয়া হাতের চঞ্চলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল—ইহা লক্ষ্য করিয়া ডস সর্বদেহ দিয়া দেবেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিলেন। বিশেষ প্রথায় অনুরোধ উভয়ের দেহকে গাঢ়ভাবে সন্নিহিত করিয়া ফেলিল। ঘটনাচক্রের পরিবর্তন দেবেন্দ্রের মনকে এমন একটি স্তরে লইয়া ফেলিয়াছিল, যেখানে সে নিজেকে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। কথাও মাঝে মাঝে জড়াইয়া আসিতেছিল এবং যাহা বলিতে চায়, তাহা বলা হইতেছিল না—অবান্তর আলোচনায় সচেতন হইয়া উঠিলেও, তাহা ক্ষণিকের জন্য।

দেবেন্দ্র অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া পাত্রটি পূর্ববৎ নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। যে ভীরু লালসা নীতির আজ্ঞা চিরকাল বিনা দ্বিরুক্তিতে পালন করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা সুরার প্রলেপে তেজীয়ান—প্রতি অঙ্গে ডসের স্পর্শ দুর্দান্ত প্রবৃত্তিকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। লিলির অনুকরণে দেবেন্দ্র ডসের নিটোল বাহুতে হস্তরেখা দেখিতে পাইল। দৃষ্টিতে তাহার স্পর্শানুভূতি ছিল। ডস বলিলেন, হাউ ইণ্টারেস্টিং! ইউ এ পামিস্ট? দেবেন্দ্র উত্তর করিল, না। ইওর আর্ম—ইট হ্যাজ চার্মিং কণ্টুর্‌স। আই শুড সে, দে আর ডিলিশাস!

দেবেন্দ্রের ইংরাজী উচ্চারণ এখন খাস সাহেবী ধরণের হইয়া গিয়াছে।

ডস বলিলেন, ইউ হ্যাভ ভেরি কারেক্ট আক্সেণ্ট। বীন টু লণ্ডন?

দেবেন্দ্র বিদেশী ভাষায় জানাইয়া দিল, সে বিলাতে যায় নাই এবং তাহার উচ্চারণের জন্য দায়ী তাহার সাহেব প্রাইভেট টিউটার্। কথা বলিতে বলিতে কখন নিজের অজ্ঞাতে বাহুটি তাহার প্রশস্ত বক্ষের উপর আনিয়া ফেলিয়াছিল। ঘটনাটি ঘটিল অপরের দৃষ্টির আড়ালে—আলো-আঁধারি ও দেবেন্দ্রের ঝুঁকিয়া থাকার জন্য।

এতটা গড়াইবে ডস অনুমান করিতে পারেন নাই, হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই দেবেন্দ্র আরও ঝুঁকিয়া দেহের দ্বারা নিবেদন জানাইল, তা হয় না। ডস উপলব্ধি করিলেন, ব্যাপারটি রসিকতার গণ্ডি অতিক্রম করিয়া জটিল হইয়া উঠিয়াছে। কিছুক্ষণ আগে দেবেন্দ্র যে কারণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল, এখন সেই কারণই ভীতিপ্রদ। পুরুষের দৈহিক শক্তি অবহেলা

করিবার উপায় নাই, অথচ অন্য নিমন্ত্রিতেরা দেখিলেই বা কি বলিবে? ডস আর একবার নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। অনন্যোপায় হইয়া বেশ রুক্ষ স্বরেই বলিলেন, ব্রুট।

দেবেন্দ্র খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল, আই উড টেক ইট অ্যাজ এ কম্‌প্লিমেণ্ট। বলিয়া ডসের দিকে অর্ধনিমীলিত চক্ষে তাকাইয়া রহিল। নিতান্ত অসহায়ার মত কাতর মিনতিপূর্ণ ভাষা উচ্চারিত হইল, ডার্লিং, লক্ষ্মীটি, দেখছেন না, ললিতা আমাদের আড়চোখে কি রকম ওয়াচ করছে?

দেবেন্দ্র জোর দিয়াই উচ্চারণ করিল, লেট হার ওয়াচ উইথ দি সাইট অব এ ভাল্‌চার। ব্রুটস নেভার স্টিক টু ওয়ান ফিমেল, জাস্ট অ্যাজ ভাল্‌চার্‌স নেভার ডিস্ট্রিবিউট দেয়ার শেয়ার্স অব প্রে ফ্রীলি।

স্বল্পভাষী বাচাল হইয়া উঠিয়াছে, কারণ কি—ডস জানিতেন। তিনি অত্যন্ত জড়সড় হইয়া পড়িলেন। দৈব দুর্ঘটনা অথবা কোনও রসিকের অদম্য কৌতূহল হেতু ঘরের বাতি হঠাৎ নিভিয়া গেল। গৃহকর্ত্রী 'বয়, বাত্তি! বয়, বাত্তি!' বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

অন্ধকারের ভিতর ললিতার অস্পষ্ট হাসি ও তৎসহ জড়িত ভাষায়, 'ও ডার্লিং, লীভ মি অ্যালোন' অকস্মাৎ দেবেন্দ্রের কর্ণকুহরে কুঠারের মত আঘাত করিল।

দেবেন্দ্রের মন তখন বারুদপূর্ণ কামানের মত হইয়া ছিল, কুঠারের কঠোর আঘাতে তাহার বিস্ফোরণ ঘটিল।

মিস্ত্রী আসিয়া ঘরটি পুনরায় আলোকিত করিয়া দিয়াছে।

দেবেন্দ্র তখন একা। দুই হস্তে দৃঢ়ভাবে মুখ ঢাকিয়া নিজের অধোগতির কথা ভাবিতেছে। চারিত্রিক আদর্শের উদাহরণ হইতে এখন সে বিচ্যুত কলঙ্কের ছাপ তখন তাহার ওষ্ঠে সুস্পষ্ট আকার লইয়া রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্তের ঘটনা। পালিশের উদ্ভাবক যে সূত্রটি ধরাইয়া দিল, ভোঁতা তাহারই নব রূপ আবিষ্কারে সারাটা জীবন ঘুরিয়াছে।

নেলা-ক্ষেপা

...সমস্ত রাত্রি অবিরাম বৃষ্টির পর ভোরের দিকে প্রকৃতি একটু শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। আকাশ এখন ঘোলাটে, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। অপ্রশস্ত গলি—এক-হাঁটু জল জমিয়া গিয়াছে। বিক্ষিপ্ত আবর্জনার স্তূপে স্থানটি দ্বীপময় হইয়া উঠিয়াছে।

আবর্জনাকে নির্দিষ্ট আধারে আটক রাখিবার জন্য হয়ত একটি ডাস্টবীন ছিল। কিন্তু এখন তাহার অস্তিত্ব জঞ্জালের অভ্যন্তরে সমাধিস্থ হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাসমান মাছ অথবা অন্য কোন আমিষ খাদ্যের অসিদ্ধ ও পরিত্যক্ত অংশ দেখা যায়। বীভৎস দৃশ্য, স্থানটি যেন নারকীয় উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে।

ধাঙগড় ধর্মঘট করিয়াছে। রাস্তা প্রায় এক সপ্তাহকাল ধরিয়া পরিষ্কার হয় নাই। মহামারীর আক্রমণ সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাণে বাঁচিতে হইলে নোংরা পরিষ্কার হওয়া দরকার। বোকা চালাক ও শিক্ষিতদের দল মালকোঁচা মারিয়া হরিজনদের কর্তব্য সমাধান করিতে নামিয়া গিয়াছেন। বোকা নামিয়াছে হুল্লোড়ের সুবিধা পাইয়াছে বলিয়া, চালাক নামিয়াছে বাহবার লোভে, শিক্ষিত নামিয়াছে কর্মজীবনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য। প্রাণে বাঁচার উদ্দেশ্যটা স্বার্থ জড়িত হওয়ায় অনেকটা গৌণ হইয়া গিয়াছে।...এমনি একটি আবেষ্টনীর ভিতর আর একটি নরজীবের আবির্ভাব হইল।...মানুষটি নেলা-ক্ষেপা। এক পা অগ্রসর হইলেই টাল খাইয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, কিন্তু পড়িতেছে না—অদ্ভুত কৌশলে প্রতিবারই সামলাইয়া লইতেছে। তাহার দেহের গঠনই ঐরূপ—সামনের দিকটা অধিক মাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়ায় দেহভারের সমতা ঠিক থাকিতেছে না। পাঁজরার অস্থিগুলি কেহ যেন মুচড়াইয়া একপেশে করিয়া দিয়াছে। বামদিকের নীচের চোয়ালটা প্রায় দোদুল্যমান। মনে হয় এখুনি বুঝি মাথা হইতে খসিয়া পড়িবে। মুখ দিয়া অনবরত লালা ঝরিতেছে, একটা চোখ কানা হইয়া গিয়াছে—অপরটির দৃষ্টিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। জন্মের গোড়াতেই হয়ত কোন ভীতিপ্রদ নোংরা ব্যাধিকে জীবনের

সাথী করিয়া সে ধরণীর বুকে বাঁচিতে আসিয়াছিল। নেলা-ক্ষেপার মানসিক উচ্ছ্বাস সুবোধ্য নয়। বুদ্ধির অভাব তাহাকে নির্লিপ্ততার আশ্রয় দিয়াছে। জীবনে কখনও সে কাহারও নিকট কৃপাথী হইয়া দাঁড়ায় নাই, তথাপি উচ্চ শ্রেণীর মানুষ তাহাকে কৃপা করিয়া থাকে। ক্ষুধায় জঠরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে আপন মনেই বলিতে থাকে—"অ্যা—বাহি—অ্যা বাহি"—শব্দ দুইটির অর্থ কোন অভিধানে পাওয়া যায় না। পাওয়া যাইলেও বিশদ্ ব্যাখ্যা হইত না। কারণ একই শব্দের দ্বারা স্থান কাল পাত্র ও প্রয়োজনীয়তা হিসাবে নেলা-ক্ষেপা বিভিন্ন মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। 'অ্যা—বাহি'র অর্থকরণ আমাদের নিকট জটিল হইয়া উঠে, কিন্তু শব্দের ব্যবহার নিরর্থক নহে।

ক্ষুন্নিবৃত্তি ও নিদ্রাই তাহার জীবন যাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া উঠিলে সে খাবারের দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তাহার পর উপাদেয় খাদ্যগুলিকে লোলুপ দৃষ্টির দ্বারা ভক্ষণ করিয়া চলে। যকৃতের উৎপাত আরও অসহনীয় হইয়া উঠিলে বলিয়া বসে 'অ্যা—বাহি' 'অ্যা—বাহি'। খাবারওয়ালা পুণ্য সঞ্চয়ার্থে কখনও অস্পৃশ্য ভৃত্যকে উচ্ছিষ্ট খাদ্য শুখা নর্দমাটার উপর ফেলিয়া দিতে বলে—কখন দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। তাড়া করিতে আসিলে সে বুঝিতে পারে শক্তিমান তাহাকে মারিতে আসিয়াছে। সে পালাইবার চেষ্টা করে না, কারণ পালাইবার তাহার শক্তি নাই। অধিকাংশ স্থলেই তাহার ক্ষুধা আসে বলিয়া মার খাইতে হয়। মার না দিলে ছুঁড়িয়া ফেলা ঠোঙ্গাগুলি খুঁজিতে থাকে। মার খাইলে কুণ্ডলায়িত হাত দুইটি অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যে দুলিয়া উঠে, বলে "অ্যা—বাহি!"

প্রায়-দিগম্বর নেলা-ক্ষেপা আহারান্বেষণে বাহির হইয়াছে। খাবারের দোকানটা গলির শেষের দিকে। দূর হইতে দেখিল সেখানে লোকজন নাই। ঝাঁপগুলি সব বন্ধ। তথাপি স্বভাব যাইবে কোথায়। ক্ষুধাও অন্তরকে কশাঘাত করিতেছে, যাহোক কিছু উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করান দরকার। সুতরাং চেনা পথেই সে চলিতে লাগিল। পথ জলপ্লাবিত, কিন্তু অন্নলোভীর সন্ধান-পথে তাহা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কোন প্রকারে পা দুইটা হেঁচড়াইয়া টানিয়া বন্ধ খাবারের দোকানটার দিকে চলিয়াছে। গলির ভিতর ঢুকিতেই একজন হুল্লোড় ব্যবসায়ী নেলা-ক্ষেপার চলার ভঙ্গী দেখিয়া হাসিয়া

লুটোপুটি। দলের আর একজনকে বলিল, "দেখ, দেখ, ব্যাটার কাণ্ড দেখ, আজ ও এখানে খাবার খুঁজতে এসেছে।" এমন একটি আবিষ্কারকে সামনে পাইয়া সাথী সামান্য একটু রসিকতা না করিয়া থাকিতে পারিল না। দ্রুত নিকটে গিয়া তাহার মুখের উপর পানের একরাশ পিচ ফেলিয়া দিল। একটা দিক হোলী খেলার মত লাল রং-এ রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। দৃশ্যটি অপর ব্যক্তির নিকটও উপভোগ্য হইয়া উঠিল। মজার জন্যই তো তাহারা ধাঙগড়ের কাজ করিতে আসিয়াছে,...উপরন্তু দৈব প্রেরিত। সুতরাং সুযোগ যখন পাওয়া গিয়াছে তাহা ছাড়া যায় কেমন করিয়া? অপর জন ধাঙগড়ের বৃহৎ ময়লা-ফেলা খুন্তিটা লইয়া অগ্রসর হইয়া গেল এবং নেলা-ক্ষেপাকে নিকটে পাইতেই ধপ করিয়া এক ঘা পিঠে বসাইয়া দিল।

যে মানুষ নিজের দেহভার বহনে অসমর্থ, তাহারই পিঠে সজোরে রাক্ষুসে লৌহ খুন্তির আঘাত পড়িলে সোজা দাঁড়াইয়া থাকার কথা নয়। নেলা-ক্ষেপা মুখ থুব্‌ড়াইয়া পড়িয়া গেল। যখন জল হইতে উঠিল তখন সে উপযুক্ত নিশ্বাসের অভাবে হাঁপাইতেছে। চোখে, মুখে, নাকে ময়লা কাদা জমিয়া গিয়াছে। মুখশ্রী দেখিয়া উভয়ের কৌতুকের সীমা নাই। একজন আর এক-জনকে চিম্‌টি কাটিয়া বলিল, "সত্যি ভাই, ভাগ্‌গিস্‌ ধাঙ্গড়রা কাজ বন্ধ করেছিল তা না হলে এমন মজা আর পেতুম?" অপরজন চিমটির রস গ্রহণ সমর্থন করিয়া কনুই দিয়া তলপেটে গুঁতা মারিয়া উত্তর করিল, "যা বলেছিস তুই।"

নেলা-ক্ষেপা একটি চোখ দিয়াই দেখে। তাহারই উপর কাদা জমিয়া গিয়াছে। শুধু কাদা নয়, একটি পুরাতন জুতার ফিতাও কাদার সহিত পুঁই সাপের মত ঝুলিতেছে। নেলা-ক্ষেপা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছে চোখের উপর দোদুল্যমান সর্পবৎ ফিতাটিকে সরাইবার জন্য। কিন্তু প্রতিবারই হাত গিয়া পড়িতেছে মুখের অপর অংশে। ইচ্ছামত দেহের কোন অংশই তাহার ব্যবহার করিবার অধিকার নাই। বিফলতা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে ; ক্লান্ত হইয়া বলিয়া ফেলিল, 'অ্যা—বাহি'...। ...সুখ, দুঃখ, কোপ সব কয়টিরই চরম উচ্ছ্বাস ঐ দুইটি শব্দের ভিতর দিয়া। ফিতা তখনও ঝুলিতেছে—এবার দারুণ ভাবে জটাশুদ্ধ মাথাটা ঝাঁকুনি দিল। দীন দয়াল স্বধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। ঝাঁকুনিতে ফিতাটা অনেকখানি কাদা সহ পড়িয়া

গিয়াছে। নেলা-ক্ষেপা দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়া আবার চলিতে সুরু করিল। হেলিয়া দুলিয়া বহু চেষ্টার পর সে একটি আবর্জনার ঢিপির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ঢিপির ডগা জল হইতে খানিকটা উপরে মাথা উঁচু করিয়া আছে। একটা পরিত্যক্ত ছেঁড়া কোট, তৎসহিত একটি ভাঙ্গা কুলা। কুলার উপর খাদ্যের মতই কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছে—সত্যই উহা খাদ্য, মানুষের পরিত্যক্ত। মাছের নাড়ি ভুঁড়ি পচিয়া গিয়াছে, তৎসহিত কিছু উচ্ছিষ্ট আহারের অংশ তাল পাকাইয়া আছে। নিরাকার পরম প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হইল—বুভুক্ষু নেলা-ক্ষেপা আহার পাইল। আনন্দে একটি চক্ষুই বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে, নিচের চোয়ালটা মুখব্যাদান করায় আরো ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মুখগহ্বর যেভাবে বিস্তারিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ আসিয়া পড়ে লোকটা চর্বণ করিতে পারিবে তো?

সমস্ত কাজের প্রারম্ভে প্রহার ও তিরস্কার তাহার অবশ্য প্রাপ্য। এই কারণে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া লইল। কেহ কোথাও নাই...মাছের দুর্গন্ধযুক্ত দেহাংশ স্পর্শ করিয়াই তাহা তুলিয়া লইল...কি জানি দ্রুতগামী পূর্ণদেহীরা যদি মারিবার জন্য ছুটিয়া আসে! উহাদের ইচ্ছা আসিলেই তাহা কার্যে পরিণত করিয়া থাকে। নেলা-ক্ষেপা নিরাপদ ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছে। সত্যই কেহ নিকটে নাই; এই সুযোগে তাড়াতাড়ি কিছু খাইয়া উদর যথাসম্ভব পূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিলে প্রহারটা সহনীয় হইয়া যাইবে। আনন্দের উচ্চরব বাহির হইয়া আসিল—"অ্যা—বাহি!" হস্তে একটা ভাঙ্গা মরিচা পড়া সিগারেটের টিন ছিল পানীয় জল ব্যবহারের জন্য। দীর্ঘকাল ধরিয়া উহা নেলা-ক্ষেপার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। খাদ্যের পূর্বে জল খাওয়াটা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ করিল। হাঁটুর নিকটেই জল। হাত বাড়াইতেই পাত্রটি মৃত মাছি, খড়ের টুকরা এবং আরো কত কি সহ জলে পূর্ণ হইয়া গেল। মাছি মিশাইয়া জল খাওয়া নেলা-ক্ষেপার পুরাতন অভ্যাস। সম্পূর্ণ পাত্রটির জল একচুমুকে নিঃশেষ করিয়া পরিতৃপ্ত বোধ করিল। ঠান্ডা জল ক্ষুধার সময় খানিকটা খাইতে পারিলে পাওনাদারকে সুদ দিয়া আসল দেওয়ার মত নিষ্কৃতি পাইবার আনন্দ পাওয়া যায়।...নেলা-ক্ষেপা বলিল "অ্যা—বাহি!"

শিক্ষিত ও চালাকের দল ইতিমধ্যে নর্দমা পরিষ্কার করিতে করিতে নেলা-ক্ষেপার ঢিপিটির সামনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নেলা-ক্ষেপা তাহা দেখে নাই—তাহারা পিছন হইতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। দূরত্ব যতই কমিতেছিল ততই ছোট ছোট জলের তরঙ্গ আসিয়া বুভুক্ষুর হাঁটুতে আঘাত করিতে লাগিল। আহারের সময় ঢেউ-এর অত্যাচার অস্বস্তিকর, কারণ প্রত্যেকটি ঢেউএ ঢিপির কিনারার অংশ বানের পর নদীর পাড় ভাঙ্গার মত ধ্বসিয়া যাইতেছিল। এমত অবস্থা দেখিয়া মনে করিল বেশ খানিকটা খাদ্য মুখে পুরিয়া দিতে না পারিলে হয়ত সমস্ত ঢিপিটাই তাহার সামনে ধ্বসিয়া জলের তলায় চলিয়া যাইবে।

নেলা-ক্ষেপা তাড়াতাড়ি খানিকটা গলিত মাছের সহিত পচা শাক মুখে পুরিতে যাইবে এমন সময়ে একটি মার্জিত ও উর্ধ্বস্তরের হরিজন সংক্রামক ব্যাধি হইতে মানুষকে বাঁচাইবার জন্য ধাঙ্গড়ের বৃহৎ লৌহ খন্তাটা সজোরে ঢিপির মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া আবর্জনার উপর ঠেলা মারিল। নেলা-ক্ষেপা "অ্যা—বাহি—অ্যা—বাহি"!...করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। অর্থ জটিল হইলেও বোধ্য। তিন দিন খাইতে পাই নাই—ময়লার ঢিপি ভাঙ্গিও না—আমার খাদ্য উপরেই রহিয়াছে।

মার্জিত রুচি ও বিজ্ঞানের বীজাণু বিশ্লেষণ একত্রে মিলিত হইয়া জীবন ধারণের যে নব সংস্কৃতি আবিষ্কার করিয়াছে তাহার ক্রিয়াকলাপকে অসহায় বুভুক্ষুর ক্ষুধা বাধা দিবে কেমন করিয়া? তাহার অন্ন—চোখের সামনে বিগলিত হইয়া জলের ভিতর নিমজ্জিত হইয়া গেল—নেলা-ক্ষেপা বহুবার "অ্যা—বাহি" বলিতে বলিতে টলিয়া টলিয়া পূর্ণদেহীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল।
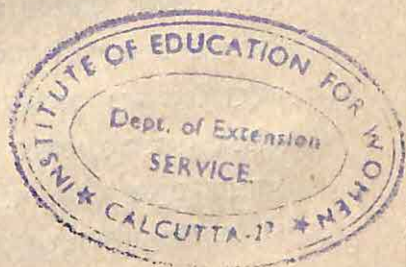
জোড়াসাঁকো

ঝড়ে আমাদের কাছারী পড়িয়া যাওয়ায় সাহেব নীলকরদের পুরাতন কোঠাবাড়ী কোনপ্রকারে বাসোপযোগী করিয়া আজ সকালে উঠিয়া আসিয়াছি। কোঠার অধিকাংশ কালের ধ্বংসলীলায় ধ্বসিয়া গিয়াছে। একটি ঘর গোটা টিকিয়া ছিল, তাহাতে জমিদারির নথীপত্র, কোবালা ও নানা মৌজার চৌহদ্দির রেকর্ড রাখিতেই নাতিপ্রশস্থ ঘর পূর্ণ হইয়া গেল। স্থানাভাব হওয়ায় ম্যানেজারবাবুর সম্মতি আনাইয়া কোঠার পাশে দুইটি চালাঘর তৈয়ারী করাইয়া লইয়াছিলাম।

শীতকাল। রাত বেশি হয় নাই, ইতিমধ্যেই আমাদের গ্রামটি নিঝুম হইয়া গিয়াছে। অতি দূরে বোষ্টমপাড়া হইতে ক্ষীণ খোলের ধ্বনি ও কীর্তনের সুর ভাসিয়া আসিতেছে—মাঝে মাঝে গ্রাম্য কুকুরের আওয়াজও শুনা যায়। এমনি একটি সময় আমি নীলকুঠির বাঁধানো দাওয়ায় বসিয়া—নম্বরের তৌজীর হস্তবুদের হিসাব সামলাইতেছিলাম। সামলান কথাটা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি কারণ সব দিক না সামলাইলে আমাদের দিন গুজরান হয় কেমন করিয়া ; খাজনা বাদে উপরি টাকা আমরা যা পাইয়া থাকি, তাহা প্রজা হইতে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং কুমারবাহাদুর পর্যন্ত অবশ্য-প্রাপ্য বলিয়া ধার্য করিয়া দিয়াছেন। এবারকার আদায় হইতে আমার প্রাপ্তিটা একটু বেশি রকমের করিয়া ফেলিয়াছিলাম সেই কারণেই হিসাব সামলাইতে দেরি হইতেছিল। পরের টাকায় নিজের স্বার্থ জড়িত হইয়া যাওয়ায় হিসাবে গোল বাধা স্বাভাবিক—ক্লান্তও হইয়া পড়িয়াছিলাম। দাওয়ার কোণায় তামাকের সরঞ্জামের উপর দৃষ্টি পড়িতে—একটু ধূমপানের জন্য মনটা উসখুস্ করিয়া উঠিল—অথচ নিজে উঠিয়া তামাক সাজিয়া লইবার স্পৃহা ছিল না। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিন-চারিটি বড় মহালের নায়েবগিরি করিলে সকলেরই আমার অবস্থা হইয়া থাকে। প্রয়োজন না থাকিলেও আমরা ফরমাস করিয়া থাকি এবং ফরমাস করিলেই অধীনস্থ কর্মচারী, বরকন্দাজ ও পাইকরা হুকুম তামিল করিতে পারিলে নিজেদের ধন্য মনে করে।

পাইক মহম্মদকে ডাকিতে গিয়া মনে পড়িয়া গেল ছয়-ছয় জন পাইকই উহাদের পরবের অজুহাতে ছুটি লইয়াছে। বরকন্দাজ দুইটি হাটের নূতন ইজারাদারের নিকট সেলামীর টাকা সংগ্রহ করিতে সকালেই রওয়ানা হইয়াছে। কচিমুদ্দীন মিঞা—সেও তো আমারই ফরমাসে নিষিদ্ধ মাংসের সরবরাহ করিতে সন্ধ্যার আগেই চলিয়া গিয়াছে। আমি জাতে কুলীনব্রাহ্মণ ; কুক্কুটের মাংস তো সকলকে জানাইয়া ভক্ষণ করিতে পারি না—অথচ প্রৌঢ় বয়সে একটু বলকারী খাদ্য পেটে না গেলে খাটিব কেমন করিয়া! বয়সটা ঝিমাইয়া আসিতেছে—সেই কারণেই টনিক হিসাবে, ম্লেচ্ছদের খাদ্য বাধ্য হইয়াই ব্যবস্থা করিয়াছি—কতকটা তিক্ত ঔষধ গলাধঃকরণের মত। ওদিকে বামুন-ঠাকুর রান্নাঘরে ঔষধের অনুপান তৈয়ারী করিতেছিল—অর্থাৎ ঢাকাই পরোটা। অনুপানের ফলাফল নির্ভর করে প্রস্তুতকারীর একনিষ্ঠতা ও শুচিতার উপর। আমি বিশুদ্ধ অনুপান প্রস্তুতে বিঘ্ন ঘটাইতে সাহস পাইলাম না।

কি আর করি নিজেই উঠিলাম, তাওয়া দিয়া এনামেল উঠিয়া যাওয়া থালার উপর হইতে তামাক লইতে যাইব এমন সময় বেড়ার পাশেই উঠানে ফোঁস্ করিয়া সন্দেহজনক ও ভীতিপ্রদ শব্দ শুনিলাম। জমিদার বাড়ীর পুরাতন আলো ফরাসী দেশের ওজনে অসম্ভব রকমের ভারী। হাতে তোলা যায় না—ঠেলা মারিয়া দাওয়ার কিনারায় আনিতেই দেখিলাম যমদূত গোক্ষুরার সহিত একটি বৃহৎ নেউলের বোঝাপড়া চলিয়াছে। উহার নিকট যাওয়া ঠিক নয়। দ্রুত দোনলা বন্দুকটা আনিতে ঘরে ঢুকিলাম। আমি আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে বেশি সাবধানী। বন্দুকটি আলমারি হইতে বাহির করিয়া আলোর সাহায্যে নলের ভিতরটা দেখিয়া দমিয়া গেলাম—মরিচা পড়িয়া একেবারে বালির দানার মত হইয়া গিয়াছে ; গুলি চালাইলে আত্মরক্ষা অপেক্ষা আত্মঘাত হইবার সম্ভাবনা বেশি। কিছুদিন আগে বালীহাঁস মারিতে গিয়াছিলাম......বন্দুকটা জলে পড়িয়া যায়। বুদ্ধিমান ফাউএর চাকর উপরটা পরিস্কার করিয়া ভিতরটা জলশুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন একটা কিছু করিতে না পারিলে রাত্রিতে ঘুমই হইবে না। বল্লমটা আমার শয়ন গৃহের বেড়াতে আটকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তুলিয়া লইলাম, তাহার পর বামুন ঠাকুরকে

ডাকিয়াও যখন কোন সাড়া মিলিল না তখন একলাই চলিলাম। দ্বন্দ্বের শেষে বিষধর আমার শয়নগৃহে যে যাইবে না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? সাপকে দৃষ্টির আড়ালে যাইতে দেওয়া হইবে না। আলোটা আগাইয়া ধরিতে দেখিলাম গোক্ষুরা মাটি হইতে প্রায় দেড়হস্ত ঊর্ধ্বে ফণা ফুলাইয়া দুলিতেছে। সিন্দুরবর্ণ চক্ষু দুইটা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে। নেউলের চোখও রক্তবর্ণ......রোঁয়া সজারুর কাঁটার মত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে......লেজটা মোটা হইয়া বামে দক্ষিণে দুলিতেছে—এমনি সময় ফোঁস করিয়া ছোবল পড়িল—ভীতিপ্রদ শব্দ। ভিতরটা রি রি করিয়া উঠিল। ছোবল পড়ার পর মুহূর্তেই দেখিলাম নেউল লাফ মারিয়া সাপের পিছনে চলিয়া গিয়াছে—সাপও ফিরিয়া পূর্ব্ববৎ অবস্থায় থাকিয়া থাকিয়া দুলিতেছে, ফণার পিছন দিকটা পুরাপুরি চওড়াভাবে পাইলাম......ছুঁড়িলাম বল্লম—ঠিক লাগাইয়াছি। একেবারে মাথার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া সাপশুদ্ধ ডগাটা স্যাঁৎস্যাঁতে নরম মাটির ভিতর গাঁথিয়া গিয়াছে। সাপের দেহটা ওলোট পালোট করিতেছে। প্রত্যেকটি আছাড় নরম মাটির উপর যেন তাহার দেহের এক একটি ছাঁচ রাখিয়া দিতেছে। বেজীকে আর দেখিতে পাইতেছি না, হয়ত আমাকে দেখিয়া আগেই পালাইয়াছে। ফিরিয়া দাওয়ায় উঠিতে কুকুরটার আচরণ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম; চোখের সামনে সাপ ও নেউল দেখিল অথচ কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। কৌতূহলী হইয়া যে স্থানটিতে বল্লম চালাইয়াছিলাম সেইদিকে ফিরিলাম। বল্লম যথাস্থানে বাঁকা অবস্থায় গাঁথিয়া আছে বটে কিন্তু সাপ নাই। লাঠির আকারের যাহোক কিছু খুঁজিতেছিলাম। সামনেই মুর্শিদাবাদের সৌখীন মোটা ছড়িটা দেখিলাম তাহাই তুলিয়া লইয়া উঠানে নামিয়া পড়িলাম। এতটা দৃষ্টিভ্রম তো সম্ভব নয়! পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন। নিকটে আসিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে সত্যই ঘটনাটি অদ্ভুত লাগিল। সড়্‌কি যথাস্থানে বিঁধিয়া আছে। কিন্তু সাপের কোন চিহ্নই সেখানে নাই, নেউলের নখের দাগও দেখিলাম না। কেমন একটা খটকা লাগিয়া গেল। ভুলোকে (আমার কুকুরের নাম) ডাকিতেই লেজ নাড়িতে নাড়িতে আমার নিকট ছুটিয়া আসিল। যে স্থানে বেজী ও সাপের দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল সেখানে গন্ধ শুঁকাইলাম। তাহার স্বাভাবিক আচরণে কোনরূপ বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইল না। ঘটনাটা গোলমেলে

ঠোকিতেছিল। এবার বেশ জোর গলায় বামুনঠাকুরকে ডাকিলাম—সাড়া নাই। রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলাম। আমি স্বয়ং নায়েববাবু ডাকিতেছি—উত্তর দেয় না, এতবড় স্পর্ধা? ঠাকুরের বুজরুকি এখুনি ঠিক করিয়া দিতেছি। লণ্ঠন লইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিলাম। রসুইঘর একটু দূরে। পুরাতন কোঠা বাড়ীর বাঁধানো প্রশস্ত রোয়াক পার হইলেই একটি ছোট্ট মেটে উঠান,
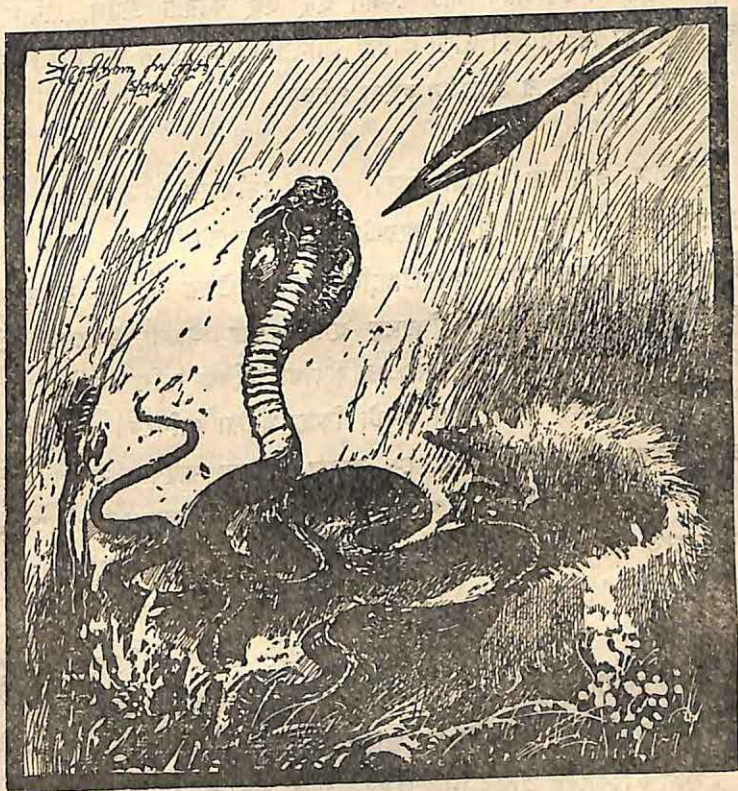
ছুঁড়িলাম বল্লম—ঠিক লাগাইয়াছি

তাহার পরই রান্নাঘর। রোয়াকে আসিয়া উপস্থিত হইতেই ছাতলাপড়া প্রাচীন দেওয়ালের নিচে ছোট ও মজবুত কবাটের লোহার শিকলটা ঝনাৎ করিয়া পড়িয়া গেল। যেন অদৃশ্য নরহস্তের দ্বারা শিকলটা স্থানচ্যুত হইয়াছে। শিকল খোলার শব্দ আমার ভাল লাগিল না। বামুনঠাকুর কাছেই আছে

ভাবিয়া শিকল খুলিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হইয়া গেলাম! দরজার নিকট আসিয়া দেখিলাম শিকলটি তখন মৃদু মৃদু দুলিতেছে কিন্তু বৃহৎ তালার সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে। এক মুহূর্তের ভিতর চাবির সাহায্যে তালা খোলা—শিকল ফেলিয়া দেওয়া এবং তৎপরে আবার তালা পূর্বস্থানে লাগাইয়া বন্ধ করা...প্রস্তুত অবস্থায় অতি ওস্তাদ ঐন্দ্রজালিক ছাড়া সাধারণ মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। গাটা কেমন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল......বামুন-ঠাকুরকে শিক্ষা দিব বলিয়া তাড়া করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন তাহাকে নিকটে পাইয়া সাহস বাড়াইবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

ঢুকিলাম রান্নাঘরে। রান্না কতটা হইল দেখিবার অজুহাতে। ঠাকুর সেখানে নাই। উনুনের উপর পরোটা ভাজা চেপ্টা কড়াটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। মেঝেতে, বেলা পরোটাগুলি থালার উপর সাজান রহিয়াছে। বেল্না মাটির উপর পড়িয়া গিয়াছে—হ্যারিকেনের আলো উনানের অতি নিকটে রহিয়াছে। ঘরের আসবাবপত্রের অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম ঠাকুর ঘরে রাঁধিতে উঠিতেছিল, এমন সময় একটা কিছু ঘটিয়া থাকিবে। পালায় নাই তো? কিন্তু আলো না লইয়া সে বাসার বাহিরে যাইবার সাহস পাইল কেমন করিয়া? এ অঞ্চলে সন্ধ্যার পর আলো না লইয়া ভাল শিকারীও বন্দুকহস্তে একলা হাঁটিতে সাহস পায় না। চিতাবাঘ, বন্য কুকুরের পাল ও নেকড়েতে ভর্তি। তবে কি ঠাকুরের পুরাতন মৃগীরোগ ফিরিয়া আসিল না কি? কোথাও অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া নাই তো? ভাবিলাম একবার পাতকূয়ার তলাটা ঘুরিয়া আসি। লণ্ঠন তুলিয়া পাতকূয়ার তলায় গেলাম—ঠাকুর সেখানে নাই। বেশ চীৎকার করিয়াই ডাকিলাম। কোন উত্তর পাইলাম না; কেবল চীৎকারের প্রতিধ্বনি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাইয়া ঘুরিতে লাগিল। নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতেছিলাম। একটি লণ্ঠন আগেই সঙ্গে আনিয়াছিলাম। রান্নাঘরের আলোটাও লইয়া ফিরিলাম আটচালার দিকে। মাঝের ঘরে একটি রাখিয়া অপরটি দাওয়ায় কোণঠাসা করিলাম।

ঘটনাগুলি অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। বল্লমটা স্পর্শ করিতে সাহস পাইলাম না, মাটিতে গাঁথা অবস্থাতেই রহিয়া গেল! একটি সৌখিন লাঠির

উপর নির্ভর করিয়া থাকাটাও যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া তাড়াতাড়ি শয়নগৃহে আলমারী হইতে আবার মরিচা পড়া বন্দুক বাহির করিলাম এবং হ্যারিকেন লণ্ঠন হইতে অনেকটা কেরোসিন তৈল বাহির করিয়া, বেড়ার লাঠি ভাঙিয়া, গেঞ্জিটা ছিঁড়িলাম—যতটা সম্ভব নলের ভিতর পরিষ্কার করিলাম, তাহার পর একদিকে এল্-জি (বড় দানার ছর্‌রা), অপরদিকে লিথেল-বল পুরিয়া লইলাম। ভরা বন্দুক হাতে লইতেই মনে বেশ বল আসিল। বন্দুক-হস্তে লিখিবার স্থানে আসিয়া বসিলাম। মনে মনে কচিমুদ্দিনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম, সেই কখন গিয়াছে—ফিরিবার নাম নাই। পরক্ষণেই মনে হইল ম্যালেরিয়া তাহাকে মাঝপথে চাপিয়া ধরে নাই তো? আজই তো তাহার জ্বরের পালা। কচিমুদ্দিন যদি জ্বরে পড়িয়া থাকে, সেই কারণে বামুনঠাকুরের অন্তর্ধান হইবার কথা তো নয়। ঠাকুরকে কি ভাবে শাস্তি দিব, তাহার একটি ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করিয়া ফেলিতেছিলাম। এমন সময় শুনিলাম পোড়োবাড়ির দরজাটা একটু করিয়া খুলিতেছে, আবার বন্ধ হইয়া যাইতেছে—মরিচাপড়া কব্জার আওয়াজ—কিছুমাত্র ভুল করি নাই—কারণ ভুলোও কান খাড়া করিয়া শব্দ শুনিতেছিল। হঠাৎ সে "ঘেউ" করিয়া রান্না-ঘরের দিকে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল, আমি তাহাকে যাইতে দিলাম না, ধরিয়া রাখিলাম। কেন জানি না নিজের প্রতি নির্ভরশীলতা হারাইয়াছিলাম। ভুলোকে পাশে বসাইয়া রাখিলাম। তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বেশ খানিকটা সময় কাটিয়া গেল, নিস্তব্ধতা সমস্ত গ্রামটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পুরাতন ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। ঠাকুর ও কচিমুদ্দিনের আশা ছাড়িয়া দিলাম—তাহারা আর আসিবে না। মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে একলা ঘুমাইতে সাহস পাইলাম না। ভাবিতেছিলাম তবে গুজবটা সত্য। কোনও প্রকারে রাত্রি কাটাইতে পারিলে কাল সকালে নীলকরদের কুঠী ছাড়িয়া পালাইব। ম্যানেজারবাবুকে সমস্ত ঘটনা বলিলে নিশ্চয় তিনি কিছু ব্যবস্থা করিবেন।

একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম। অকস্মাৎ ভুলো বিকট চীৎকার করিয়া মাঝের ঘরের কবাটের দিকে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পরই লেজ

গুটাইয়া আমার দিকে পাশ ফিরিয়া চলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নড়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না। চোখ দুইটা ছোট হইয়া আসিয়াছে—লাঙগুল একেবারে কুণ্ডলায়িত। আমি ধমক দিয়া ডাকিলাম—"ভুলো!" অত্যন্ত কাঁচুমাচু করিয়া আমার পাশে আসিয়া বসিল এবং থাকিয়া থাকিয়া আড়-চোখে দরজার দিকে তাকাইতে লাগিল। সাপ দেখে নাই—কোন জন্তুও দেখে নাই। চিতাবাঘ দেখিলেও ভুলো ভয় পাইবার পাত্র নহে—জাতে সে বুলটেরিয়ার। দরজার দিকে তাকাইতেই স্পষ্ট দেখিলাম একটি পূর্ণ মানুষের ছায়া। ভুলো তাড়া করিতেই তাহা সরিয়া গেল, কিন্তু একটি বিরাট বাহুর ছায়া রাখিয়া দিল। ভরা বন্দুক বগলে লইতেই, আংশিক ছায়াও অপসারিত হইয়া গেল। কুকুরটা প্রায় আমার দেহ স্পর্শ করিয়া ধুঁকিতেছিল। ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছিল। ঘড়িতে আবার ঘণ্টা পড়িল—বারোটা বাজিল।

হঠাৎ ফটকের দিক হইতে আনুনাসিক কর্কশ বামাকণ্ঠে কে আমার নাম ধরিয়া ডাকিল। ভুলো কান খাড়া করিয়া আছে। আবার সে উঠিয়া দাঁড়াইল—প্রভুর জন্য সে প্রাণ দিতে পারে! যেন সে পূর্ণ জীবন পাইয়াছে; উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমার আদেশ না লইয়াই সোজা ফটকের দিকে ছুটিয়া গেল। ফটকের নিকট তখন পৌঁছায় নাই, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল এবং পর মুহূর্তেই করুণ আর্তনাদ সুরু করিয়া দিল। যেন দারুণভাবে আঘাত-প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি ফটক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিয়া ধরিলাম—ঘোড়ায় তখন আমার আঙগুল আসিয়া পড়িয়াছে। অতি দীর্ঘকায় ও শীর্ণা একটি স্ত্রীলোককে দেখিলাম...ঘোড়া টিপিবার অবকাশ পাইলাম না। মুহূর্তে নারী অদৃশ্য হইয়া গেল। কুকুরটাকে দেখিলাম—সেইখানেই পড়িয়া গিয়াছে—দুই তিনবার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলাম—কোন সাড়া পাইলাম না। বুঝিলাম আমার পরম বন্ধু আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার নিকট গিয়া দেহ স্পর্শ করিবার সাহস পর্যন্ত হারাইয়াছি। সমস্ত পৃথিবীর ভিতর আমি এখন নিতান্ত একলা। বন্দুক ধরিয়া বসিয়া রহিলাম। সময় কাটিতেছিল...একটু তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘড়ির ঘণ্টায় দ্বিপ্রহরের সঙ্কেত পাইলাম... অর্ধঘুমন্ত অবস্থাতেই আবার শুনিলাম সেই কর্কশ আনুনাসিক শব্দের

আহ্বান! সম্পূর্ণ চোখ খুলিয়াছিলাম কিনা মনে নাই...উঠিলাম আলো ও বন্দুক হস্তে—ক্যাশবাক্স খোলা পড়িয়া রহিল। ফটকের নিকট আসিতেই দেখিলাম শুভ্র বসনাবৃত কঙ্কালসার অতি দীর্ঘকায় নারী অনতিদূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে এবং আমারই আগমন অপেক্ষা করিতেছে। সম্মোহিতের মত হইয়া গিয়াছি, তাহার উপর ভয় ও কৌতূহল উভয়ের যোগে মনের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল বুঝাইবার চেষ্টা করিব না। আমি নারীর দিকে অগ্রসর হইতেই সে গতিশীলা হইয়া উঠিল—আমি অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কোথায় চলিয়াছি—কেন চলিয়াছি এবং কাহাকে অনুসরণ করিতেছি প্রশ্ন উঠিল না। কতক্ষণ এইভাবে হাঁটিয়াছি তাহাও মনে নাই। তবে এইটুকু স্মরণ আছে—মোড়লদের চণ্ডীমণ্ডপ—বাগ্দীদের বাঁশঝাড়—বাবুদের গড় পার হইয়া জোড়াসাঁকোর নিকট আসিয়া উঠিলাম। জোড়াসাঁকো ক্ষীণ স্রোতস্বিনী জলের উপর একটি জীর্ণ পোল সুদূর অতীতে প্রস্তুত হইয়াছিল—এখন মধ্যস্থল ভাঙিয়া গিয়াছে। ভগ্নাংশটুকু গ্রামের লোকেরা একরাশ বাঁশ পাতিয়া এবং তদুপরি কাঠ ফেলিয়া কাজ চালাইবার মত করিয়া রাখিয়াছে। পাশাপাশি দুইটি মানুষ চলিতে পারে না। এবং মাঝখানে আসিলে পোল দোলনার মত দুলিতে থাকে।

ঠিক মাঝখানে আসিয়াছি এমন সময় নারী পোলের অপর পারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। বাম হস্তে দেখিলাম একটি অগ্নুত্তপ্ত সরা; হঠাৎ সবেগে দক্ষিণ হস্ত নড়িতেই এক ঝলক আগুন আমার মুখের অতি নিকটে আসিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল—ঠিক অঙ্গারের উপর জোরে ধূলার মত নিষ্পেষিত ধুনা ছুড়িলে যে ভাবে আগুনের ঝলক ওঠে। চক্ষু ঢাকিয়া ফেলিতে বাধ্য হইলাম। পুনরায় তাকাইতে দেখিলাম নারী খালের নীচে নামিতেছে। জল হইতে পোলের উচ্চতা যতই কম হউক দেড় মানুষের অধিক। বর্ষাকালে এখানে পর্যন্ত জল উঠিয়া পড়ে। জলের গভীরতাও এখন এক-হাঁটু হইবে; অথচ সাঁকোর চলিবার পথের এক সমতায় নারীর গলা হইতে মাথা পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছি—ক্ষণিকের জন্য দাঁড়াইল, পরক্ষণে তাহার এক হাত ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। কেবল এক বাহু অবর্ণনীয় ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। হঠাৎ

আবার নামিয়া আসিল। দ্রুত অস্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসাতে যে হাওয়ার সৃষ্টি হইল তাহাতেই লণ্ঠনটা দুই তিনবার দপ্ দপ্ করিয়া উঠিয়া নিভিয়া গেল। নারীকে আর দেখিতে পাইতেছি না—ঘোরতর অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর অন্ধকার সহিয়া আসিতে দেখিলাম নারী সাঁকোর তলা দিয়া

নারী পোলের অপর পারে থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল

চলিয়াছে—যে দিক দিয়া আসিয়াছিলাম সেই দিকে...মাথাটা ক্রমান্বয়ে আমার পায়ের নিকট আসিয়া পড়িয়াছে...হাতের বন্দুক হাতেই রহিয়া গেল, তুলিয়া টিপ করিবার শক্তি পাইলাম না। নারী আমাকে অতিক্রম করিয়া অপর পারে গিয়া উঠিল। মানুষ এইরূপ লম্বা হইতে পারে ধারণা করা যায় না। সাদা

কাপড় দূরে চলিয়া যাইতেছে...ক্রমান্বয়ে তাহা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। মাথাটা ঝিমাইতেছিল...পোলের মাঝেই বসিয়া পড়িলাম।

অনেকক্ষণ একাকী অবস্থায় স্থির ভাবে ছিলাম হয়তো। পিঠের দিকে নখের আঁচড় অনুভব করিলাম। ধীরে ধীরে বন্দুকের বাঁট তুলিতেই আঁচড় বন্ধ হইয়া গেল। মনে হইল যেন কোন চতুষ্পদীয় ছোট জন্তু পোল পার হইয়া গেল! দিয়াশলাই জ্বালাইয়া লণ্ঠনটি ধরাইবার চেষ্টা করিলাম। কেরোসিন তৈলে সিক্ত তুলার পলিতা অগ্নি-শিখার স্পর্শ পাইয়াও জ্বলিতেছে না—যাহা কিছু ঘটিতেছে সবই রহস্যময়। লণ্ঠন নাড়িয়া বুঝিলাম এক ফোঁটাও তেল নাই। বীভৎস নারী শোষণ করিয়া ফেলিয়াছে? না এই লণ্ঠন হইতেই তেল বাহির করিয়া বন্দুক পরিষ্কার করিয়াছিলাম? স্মরণশক্তিও গোলমেলে হইয়া গিয়াছে—আলো না জ্বলিবার কারণ খুঁজিবার মত অবস্থা নাই। হঠাৎ দূরে বোষ্টমদের সমাধিভূমিতে সেই আগুনের ঝলক দেখিলাম—গতিশীল...এখানে—ওখানে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া উঠিতেছে। আতঙ্কের পর আতঙ্ক বরণ করা অপেক্ষা একটা যাহোক চূড়ান্ত কিছু ঘটিয়া যাওয়া ঢের ভালো। লণ্ঠনটা পোলের উপর ফেলিয়াই বন্দুক হস্তে উঠিলাম...... পোল ছাড়িয়া অনেকটা আসিয়া পড়িয়াছি। জোড়াসাঁকোর শ্মশান—অনুমানে ঠিক করিলাম আর বেশী দূরে নাই। বুড়া মোড়লের সমাধি পার হইয়াছি—মাটিটা চট্‌চটে মনে হইল। বুঝিলাম জোড়াসাঁকোর খালের কিনারা দিয়াই চলিয়াছি। চটিটা মাঝে মাঝে এঁটেল মাটিতে আটকাইয়া যাইতেছে। আর একটু অগ্রসর হইতে মনে হইল কেহ আমার পিছু লইয়াছে। আমার চলার গতির সহিত সমতালে এবং একই ব্যবধান হইতে অনুসরণকারীর পাদুকার শব্দ শুনিতে পাইতেছি! সত্যই কি তবে বুড়া মোড়ল? হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল...মরা মানুষ সমাধি হইতে বাহির হইয়া আমাকে অনুসরণ করিতেছে ভাবিতেই আমার চলার ভঙ্গী টাল খাইতে লাগিল—কতকটা মাতালের মত। যাইতেছি তো কাছারীর দিকেই; ছুট দিলে কেমন হয়? চেষ্টা করিলাম —পারিলাম না। মাটি যেন পা দুইটাকে চুম্বকের শক্তি লইয়া টানিয়া রাখিয়াছে। অতি নিকটেই এবার আগুনের ঝলক দেখিতে পাইলাম—আলেয়া?

ভয়ে ঝিমাইয়া আসিতেছিলাম—চলা আর সম্ভব হইল না—যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। স্যাঁৎসেঁতে মাটি ও শিশিরে সিক্ত ঘাসের উপরই বসিয়া পড়িলাম।

লণ্ঠনটা পোলের উপর ফেলিয়াই বন্দুক হস্তে উঠিলাম

আলেয়া হয়তো আমার নিকটেই ঘুরিতেছিল। হঠাৎ আমার সামনে আগুন জ্বলিয়া উঠিল—কোথা হইতে দমকা হাওয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল—সেই শীর্ণা কঙ্কালময়ীকে দেখিলাম দুলিতেছে। ঊর্ধ্ববাহু অকস্মাৎ মাটিতে

চপেটাঘাত করিয়া পুনরায় পূর্ববৎ অবস্থায় দাঁড়াইয়া গেল। মৃত্যু যেন আমার সহিত রসিকতা আরম্ভ করিয়াছে। শীতকাল—দম্‌কা হাওয়া। তৎসহিত দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িয়াছে। তথাপি আমি ঘামিতেছি—কপাল হইতে টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। মৃত্যু যখন দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন তিলে তিলে মরি কেন? বন্দুক তুলিয়া নারীর মাথা আন্দাজ করিয়া ছুঁড়িলাম। এল-জির ঘোড়া টিপিলাম—

মাথাটা উড়িয়া গেল......

নারী কিন্তু পড়িল না। ছিন্নমস্তা অবস্থায় সোজা দাঁড়াইয়া রহিল। বাহু একই ভাবে ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিয়াছে।...মস্তকহীন অবস্থায় কঙ্কাল-ময়ীকে জোড়াসাঁকোর শ্মশানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। মনে হইল ছিন্নমস্তা একই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার সেই ঊর্ধ্ববাহু ধীরে আমার দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। প্রত্যেকটি আঙ্গুলের অগ্রভাগ অতি বৃহৎ নখ দ্বারা সশস্ত্র তো বটেই, অধিকন্তু তালু পর্যন্ত নখে ভরা...হাতের স্পর্শ গলায় অনুভব করিতেছি......যেন চাপিয়া ধরিয়াছে......হিমবৎ শীর্ণ কঠিন বাহু বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং দারুণভাবে হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ দিতেছে। আমার দম বন্ধ হইয়া আসিল।

যখন অল্প অল্প জ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছিল তখন সকাল হইয়া গিয়াছে। আমি মাঠের মাঝে শুইয়া আছি...পাশেই ফণীমন্‌সার কাঁটার ডালপাতা শুদ্ধ কেমন করিয়া আমার গলার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চামড়া অনেকস্থলে নখ দিয়া আঁচড়াইবার মতই ক্ষত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দেহে দারুণ বেদনা... বোধ হয় জ্বরও আসিয়াছে। উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেই বন্দুকের ভারি নলটা বুকের উপর হইতে ঘাসের উপর পড়িয়া গেল।

বন্দুক দেখিতেই গতরাত্রের ঘটনাগুলি বাস্তব হইয়া উঠিল। রৌদ্র উঠিয়াছে। তথাপি দেখিলাম পিছন হইতে একরাশ প্রেতলোকবাসীর ছায়া আমার বুকে গায়ে পায়ের উপর নড়িতেছে......আবার জ্ঞান হারাইতেছিলাম, এমন সময় শুনিলাম আমাদের এলাকার দারোগাবাবুর পরিচিত কণ্ঠ। কচিমুদ্দিনের গলাও যেন কানে আসিল। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া একটু

আশ্বস্ত হইলাম। ভয়ে ভয়ে চক্ষু খুলিতে দেখিলাম সত্যই দারোগাবাবু আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কচিমুদ্দিন আমাকে তুলিয়া বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। এইবার তৃষ্ণা অনুভব করিতে লাগিলাম......হয়তো জল চাহিয়াছিলাম, পিছন হইতে একজন কনেষ্টবল সামনে আসিয়া তাহার লোটা হইতে আমার মুখে সাবধানে কোট সামলাইয়া জল ঢালিয়া দিল।

ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত কচিমুদ্দিন আমার সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। তিন মাসের অধিক হইবে—জোড়াসাঁকোর ঘটনার পর হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছি। বামুন-ঠাকুর কাঠের ক্যাশবাক্স হইতে আমারই হিসাব গরমিলের টাকা—প্রায় চার হাজার হইবে—মারিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। দারোগাবাবু জোর তদন্ত করিতেছেন। আমি জানি সহুরে ইংরাজী শিক্ষিত অনেকেই বলিবেন সব কয়টি ঘটনাই দৃষ্টিভ্রম। অথবা গোড়ার দিকে বামুনঠাকুর টাকা সরাইবার জন্য ভয় দেখাইয়াছিল—শিকল খোলা আর কিছুই নয়, উহার উপর দিয়া ইঁদুর চলিয়া গিয়াছিল। নিশির ডাক ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্কের জাগ্রত ক্রিয়া; কুকুরটাকে হয়তো ঠাকুর বিষ খাওয়াইয়া দিয়াছিল। সব কয়টি যুক্তি মাঠে মারা পড়িলে বলিবেন—গল্পটি উৎকৃষ্ট গাঁজার বিজ্ঞাপন। একান্তই যাহা লিখিয়াছি তাহা গাঁজাখোরের উক্তি কাহার ভাবিবার সাহস থাকিলে আমি অনুরোধ করিব অমাবস্যার মধ্যরাত্রিতে একেলা জোড়াসাঁকোর শ্মশান ঘুরিয়া আসিতে। তবে যিনি দুঃসাহসিকতার যশ অর্জনের নিমিত্ত এই ভয়াবহ স্থানে যাইবেন তিনি যদি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েন অথবা একেবারে ফিরিয়া না আসেন তাহা হইলে আমাকে কেহ দোষী সাব্যস্ত করিতে পারিবেন না।

দাদা

হগ্ মারকেটের মোড়ে ট্রামখানিতেই কন্ডাক্টার তিনজনের কাঁধের উপর দিয়া বাহু প্রসারিত করিয়া দাদার থুৎনির তলায় তালু রাখিয়া বলিল, "বাবু, টিকিট!"

কিন্তু দাদার নিকট হইতে কোন সাড়া না পাইয়া কন্ডাক্টার তর্জনীর দ্বারা দাদার চিবুকের তলায় একটি ঠোনা মারিয়া আবার বলিল, "বাবু টিকিট!"

পুরুষ মানুষের নিকট হইতে ঠোনা খাইলে ব্যবহারটা অস্বস্তিকর হইয়া ওঠে। দাদা টিকিটের কথা শুনিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "টিকিট কবার ক'রে কিনব?" চিবুক-স্পর্শের ব্যাপারটা তিনি কিন্তু চাপিয়া গেলেন, কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

পার্শ্বেই একটি পাঞ্জাবি-পরা কলেজের ছোকরা দাঁড়াইয়াছিল, বগলে লজিকের বই ও নোট লিখিবার খাতা—বুক-পকেটে মাঝারি দামের ঝর্ণা কলম গাঁথা রহিয়াছে। তরুণ বয়সের জীব ঘটনাটি সব দেখিয়াছিল! রুখিয়া দাঁড়াইল, পাঞ্জাবির আস্তিনটা ইতিমধ্যে গোটানো হইয়া গিয়াছে।

দাদা ভাবিলেন, ছোকরা বোধ হয় তাঁহাকে মারিবার জন্যই প্রস্তুত হইতেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে একটি অচল সিকি বাহির করিলেন।

সিকি দেখিয়া ছোক্‌রা আরও রুখিয়া উঠিল, "সে কি মশাই? আপনি আবার ভাড়া দিচ্ছেন?" দাদা চমকিত হইয়া ভাবিলেন, তাও তো বটে। অচল

সিকিটাও পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন। ছোক্‌রা দাদার উপর আদেশপূর্ণ হিতোপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। উপর দিকে মুখ করিয়া চড়া গলায় হুকুম করিল, "এই কন্‌ডাক্‌টার, ইধার আও!" কন্‌ডাক্‌টার অনেকটা ছাতু খাইয়া হজম করিয়া থাকে, বাঙ্গালী ছোক্‌রার হুঙ্কার শুনিয়া কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। দাদাকে ছাড়িয়া ছোক্‌রাকেই ধরিল, "এই—টিকিট।"

'এই' শব্দের প্রয়োগে কিঞ্চিৎ উগ্রভাব ছিল। ছোক্‌রা "চোপ্‌ রও" বলিয়া আরও খানিকটা আস্তিন গুটাইয়া ফেলিল। ছোক্‌রাকে ক্রমান্বয়ে আস্তিন গুটাইতে দেখিয়া ও কন্‌ডাক্‌টারের রূঢ় সম্বোধন শুনিয়া দাদা বালসুলভ ক্ষিপ্রতাসহ ট্রামের কাঠের মেঝেতে বসিয়া পড়িলেন এবং অবসাদগ্রস্ত পক্ষাঘাত রোগীর মত ফুটবোর্ডের দিকে হাঁটিতে লাগিলেন এবং অল্প সময়ের ভিতর বিপদসঙ্কুল কেন্দ্রের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। ট্রামের ব্যাপারটা কতদূর গড়াইল ও ছোক্‌রাটির কি অবস্থা ঘটিল, তাহা জানিবার জন্য দাদার মনে কোনরূপ আগ্রহ দেখা দিল না।

সত্য কথা বলিতে হইলে বলিব, দাদা ভাড়া দেন নাই এবং কোন দিনই পারত পক্ষে দেন না। তাঁহার মতে দেওয়ার কথাও নয়। যে মানুষকে মাসে ৩৫্ টাকা মাহিনার ভিতর তিনটি কন্যা, দুইটি পুত্র এবং একটি গোটা পত্নীর অন্ন-সরবরাহ করিতে হয় সে ট্রামের ভাড়া দিতে বাধ্য থাকিবে কোন্‌ যুক্তিতে।

দাদাকে উপলক্ষ্য করিয়াই চলন্ত ট্রামের মধ্যে হয় ত দাঙ্গা চলিয়াছে, আর রাস্তার ফুটপাথের উপর দিয়া দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে দাদা অচল সিকিটি পকেট হইতে বাহির করিয়া বার বার মাথায় ঠেকাইতেছেন। সিকিটি অচল অবস্থায় দীর্ঘকাল ধরিয়া দাদার পকেটে পকেটে ঘুরিতেছে। ট্রামে গতায়াতের সময় এই বিশেষ মুদ্রাটির বেশী রকম প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। ট্রামে উঠিয়া অনেকটা পথ অগ্রসর হইলে অপরিচিত কন্‌ডাক্‌টার যখন ভাড়া চাহিয়া বসে তখন নানা পকেট সন্ধান করিয়া ভাবটা দেখান—ঐ যা, টাকার থলিটা ফেলে এসেছি—এখন উপায়! কন্‌ডাক্‌টার ইতিমধ্যে অন্য যাত্রীদের নিকট ভাড়া সংগ্রহ করিতে থাকে। দাদাও অনেকটা পথ অগ্রসর হইয়া যান। কন্‌ডাক্‌টার ফিরিয়া আসিয়া আবার যখন তাগাদা দেয় তখন অচল সিকিটা দিয়া দেন। মুদ্রার অতি মসৃণ স্পর্শানুভূতি কন্‌ডাক্‌টারকে সন্দিগ্ধ করিয়া তোলে।

এপিঠ ওপিঠ ঘুরাইয়া দেখে, তাহার পর বলে, "এ ত চলবে না।" দাদা তখন মুখখানা রীতিমত গম্ভীর করিয়া অন্য দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন। এসব ঘটনায় এমন হিসাব করিয়া একের পর এক যোগ দিতে থাকেন যাহার ভিতর ট্রামের ঘূর্ণমান চক্র তাঁহার গম্য স্থলের প্রায় নিকটে আসিয়া পড়ে। দাদাও অমনি গম্ভীরমুখে বলেন, "যদি না চলে ত কি করছি বল...নেমে যাই।" কন্‌ডাক্‌টার আপত্তি করে না। সিকিটা আবার যথাস্থানে চলিয়া যায়, দাদা ট্রাম হইতে নামিয়া পড়েন। এদিন দাদা বাকী পথটা পায়ে হাঁটিয়াই শেষ করিয়া দিলেন।

আপিসে ঢুকিবার আগে কে একজন বলিয়া উঠিল, "ঐ রে, দাদা দি শ্লাই ফক্স আসছেন, নস্যির কৌটো সামলাও।" আপিসের টেবিলে বসিয়াই দাদা পাশের ভদ্রলোকটাকে বলিলেন, "রামু ভাই, মনে আছে ত কাল শনিবার?"

রামু উদাসকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ—কিন্তু টিপ্‌, টাকা ও পাশ কোনটাই জোগাড় হয়নি।"

দাদা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন একটা উইন্‌ ধরিয়া কালই তেলের বাকী টাকাটা শোধ করিয়া দিবেন। কাপড়গুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে তাহা কিনিতে হয়। যে কয়টি গোটা কাপড় আছে তাহাও রজক আটকাইয়াছে। বাকী টাকা না পাইলে সে কিছুতেই কাপড় ফেরত দিবে না। হাজার হোক, ধোপা ছোটলোক ত? তথাপি তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। সব কিছুই একটা বাজী ধরিয়া সামলাইয়া লইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। রামু সঙ্কল্প ফাঁসাইয়া দিল। টিপ্‌ ও টাকা সংগ্রহ হয় নাই কেন দাদা বুঝিলেন। ঘোড়দৌড়ের টিপ্‌ সংগ্রহ করিতে হইলে অগ্রিম টাকা ফেলিতে হয় আর টাকা সংগ্রহ না হওয়ার কারণ রামু তাঁহার টিপ্‌ বিশ্বাস করে নাই। লোকটা একেবারে বোকা। টাকা পাওয়া যায় নাই তাহা না হয় বুঝিবার সঙ্গত কারণ আছে; কিন্তু সিনেমার পাশ পাওয়া গেল না কোন্‌ কারণে?

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু সিনেমার পাশটা?" দাদা সহজে দমিবার পাত্র নহেন। পাশটা বলিয়া চেয়ারের উপর দোদুল্যমান পা দুইটা তুলিয়া বাবু হইয়া বসিলেন। তাহার পর রামুর স্বর্গীয় পিতার অসংখ্য গুণকীর্তন

করিয়া বলিলেন, "এও কি একটা কথার কথা। তোমার সাক্ষাৎ ভগ্নীপতি টিকিট কালেক্টার, আর তুমি পাশ পেলে না—মাত্র দুটো পাশ?"

রামু ইতিমধ্যে কাজে মন দিয়া ফেলিয়াছে। না দিয়াই বা করে কি? দাদা এখন থামিবেন না। লেজার খাতা খুলিতেই একটি সাংঘাতিক নাম রামুর চোখের সামনে পড়িয়া গেল—হট্ ফেভারিট্ একটি ঘোড়ার নাম এবং ব্যাঙ্কের হিসাবের পরিবর্তে ঘোড়া কোন্ দিন কয় মিনিট কয় সেকেণ্ডে কত ফারলং ছুটিয়াছে তাহার তালিকা ও তালিকার নীচেই তুলনাসূচক হিসাব। নম্বর দেওয়া পাতা ছিঁড়িবারও উপায় নাই।

ভীতভাবে দাদার দিকে তাকাইয়া রামু বলিল, "এ কি সর্বনাশ করেছেন আপনি—আমার লেজার বইটের খাতায় রেসের টিপ্ লিখে রেখেছেন?"

দাদা তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর করিলেন, "কাল ওটা ভুল হয়ে গেছে, বেয়ারার দোষ। যাক, ঘোড়ার বংশ ইতিহাস না লিখে ভালই করেছি। সকলে জেনে ফেলত।"

রামু অধীর হইয়া বলিল, "সে কি দাদা! বড়বাবু দেখলে আমার চাকরি যাবে যে!"

দাদা তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন, "হ্যাঃ, চাকরি গেলেই হ'ল কিনা! ও টিপ্ ত বড়বাবুর জন্যই বার করেছিলাম। দেখ না, সামনের কাল বড়বাবু আমাকে কি রকম তোয়াজ করেন। আমি নিশ্চয় বলে দিচ্ছি, এ টিপ্ ভুল হবার নয়। একেবারে তিন-চার লেংথে বাজী মেরে দেবে। বড়বাবু ফুলে বাড়ী ফিরবেন।"

রামু। কিন্তু আমার লেজারটায়...অ্যাঁ!

দাদা। আরে চেপে যাও না। ঘোড়ার নামটা কেটে দাও, তা হ'লেই হবে।

রামু। শুধু ঘোড়ার নাম কাটলে কি হবে। আরো কত কি লিখেছেন—সেগুলো?

দাদা। হ্যাঃ, তুমিও যেমন। এইদিকে খাতাটা আনো...

রামু উৎকণ্ঠিত হইয়া দাদার টেবিলে খাতাটা রাখিয়া দিল, যদি উদ্ধারের কোন পথ বাহির হয়। দাদা অবলীলাক্রমে একটা কালিভর্তি মোটা দোয়াত পাতাটার উপর উল্টাইয়া দিলেন। রামু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—"করলেন কি?"

দাদা বলিলেন, "আরে চেপে যাও না!"

এই সময় রামু লক্ষ্য করিল, বড়বাবু দাদার টেবিলের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

তাড়াতাড়ি দাদার গা টিপিয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "বড়বাবু আসছেন। এখন উপায়?"

দাদা লেজারের দিকে মুখ রাখিয়াই দোয়াতটাকে রামুর দিকে গড়াইয়া দিলেন। যেটুকু অবশিষ্ট কালি ছিল, তাহা রামুর ধোপদুরস্ত শার্টকে বিচিত্রিত করিয়া দিল। বড়বাবু ঘটনাটি দেখিয়া দাদার টেবিলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার আগেই দাদা রামুকে ধমক দিয়া বসিয়াছেন, "কি কাণ্ড তোমার!"

বড়বাবু। আপিসটা কি তোমাদের হোলী খেলার জায়গা মনে করছ?

দাদা অভ্যাস মত মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, "স্যর, রামুর নড়াচড়াতে দোয়াতটা লেজারের উপর উল্টে গেল।"

বড়বাবু। অ্যাঁ লেজারের উপরে! দেখি!

যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাকেও মাথায় হাত দিতে হইল। বড়সাহেব হিসাবের খাতা এইরূপ দেখিলে তাঁহার চাকরি থাকিবে? উত্তেজনায় তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে নিজের কামরায় ঢুকিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রামু ও দাদার ডাক পড়িল।

রামু বেচারা অত্যন্ত নিরীহপ্রকৃতির মানুষ। কাতরভাবে দাদাকে বলিল, "এখন কি হবে দাদা—তুমি আমার এ কি করলে?" দাদা "চেপে যাও না।" বলিয়া বড়বাবুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, মাঝপথে প্রায় আদেশ করিয়াই বলিলেন, "একটা সিনেমার পাশ বার করে ফেল, তাগ বুঝে বড়বাবুর হাতে গুঁজে দিতে হবে।"

প্রায় আধঘণ্টা কাল সময় কাটিয়া যাইবার পর দেখা গেল, উভয়েই হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিতেছেন।

টিফিনের ঘণ্টা পড়িল। দাদা বলিলেন, "রামু, তোমাকে ত বাঁচিয়ে দিলাম, মাড়োয়ারীদের হিং-এর কচুরী আর ডালমুট কিছু খাইয়ে দাও।"

রামু বলিতে চাহিয়াছিল, আমাকে বাঁচালেন কি রকম। নিজের কুকীর্তি

ঢাকবার জন্যে আমাকে জড়ালেন, আর...

দাদা অন্তর্যামী, বলিলেন, "না হয় একটু কালি ফেলেছি। তাই বলে দাদাকে খাওয়াবে না? তোমার বাবা এ দিক দিয়ে দিল্‌দরিয়া লোক ছিলেন। তাঁর কাছে খেতে চাইলে কি খুশীই হতেন। বিশেষ ক'রে আমার প্রতি।" সত্য ঘটনার সহিত দাদার উক্তির কোন সম্বন্ধ নাই। রামুর বাবা আমাদের দাদা দি শ্লাই-ফক্সকে চিনিতেন না। রামু পূর্ব ঘটনা ভুলিয়া আসিতেছিল। দাদার মিষ্টবাক্যের প্রবাহে পড়িলে জেল-ফেরতা পাকা চোর পর্যন্ত গলিয়া যায়, রামু ত কোন্ ছার!

দাদার যকৃতের ক্রিয়াও অসাধারণ। পরের পয়সায় উড়ন্ত ঘুড়ি ভাজিয়া খাওয়াইলেও হজম করিয়া ফেলিতে পারেন। গোটা পনের হিং-এর ফুল্‌কা কচুরী ঘুড়ির কাগজের তুলনায় কিছুই না। সাড়ে তের আনার কচুরী ও কয়েকখানি উপরি হিসাবে আদায় করিয়া উদর-গহ্বরে চালাইয়া দিলেন। তাহার পর তৃপ্তির সহিত একটি ঢেকুর তুলিয়া বিস্ময়বিহ্বল রামুকে দেখাইয়া দিব্য সহজকণ্ঠে বলিলেন, "এই যে বাবু দাম দেবেন।"

রামু হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দাদা অসঙ্কোচে আফিসের দিকে চলিয়াছেন।

বৃদ্ধ মাড়োয়ারী ফুটপাথের ধারে বসিয়া কচুরী বিক্রয় করিলে কি হয়, ব্যবসাবুদ্ধিতে সে কাঁচা নয়। ব্যাপারটা বুঝিয়া সে রামুর কোঁচা ধরিয়া বলিল, "এক রুপিয়া আঢ়াই পইসা!" রামু ঘায়েল হইয়া গিয়াছে। পকেটে মাত্র কয়েক আনা পয়সা আছে, তাহা হইতে ট্রামের ভাড়াও দিতে হইবে। ফাঁপরে পড়িয়া বলিল, "আমার সঙ্গে এস, আপিস থেকে জোগাড় ক'রে দিচ্ছি।"

অনিশ্চয়তাকে ব্যবসাদার বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইল না। বলিল, "তুম্‌হারা চান্দিকা বুতাম দে যাও।"

উপায়ান্তর না থাকায় বেচারা রামু বোতাম খুলিয়া দিল, তারপর দাদাকে তিরস্কার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আপিসের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দাদা ভীষণ মনঃসংযোগে খাতা দেখিতেছেন। দাদা যখন খাতা দেখেন তখন স্বয়ং বড়বাবু পর্যন্ত তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহস পান না। কারণ বাস্তবিকই তিনি হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে আপিসে নিজের প্রতিপত্তি

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এদিক দিয়া বড়সাহেবকেও তিনি ভয় করেন না। রামু দাদাকে কাজে নিবিষ্ট দেখিয়া আত্মসংযম করিল।

এ দিন আর দাদাকে হিসাবের খাতা হইতে একটিবারও দৃষ্টি ফিরাইতে দেখা গেল না। রামুর দাদার সহিত আলাপ করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল ; হিসাবের গহন বনে দাদা যেন ধ্যানমগ্ন ঋষি! সাড়ে পাঁচটার ঘণ্টা পড়িলে আফিস বন্ধ হইয়া গেল। রামু শশব্যস্তে মাড়োয়ারীর দোকানে ছুটিল তাহার চাঁদির বোতাম উদ্ধার করিতে, দাদাকে আঘাত দিবার কথা সে একদম ভুলিয়া গেল। দাদা গম্ভীরমুখে আফিস হইতে বাহির হইয়া ট্রামের দিকে চলিলেন।

বৈকাল কাটিয়া গিয়া শনিবারের সন্ধ্যা জমকাল হইয়া আসিতেছিল। পাশ পাওয়া যায় নাই। দাদা বাড়ীতেই বসিয়া আছেন, এমন সময় অতর্কিত-ভাবে তেলওয়ালা জানালার ধার হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "বাবু বাড়ী আছেন?"

দাদা দেয়ালের দিকের কোণাটায় তক্তাপোশের উপর বসিয়া তাঁহার ফেভরিটের বংশ-পরিচয় পড়িতেছিলেন। এমন সময় তেলওয়ালা বলিল, "বাবু বাড়ী আছেন!"

বেরসিক কি গাছে ফলে? কোণে বসিয়াছিলেন, সুতরাং তাগাদাদার তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। সুযোগটা দৈব-প্রেরিত। বড়মেয়েকে ইশারায় জানাইয়া দিলেন, শীগ্‌গির লেপ নিয়ে আয়।...এমত অবস্থায় কি করিতে হয়, গৃহস্থের বাড়ীতে সকলেই শিখিয়া ফেলিয়াছিল। গ্রীষ্মকালে সুস্থাবস্থায় লেপের ব্যবহার কৌতূহলোদ্দীপক। দাদা মুখ পর্যন্ত লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাহার পর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। সে কি কাঁপুনি!

তেলওয়ালা ঘরের দরজার সামনে আসিয়া বলিল, "বাবু কোথায়?"

কন্যা লেপ-মুড়ি-দেওয়া পিতাকে দেখাইয়া দিয়া গুণচটের আড়ালে রোয়াকের পিছনে চলিয়া গেল।

দাদা তখন সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া লেপের ভিতর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিয়া চলিয়াছেন।

তেলওয়ালা বলিল, "সে কি, বাবুর আবার জ্বর এলো নাকি?"

দাদা লেপের ভিতর মুখ রাখিয়াই জড়িতকণ্ঠে বহুকষ্টে বলিলেন, "আর ভাই, বল কেন, এই একটু আগে বেশ ছিলাম—এই দেখ না—ম্যালেরিয়া কি না...উহুহু...বড্ড শীত গো বড্ড শীত...তেলওয়ালা...মারা গেলাম হে, মারা গেলাম...আজ ভাই তা হ'লে এসো...কথা বলতে পারছি না...উহুহু—"
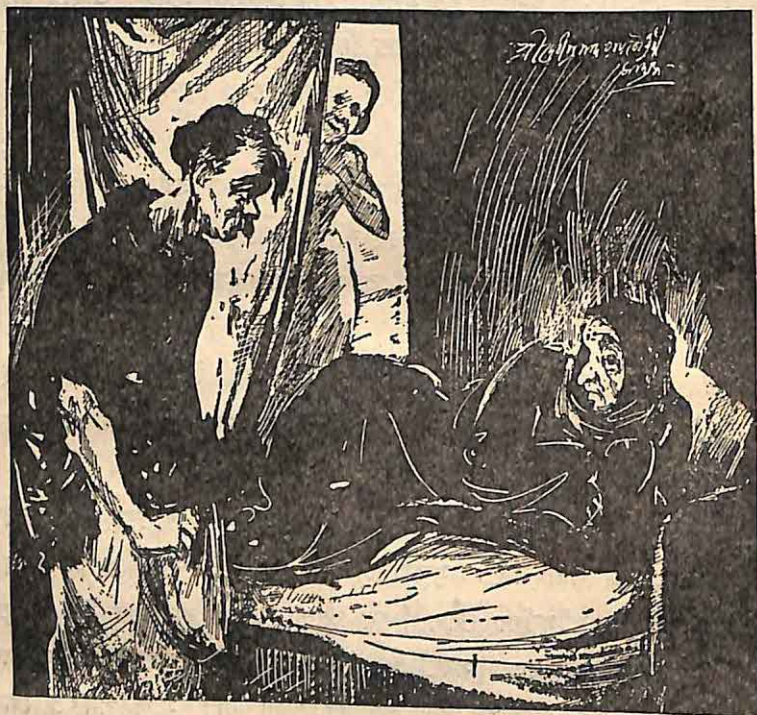
মারা গেলাম হে, মারা গেলাম...

তেলওয়ালা এবার কড়া হইবে বলিয়াই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। এ ত মজার চালাকি! যখনই তাগাদা করিতে আসিবে, তখনই দেখিবে বাবু জ্বরে কোঁকাইতেছেন। বাবুর জ্বরও চমৎকার! সঙ্কল্প যাহাই করিয়া আসুক, জাতে সে বাঙ্গালী। কত আর কঠোর হইতে পারে? ভদ্রলোক ঠক্ ঠক্ করিয়া জ্বরে কাঁপিতেছেন, তাঁহাকে কি আর পাওনার জন্য তাগাদা করা চলে? অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁপুনি দেখিয়া কাল আসিব বলিয়া তেলওয়ালা

ফিরিল। রাস্তায় নামিয়া ভাবিতে লাগিল, কাল যদি জ্বর থাকে ত নিজে কপালে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া লইবে।

দাদার জানালাটার অনেক সুবিধা আছে। মুখ বাড়াইলে মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। সোমত্ত বড়মেয়ে বেশ খানিকটা গলা বাড়াইয়া দিয়া বাবাকে বলিল, "মোড় ফিরেছে।"

পনের মিনিট কাল মোটা লেপের তলায় থাকিয়া সমস্ত দেহটা ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। উঠিয়া বসিয়া ছেঁড়া গামছাটা দিয়া দেহ নিঃসারিত ক্লেদ মুছিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বলিলেন, "ওরে...লেপটা কাছেই রাখিস, আবার দরকার হতে পারে। আজ আবার ধোপা আসবে বলেছে! যত সব ছোটলোক...বুঝলি তো?"

বড়মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল, ছোটলোক আসিলে কি করিতে হইবে সে জানে। জ্বর ডাকিয়া না হয় তেলওয়ালা ও ধোপার মত বাজে লোকদের অত্যাচার হইতে বাঁচা গেল, কিন্তু সকালে চায়ের বন্দোবস্ত হয় কেমন করিয়া? মুদি পণ করিয়াছে নগদ দাম না পাইলে সে কিছুই বিক্রয় করিবে না। দাদা ভাবিলেন, ব্যবসা বুদ্ধিতে পাকা রকম কাঁচা না হইলে এইরূপ মন্তব্য কেহ প্রকাশ করে? ছোটলোক কিনা তিন পয়সার চা বিক্রয় করতেই ভয়ে অস্থির!

রাস্তার আলো জ্বলিতেই দাদা সুসজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। রামুর বাড়ী গিয়া কোন লাভ নাই। সে এমন কাঁচা ছেলে নয় যে নিজের জন্য একটি পাশ রাখিয়া সবই বড়বাবুকে দিয়া দিয়াছে। সে যে পাশগুলি প্রতি শনিবারই সস্তা দামে বিক্রয় করিয়া থাকে—আর সেই পয়সায় তার পান সিগারেটের খরচ চলে, এ খবর দাদার অবিদিত নয়। সে যাহাই হউক, দাদা আমাদের অচল সিকি ও উপরি দুই আনা পয়সার উপর নির্ভর করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। শনিবারের সন্ধ্যায় ঘরের ভিতর বসিয়া থাকা যায়?

বার দুই ট্রাম বদলাইতেই দাদা মেট্রোর নিকট আসিয়া পড়িলেন। সিনেমা দেখা নাই হইল, সিনেমা-দর্শকদের ত দেখা চলে? দাদা বাছিয়া বাছিয়া দর্শক দেখিতেছিলেন। পায়চারি করিতে করিতে তাঁহার নিজের অজ্ঞাতে একটি পানের দোকানের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন—

একটি ক্রেতা ধপ্‌ধপে ডব্‌ল্‌ ব্রেস্ট শার্টের উপর কোট চড়াইয়া ময়লা কোঁচানো ধুতি পরিয়া বিড়ি কিনিতেছে। ঠিক এই রকম ধরণের মানুষ তিনি খুঁজিতেছিলেন। অর্থাৎ শহুরের মত চালাক নয়, অথচ পুরা মাত্রায় সৌখীন। নিজে হাতে কাপড় কুঁচাইয়া যে চাল মারিতে বাহির হয় তাহার মত বোকা পাইলে ছাড়িতে আছে? যেন দীর্ঘকালের পরিচয়। নিকটে আসিয়াই বলিলেন, "কি রকম আছ ভাই? চেহারা একদম বদলে গেছে... ইস্‌ তোমাকে চেনবার উপায় নেই। তা পিসিমা ভাল আছেন? বাড়ীর অন্য খবর সব ভাল? তোমার মেয়ে কতবড় হয়েছে?..." ইত্যাদি প্রশ্নমালা এমনভাবেই বাড়িয়া চলিতে লাগিল যে লোকটি উত্তর দিবার অবকাশ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাইল না।

দাদা তখনও বলিয়া চলিয়াছেন, "ইস্‌, কত দিন বাদে দেখা বল ত? তখন তুমি ছোট ছিলে...আরে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছ কি? আমি কি আজকের মানুষ? ভাল খাই দাই বলেই চেহারাটা কি বলে এখন...হেঁ... হেঁ...মানে ঠিক বুড়োটে হয়নি। তা একটা বিড়ি ছাড় দেখি।"

আধা-গ্রাম আধা-শহরবাসী মানুষটি বিনা দ্বিরুক্তিতে একটি বিড়ি দিল। দাদা পানওয়ালার চির-জ্বলন্ত দড়ির সাহায্যে বিড়ি ধরাইয়া বলিলেন, "আরে, এতদিন বাদে দেখা, তুমি আমাকে বিড়ি খাওয়ালে, চল তোমাকে শহুরে খাওয়া খাইয়ে দি।" অতি নিকটে দেশী রেস্তোরাঁতে লোকটাকে প্রায় টানিয়া লইয়া গেলেন, আধা-ফর্সা-প্রায় মেমসাহেব দোকানের হিসাব রাখিতেছে দেখিয়া বেচারা ভড়কাইয়া গিয়াছে। বলিল, "এ কোথায় নিয়ে চলেছ বাপু! ওখানে যে ওরা র'য়েছে। দরকার নেই আমার বাপু খেয়ে... তা ছাড়া আমার আবার মেয়ে হ'ল কবে? তোমাকে ত কখন দেখিনি?"

কন্যা হইয়াছিল কি পুত্র হইয়াছিল, কিংবা লোকটা নিঃসন্তান তাহা শুনিবার সময় দাদার ছিল না। লোকটাকে প্রায়-জোর করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া একটি চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। তাহার পর চালে হুকুম করিলেন, "এই বয়, চারঠো চিংড়ি কাটলেট, চারঠো মটন চপ, আউর চাপাটি লে আও।"

হুকুম করিতে বয় সেলাম দিয়া আদেশানুসারে জিনিষগুলি আনিতে চলিয়া গেল।

এতক্ষণে লোকটি দাদাকে দূর-সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুধু আত্মীয় ভাবে নাই, সাহেবী-ধরণের সরাইখানায় আত্মীয়ের প্রতিপত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে। কলিকাতার মত শহরে পোষাক-পরা খানসামা সেলাম দিয়া হুকুম তামিল করে, লোকটা কি সোজা আত্মীয়? ঠিক করিল বাড়ীতে গিয়াই গল্প করিবে কি রকম বড়লোক আত্মীয়ের সহিত তাহার হঠাৎ দেখা হইয়া গিয়াছিল। মস্ত বড় হোটেলে খাতির করিয়া লইয়া গিয়া কত রকমের খাবার খাওয়াইয়া দিল! এমন সময় 'বয়' প্লেট ভরিয়া খাদ্য ত আনিলই, অধিকন্তু ছুরি কাঁটা আরও কত কি আগড়ম-বাগড়ম উহাদের সামনে ধরিয়া দিল। দাদা বলিলেন, "শিশিতে সশ্ আছে, কাটলেটের উপর ঢেলে নাও।" লোকটা ভাবিল পরোটার বিলাতী নাম বোধ হয় কাটলেট হইবে। সমস্ত শিশিটা পরোটায় ঢালিয়া ঝোলে ভিজার মত করিয়া ফেলিল এবং তাহাই হুস্ হাস্ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। আহারের স্বাদ পাইয়া শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা জানাইল, পর জন্মেও যেন সে এমন একটি পরম দয়াল আত্মীয় পায়। পুরাপেট খাওয়াতে দাদার সশব্দে একটি ঢেকুর উদগত হইয়া আসিল। অতঃপর দাদা সোডা পান করিয়া আবার একটি ঢেকুর তুলিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "এইবার মিঠা পান দরকার! দেও তো হে দুটো বিড়ি, ফুঁকতে ফুঁকতে পান কিনে আসি।" বিড়ি হস্তগত হইতেই বলিলেন, "তুমি একটু বোসো, আমি মিঠা পান নিয়ে আসছি।" পানের দোকান বামে, দাদা চলিলেন সোজা একেবারে ট্রামের দিকে। দুই এক পদ সহজ পাদবিক্ষেপে চলিয়াছেন। দোকান হইতে একটু দূরে আসিতেই দাদা মাঝ-রাস্তা হইতে দেখিলেন, একখানা ট্রাম ছুটিয়া আসিতেছে, আরও দেখিলেন, নিকটে ট্রামের স্টপেজ। 'রোখো রোখো' শব্দে ট্রামকে রুখিয়া দাদা একটি খালি সীটে জাঁকিয়া বসিলেন।

...ওদিকে রেস্তরাঁয় ফোকটে খানা খাইয়া বেচারা আধা-শহুরে মানুষটির কি অবস্থা হইয়াছিল লিখিয়া পাঠকদের দরদ নিঙড়াইবার চেষ্টা করিব না। শহরে এরূপ ঘটনা প্রায় ঘটিয়া থাকে, যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

দাদা যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন বেশ রাত হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঢুকিতেই স্ত্রী বলিলেন, "সেই কখন রান্না হয়েছে—সব জুড়িয়ে গেল।" দাদা রূঢ়ভাবে বলিলেন, "কি রকম, আমার জন্যে রান্না হ'ল কেন? দেখলে না, আমি সেজেগুজে বেরিয়ে গেলাম। পয়সা কি ভেবেছ খোলামকুচি? তোমার এইটুকু বুদ্ধি নেই, দেখলে আমি বাবু সেজে রাত্তিরে বার হলাম। না হয় বলতেই ভুল হয়েছিল, তাই বলে বুঝতে পারলে না আমার নেমন্তন্ন ছিল।" দাদার সংযম হারাইবার যথেষ্ট অজুহাত ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন রাত্রির খাবার খরচটা বাঁচাইয়া কাল সকালে চায়ের ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। ট্যাঁক যে সাহারা মরুভূমির মত হইয়া আছে তাহা ত গৃহলক্ষ্মীকে বলা চলে না। খরচ যখন হইয়াছে তখন আর দুঃখ করিয়া কোন লাভ নাই। দাদা আবার বাহির হইলেন। রামুর নিকট যদি ধার পাওয়া যায় ভালই, তাহা না হইলে একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রাত নয়টার কম হইবে না, দাদা রামুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামু। এত রাত্রিতে ব্যাপার কি দাদা?

দাদা। কিছু না ভাই, বলতে এলাম তোমার জন্যে কি লোকসানটাই না হয়ে গেল—তিরিশ-তিরিশটা টাকা সোজা কথা? ঘোড়াটা ভয়ে ভয়ে প্লেসে ধরেছিলাম—আমার হিসেবে ভুল হবার উপায় আছে? হবি ত হ, একেবারে, উইনার। মাঝখান থেকে তিরিশ-তিরিশটে টাকা মাঠে মারা পড়ল।

রামু। প্লেস হ'লেও জিতেছেন ত কত টাকা?

দাদা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, "শেয়ারে আর কত টাকা পাওয়া যায়—মাত্র পনের। ব্রজেনকে ধরতে বলেছিলাম, কাল সকালেই সে দিয়ে যাবে।"

পনের টাকা এক বাজীতে, ইস্, একমাসের মাহিনার কাছাকাছি...রামুর আনন্দে প্রায় চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল। অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সামনের শনিবারের কোন খবর রাখেন না?"

দাদা। তুমি আমাকে এমনি কাঁচা ছেলে পেলে? তিন-তিনটে উইনার হে...তিন-তিনটে...একেবারে যাকে বলে ফেভারিট। বাজী ধর আর টাকা ঘরে নিয়ে চল। কিন্তু একটু গোল আছে। সব কটা ঘোড়াই যে ছুটবে তার

কোন মানে নেই। খবর পেয়েছি, স্বয়ং আস্তাবলের সহিসের কাছ থেকে, এ টিপ্—বুঝলে ভাই, নির্ঘাৎ! আরে বাবা, এতো সিওর টিপ্ কি মাগ্‌নায় পাওয়া যায়? নগদ কর্‌করে পাঁচ টাকা হাতে গুঁজে দিয়েছি। বুঝলে কি-না, তারপরে তিনটে উইনার। যেটাকেই ধর না কেন, লাভ একেবারেই শয়ের কোঠায়। প্রথম এনক্লোজারে না ধরতে পারলে রেস খেলে সুবিধে নেই। অথচ শেয়ার করে টিকিট কিনবো সে পথও বন্ধ। বুঝতেই তো পারছ, আজকাল মন্দার বাজার—কে তোমার মত লোকের টিপ্ বিশ্বাস করবে। কিন্তু চোখের সামনে দেখলে তো একেবারে উইনার!

রামু দাদার কথায় গলিয়া যায় নাই, জরিয়া গিয়াছিল ঠিক জারক নেবুর মত। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "একটু বসুন দাদা, এখনি আসছি।"

দাদা বসিয়া রহিলেন। রামু নববধূর নূতন মাক্‌ড়ি লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া নিকটেই স্যাকরার দোকানে গিয়া উঠিল। সংসারে অনটন কাহারও অপেক্ষা তাহার কম নয়। ফোকটে যদি কিছু উপরি পাওয়া যায়, যথা লাভ। রামু ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পরই দাদা সকালের চায়ের জন্য উস্‌খুস করিতেছিলেন। রাত নয়টার পর সাধারণ কেরাণীর বাড়ীতে উনুন যে জ্বলে না তাহা তিনি জানিতেন। জানিলে কি হয়, সকালের চায়ের ব্যবস্থা না হইলে সমস্ত দিনটাই মাটি। ডাকিলেন, "বৌমা—ও বৌমা—শুনছো গো!"

রামুর বৌ দরজার আড়ালে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইল।

দাদা বলিলেন, "একটু গরম চা দিতে পার মা-লক্ষ্মী?"

মা-লক্ষ্মী নিতান্ত নিপীড়িতা হইয়া উত্তর করিলেন, "উনুনে আগুন নেই।" হিন্দু বাড়ীর বধূর নিকট অতিথি ভগবান, তাহাকেই সামান্য চা দিতে না পারায় অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন! উত্তর করিলেন, "শুক্‌নো চা দিতে পারি?"

দাদা শুক্‌নো চায়ের জন্যই তো আসিয়াছিলেন, সুতরাং কিছুমাত্র আপত্তি উঠিল না। ইতিমধ্যে রামু মাকড়ি বন্ধক দিয়া নয়টি টাকা লইয়া আসিয়াছে।

রেস খেলা রামুর নেশা নয়, সংসারের অনটনের তাড়নায় কালেভদ্রে দুই

চার টাকা ধরিয়া ফেলে। পূর্বে দুই-এক বার জিতিয়াছিল। নিজে কখনও রেসে যায় নাই, লোক-মারফৎ ধরাইয়াছিল। দাদার অদ্ভুত গণনাশক্তির খ্যাতি আগেও শুনিয়াছে। আজকের ব্যাপার একরকম প্রত্যক্ষ বলিলেই হয়।

দাদা বলিলেন, "আমি এবার উঠব ভাই।"

রামু তাঁহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "দাদা, এই যে পাঁচ টাকা। একটা উইনার পাইয়ে দিতেই হবে দাদা—দোহাই তোমার।"

দাদা টাকা দেখিয়া মনের ভাব এমনই করিলেন যাহা হইতে প্রমাণ হয় অর্থ সম্বন্ধে নির্লিপ্ততাই তাঁহার ধর্ম।

রামুও নাছোড়বান্দা, জোর করিয়া দাদার তালুর ভিতর মুদ্রা কয়টি গুঁজিয়া দিল। দাদা বলিলেন, "টাকা না হয় তোমার খাতিরে নিলাম, কিন্তু ঘোড়া যদি না ছোটে ত আমাকে দোষ দিও না। তা ছাড়া, আমার টিপ্ হ'লেও রেস ত, জকি যদি ঘোড়া টেনে রাখে ত গণনায় ভুল হয়েছে বলতে পারবে না।"

রামু। না হয় দাদা, ভাবব টাকাগুলো জলে ফেলে দিয়েছি।

দাদা। হ্যাঁ...এই হ'ল গিয়ে রেস খেলার মত মন।

দাদা এতগুলি সর্ত সংগ্রহ করিতেছিলেন কেবল রামুকে টাকা জলে ফেলিয়া দিবার অঙ্গীকার করাইয়া লইবার জন্য। টাকা হস্তগত হওয়ার পর বলিলেন, "তা হলে আজ উঠি।"

উঠিতে পারিলেই দাদা এখন বাঁচেন, বিলম্বে যদি রামু তাঁহার উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে।

পরের দিনের কথা। সবে সকাল হইয়াছে। প্রাতঃকৃত্য-গুলিও সম্পূর্ণ হয় নাই, এমন সময় তেলওয়ালা আসিয়া কড়া নাড়িল। দাদা জানিতেন, সে আসিবে, প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। দরজা খুলিয়া দিয়াই অগ্নিশর্মা মূর্তি ধরিয়া বলিলেন, "কি যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! তুই একটা সামান্য তেলওয়ালা—আমার সোমত্ত মেয়েকে অপমান করিস। জানিস, ইচ্ছে করলে আমি তোর সমস্ত তেল একলা কিনতে পারি। এই নে—তোর চার টাকা সাড়ে দশ আনা।"

তৈল ব্যবসায়ী কাহাকেও কিছু বলে নাই—তৈল বিক্রয় করিয়া মূল্য চাহিয়াছিল—ইহাই তাহার অপরাধ! ছোট্ট ব্যবসা ফিরি করিয়া চালাইতে হইলে লাভের অংশের সহিত অতিরিক্ত—যাহা না চাহিতে আসিয়া পড়ে তাহা অপ্রীতিকর হইলেও প্রত্যাখ্যান করিবার উপায় নাই।

তেলওয়ালা টাকা কয়টি বাজাইয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "মা ঠাকরুণ আজ কত তেল দিতে বলেছেন?"

দাদা অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, "জানি না, ভিতরে গিয়ে খোঁজ নে।"

দাদার ভিতর-বাড়ী বলিতে গুণচটের ওপাশটা। দিনের বেলা শুইবার ঘরটি বৈঠকখানা হইয়া যায়—সেই সময় পুত্র-কন্যা ও গিন্নী সকলে চটের পর্দার আড়ালে ছোট্ট রোয়াকে কোন প্রকারে নিজেদের গুঁজিয়া দশটা পর্যন্ত কালক্ষেপণ করিয়া থাকেন। ব্যবসা শেষ করিয়া তেলওয়ালা চলিয়া গিয়াছে।

মাসের শেষ দিন। দাদা এখন নগদ সাড়ে সাত আনার মালিক। গত রাত্রিতে রামুর দেওয়া পাঁচ টাকা হইতে সাড়ে পাঁচ আনা ও বিপদ আপদের জন্য অধিকন্তু দুই আনা, উভয়ে মোটে সাড়ে সাত আনা। অধিকন্তু বাদ দিলে মোট সাড়ে পাঁচ আনা লইয়াই সারাটি দিন কাটাইতে হয়। বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকিবার উপায় নাই। স্ত্রী পুরাতন প্রতিশ্রুতিটা লইয়া নাড়া-চাড়া আরম্ভ করিয়া দিবেন। সেই কবে একজোড়া রুলি বানাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, গৃহিণী আজও তাহা ভোলেন নাই।

দাদা ভাবিতেছিলেন আজকের দিনটা কোন প্রকারে কাটাইতে পারিলেই হয়, কাল পয়লা। ছোট ছেলেটার আবার সকালেই জ্বর আসিয়াছে, কি রকম জ্বর কে জানে? একটা ফিভার মিক্‌শ্চার না আনিলে বাড়ীতে গিন্নী কাঁদিয়া হাট বসাইবেন।

দাদা একটি খালি শিশি লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। শিশিতে আবার বড় মেয়ের নাম লেখা রহিয়াছে। থাকুক। প্রত্যেকবার নূতন শিশিতে ঔষধ আনিলে তাহার আবার দাম ধরিয়া দিতে হয়, সেই কারণে একই শিশিতে এবং একই মাপে বাড়ীর সকলেই ঔষধ খাইয়া আসিতেছে।

ডাক্তারখানা বেশী দূরে নয়। বেলা তখন নয়টা হইবে। ডিস্‌পেন্‌সারীতে তখন দুই একটি করিয়া লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। দাদা ভাবিয়াছিলেন নিরিবিলিতে ডাক্তারবাবুর নিকট ঔষধ চাহিয়া লইবেন। কিন্তু এত লোকের সামনে বাকী ঔষধের দামের জন্য ধমক খাইবার সম্ভাবনা থাকায় ইচ্ছাটা বাতিল করিতে হইল। পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন অচল সিকিটা লইতে ভোলেন নাই। একবার ভাবিলেন ছেলেটার জ্বর, ঔষধের জন্য না হয় সিকিটা চালাইয়া দিই। একবার মুদ্রাটি চলিলে একদিনেই তাহা শেষ হইয়া যাইবে। বিনা ভাড়ায় ট্রামে চড়িতে হইলে ঐ অচল সিকিটাই একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং ছেলের জ্বর হইলেও সিকি চালাইবার সঙ্কল্প যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলেন না। কি করা যায়? বুদ্ধি যেন ধাক্কা মারিয়া বলিল, কালীমন্দিরে চল।

চিন্তার সহিত দাদা কার্য চটপট করিয়া থাকেন। যথাসময়ে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আধঘণ্টা কাটিয়া গেল, একটিও অচেনা কন্‌ডাকটার চোখে পড়িল না। গাড়ীতে ভিড়ও নাই যে ফুটবোর্ডে চড়িয়া পড়িবেন। গত্যন্তর না থাকায় একটি রিক্সা ঠিক করিলেন যাতায়াতের ফুরণ করিয়া। অনেক দর কষাকষির পর রিক্সাওয়ালা চোদ্দ আনায় মন্দিরের নিকট এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতেও রাজি হইল। এক খেপের ঠিক করিলে ভাড়াটা হাতে হাতে দিয়া নামিতে হয়, সেই জন্য যাওয়া-আসা ও তৎসহিত অপেক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

মন্দিরের প্রবেশ-পথে নামিয়া দাদা কোর্ট আর শার্ট খুলিয়া ফেলিলেন। পৈতাটা বহু পাক খাইয়া মালার মত গলায় ঝুলিতেছিল, অসংখ্য গিরো, চার-পাঁচটা ছোট-বড় মাদুলির সহিত জোট খাইয়া গিয়াছে। এমন একটি যজ্ঞো-পবীত বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ দিকের কোমর পর্যন্ত ঝোলান সহজ ব্যাপার নয়। যাহা হউক, দাদা কোন প্রকারে পৈতার ব্যাপারটা সামলাইলেন। নকুলেশ্বরতলায় বেদীর উপর একই স্থানে কতকগুলি টাট্‌কা সিন্দুরের টিপ পড়িয়া আছে দেখিয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও ভক্তিভরে সিন্দুরের উপর কপাল ঘষিতে লাগিলেন। অল্প চেষ্টাতেই কপাল ধর্মের অপরিহার্য টিকায় ভূষিত হইয়া উঠিল। মস্তক মুণ্ডনের জন্য পরামাণিক

নিকটেই বসিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে একটি পারা-উঠিয়া-যাওয়া দর্পণ লইয়া নিজের মুখশ্রী দেখিয়া লইলেন। সজ্জা ভালই হইয়াছে। এইবার একটি বিল্বপত্র সহ সরা ও কিছু ফল সংগ্রহ করিতে পারিলেই কাজে নামা যায়। ব্রাহ্মণকে পয়সা দিয়া অর্ঘের সরা কিনিতে হইবে? দেশের মানুষগুলি কি এতই অধার্মিক হইয়া পড়িয়াছে? দাদা কি উপায়ে অর্ঘের সরাও সহজ-লভ্য করিয়া ফেলিলেন।

সরা হস্তে নাটমন্দিরের সামনে দাঁড়াইয়া বহুবার দেবীকে প্রণাম করিলেন। মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। কিন্তু যাহাকে অথবা যাহাদের খুঁজিতেছিলেন তাহাদের পাত্তা পাওয়া গেল না। এদিকে বেলা বাড়িয়া চলিয়াছে। আজ অবশ্য রবিবার। রবিবার হইলে কি হয়, সেই কারণে রবি ত তাঁহার রশ্মি কমাইবেন না। অবস্থাটা তেমন আশাপ্রদ লাগিতেছিল না। সৎকার্যে নিষ্ঠা থাকিলে অধ্যবসায় সফল না হইয়া যায় কোথায়? দেবী সদয়া হইলেন, দাদা দেখিলেন একটি অবস্থাপন্ন মেদিনীপুরবাসীর দল পরকালের পাকা ব্যবস্থার জন্য দেবীর শ্রীচরণ স্পর্শ করিতে আসিয়াছে। শিকার পাওয়া গিয়াছে, এখন উপযুক্তভাবে আক্রমণ করিতে পারিলেই হয়। ফলাফল ত তাঁহারই হাতে। দাদা ব্যোম্ ব্যোম্—মহাকালী ও কতকগুলি উনঃস্বর ও বিসর্গযুক্ত অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করিতে করিতে তীর্থযাত্রীদের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কপালে সিন্দুরের জ্বলন্ত টিকা, বক্ষে পুরাতন যজ্ঞোপবীত, তদুপরি সংস্কৃতের নব শুদ্ধি। সব কয়টির মিলিত প্রভাবে মিদনাপুরবাসী ভক্তদের আকৃষ্ট বলিব না, কুপোকাৎ করিয়া ফেলিলেন। ঘনিষ্ঠতার প্রকরণে যে সব আচার অথবা মন্ত্রবান দাদা অব্যর্থ মনে করিয়া থাকেন সব কয়টিই তিনি প্রয়োগ করিলেন—ভক্তের দল দাদাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল; কারণ তাঁহারই সার্টিফিকেটের উপর স্বর্গ-দ্বারে প্রবেশানুমতি নির্ভর করিতেছে। দাদা তাঁহার সম্মোহন শক্তির দ্বারা ভক্তদের এমনভাবে বশ করিলেন যে, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

সকলকে মাতৃদর্শনের জন্য মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া নিজে তাগ বুঝিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। বলাই বাহুল্য, যে পথ দিয়া

প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই দিক দিয়া ফিরেন নাই। কারণ রিক্সাওয়ালা তখন দাদার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

রিক্সাওয়ালা অপেক্ষা করিতে থাকুক, ভক্তের দল মন্দিরে পূজা করুক, আমরা দাদাকে অনুসরণ করি। মন্দির হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই এক বাণ্ডিল বিড়ি ও দুই প্যাকেট কাঁচি সিগারেট কিনিয়া ফেলিলেন। তারপর জামা কাপড়ের দোকানে ঢুকিয়া একটি গেঞ্জি কিনিলেন এবং তৎসহিত দুইটি ফাও সকলের অজ্ঞাতে তাঁহার বৃহৎ পকেটে পুরিয়া ফেলিলেন। দোকানে যে রকম ভিড় জমিয়াছিল তাহাতে হাত সাফাই-এর কসরৎ না করিলে, নিজের প্রতি হতশ্রদ্ধা আসিয়া পড়িত। দোকান হইতে ভিড়ের পাশ কাটাইয়া যেই রাস্তার দিকে মুখ করিয়াছেন, অমনি দেখিলেন একটি থার্ড ক্লাশ বন্ধ ও খালি ছ্যাকরা গাড়ী তাঁহারই সামনে দিয়া কেওড়াতলার দিকে চলিয়াছে। দাদা বন্ধ গাড়ীর সুযোগ ছাড়িলেন না। ভাড়ার ফুরণ না করিয়াই চল্‌তি গাড়ীর দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং দোকানের বিপরীত দিকে জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "ওরে ভবানীপুর—জগুবাবুর বাজারে—"

মোড়ের কাছে রাস্তা জাম হইয়া গিয়াছিল, মোষের গাড়ীর সহিত মোটর গাড়ীর সংঘর্ষে ; সেই সূত্রে বচসা বা বাকযুদ্ধের অন্ত নাই। এমন অবস্থায় দাদা কি চুপ করিয়া গাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকিতে পারেন? দোকানদারের নাগালের অনেকটা বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন, এখন ছ্যাকরাগাড়ীর গাড়োয়ানটির চোখেও ধূলি না দিলেই নয়! কাজেই মোষের গাড়ীর ছোটলোক গাড়োয়ানটাকে সায়েস্তা করিবার জন্য দাদা তাড়াতাড়ি নামিয়া ভিড়ের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

একটু পরেই দেখা গেল, ভিড়ের পিছনের সরু গলিটি পার হইয়া দাদা ট্রামের দিকে চলিয়াছেন! দাদা কত খেলাই জানেন! সোজা রাস্তা ছাড়িয়া এ-গলি ও-গলি করিয়া কত ঘুরপাক খাইলেন। তাহার পর যথাস্থানে পোঁছিয়া একটি চলতি ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। ভিতরে ঢোকেন নাই, ফুটবোর্ডের উপর দাঁড়াইয়া গম্য স্থলটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাজারে আসিয়া আটজনের জন্য মাংস কিনিয়া ফেলিলেন—তদুপরি উপযুক্ত

পরিমাণে ঘি ও মশলা। মাংসের দোকান হইতে বস্ত্র বিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পুত্র-কন্যা ও স্ত্রীর জন্য পাৎলা কাপড় কেনা হইল, নিজেরটাও বাদ যায় নাই। এতগুলি বোঝা একলা বহন করা সহজ নয়, তাছাড়া কলিকাতার রাস্তা—মোটর চাপা পড়ার ভয় তো আছেই।

দাদা নানাদিক ভাবিয়া একটা টিফিন্ গাড়ী চড়িয়া বসিলেন এবং মাঝ পথ হইতে ঔষধের পরিবর্তে স্বয়ং ডাক্তারকেই লইয়া আসিলেন। চিকিৎসক পুত্রকে পরীক্ষা করিয়া বলিল, কিছু না, সামান্য ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইয়াছে। কাল সকালে জোলাপ দিলেই ঠিক হইয়া যাইবে।

দাদা ডাক্তারকে অগ্রিম এক টাকা দিয়াছিলেন, স্ত্রীর সামনে আর এক টাকা দিয়া দিলেন।

রাত্রির আহারের ব্যবস্থা একটু চড়া-ধরণের হইয়াছিল। নিমন্ত্রিতদের ভিতর রামু বাদ পড়ে নাই। গুরু আহারের পর দাদা কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কাঁচি সিগারেটটা শেষ করিয়াই বিছানায় আশ্রয় লইতে হইল।

সব কাজ শেষ করিয়া গৃহিণী দাদার বিছানায় আসিয়া বলিলেন, "মাসের শেষে এত খরচ করছ; কি ব্যাপার বল ত? আমার বড্ড ভয় করছে!"

তন্দ্রার আবেশটা গভীর নিদ্রার দিকে ঝুঁকিতেছিল, এমনি সময় পত্নী আসিয়া বাগ্‌ড়া দিলেন। দাদা বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "আঃ চেপে যাওনা, সবই ত বোঝ। কাল তোমার রুলির ব্যবস্থা করে দেব।"

কথা কয়টি শেষ করিয়া এমন সঙ্কেত দিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইলেন যে, পত্নীর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার সাহস আসিল না। কর্তা চার বৎসর বাদে নিজ মুখে বলিয়াছেন—কালই রুলির ব্যবস্থা করে দেব—কি জানি যদি মতটা বদ্‌লাইয়া যায়?...